হাকিমুল উম্মত মুজাদ্দিদে মিল্লাত

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ.

নারীদের আত্মিক রোগ ও প্রতিকার

অনুবাদ | মাওলানা ইলিয়াস আশরাফ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf

সত্যের আধুনিক প্রকাশ

মাকতাবাতুল ফুরকান

www.islamibooks.com

ইসলাহে খাওয়াতিন—এর অনুবাদ

নারীদের আত্মিক রোগ ও প্রতিকার

হাকিমুল উম্মত মুজাদ্দিদে মিল্লাত
হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ.

অনুবাদ
মাওলানা ইলিয়াস আশরাফ

সম্পাদনা
মুহাম্মাদ আদম আলী

MAKTABATUL FURQAN
PUBLICATIONS
ঢাকা, বাংলাদেশ



নারীদের আত্মিক রোগ ও প্রতিকার

মাকতাবাতুল ফুরকান কর্তৃক প্রকাশিত
১০ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
www.islamibooks.com
furqandhaka@gmail.com
✆ +8801733211499

গ্রন্থস্বত্ব © ২০২৪ মাকতাবাতুল ফুরকান

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে বইটির কোনো অংশ স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা কিংবা ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং দণ্ডনীয় অপরাধ।

দ্যা ব্ল্যাক, ঢাকা, বাংলাদেশ এ মুদ্রিত; ✆ +৮৮০১৭৩০৭০৬৭৩৫
প্রথম প্রকাশ : জিলহজ ১৪৪৫ / জুন ২০২৪
প্রচ্ছদ : কাজী যুবাইর মাহমুদ ✆+৮৮০১৮৩০৩৩৮১০৫

ISBN : 978-984-96830-6-3

মূল্য : ৳ ৫০০.০০ (পাঁচ শত টাকা মাত্র)

USD 15.00

অনলাইন পরিবেশক
www.islamibooks.com; www.rokomari.com
www.wafilife.com

প্রকাশকের কথা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

সভ্যতার ব্যাপক উন্নতি সত্ত্বেও মানুষের আত্মিক জগৎ আদিকাল থেকে একই রকম আছে। এ জগৎ বড় রহস্যময়। মূলত ওহীর জ্ঞান ও চর্চা ছাড়া আত্মায় উন্নতির কোনো ছোঁয়া লাগে না। অহংকার, হিংসা-ক্রোধ, রাগ-জিঘাংসা ইত্যাদি যেমন সৃষ্টির শুরু থেকেই মানুষের নিত্য সঙ্গী, তেমনই মায়া-মমতা, বিনয়-নম্রতা, ত্যাগ-তিতিক্ষাও আছে। সহজাত মানবিকবোধ একটা পর্যায় পর্যন্ত মানুষকে বিনয়ী হতে সাহায্য করলেও পরিস্থিতিসাপেক্ষে পরিচর্যাহীন আত্মা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। তখন সেটি আর নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। এ নিয়ন্ত্রণ আখেরাত-ভাবনায় যতটা শক্তিশালী হয়, অন্য কিছুতেই সেটি অর্জন করা সম্ভব নয়। এ জন্যই মুসলিম পুরুষ ও নারীদের তাযকিয়া বা ইসলাহ করা নবী-রাসূলদের একটি অনিবার্য কাজ হিসেবে কুরআনে উল্লেখিত হয়েছে। এর মূল ভিত্তি হচ্ছে, আত্মার মন্দ গুণাবলিকে নিয়ন্ত্রণ করে এটিকে ফেরেশতাসুলভ আচরণে দীক্ষিত করে তোলা। এতে আত্মা পরিশুদ্ধ হয়, কলবে সালিম পর্যায়ে উন্নীত হয়। এটি ছাড়া আখেরাতে সফল হওয়া অসম্ভব।

বর্তমানে মুসলিমদের মধ্যে এই বোধ ও অনুভূতি মারাত্মকভাবে কমে যাওয়ায় পরিবার ও সমাজে নানা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছে। এতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মুসলিম নারীরা। তাদের অনেকে ইসলাম বিসর্জন দিয়ে পুরোপুরিভাবে পাশ্চাত্যের সংস্কৃতিতে আকৃষ্ট হয়ে পড়ছে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকেও বিপথে ঠেলে দিচ্ছে। আধুনিক ও বিলাসী জীবনের প্রলোভনে তারা স্বনির্ভর হওয়ার প্রতিযোগিতায় স্বামী-সংসার-সন্তান থেকে বিচ্ছিন্ন এক জীবন যাপন করছে। এতে বিয়ে না করা কিংবা দেরিতে বিয়ে করার প্রবণতা যেমন বেড়েছে, তেমনই সংসার ভাঙার হারও বেড়েছে। আর মানসিক প্রশান্তি তো বহু আগেই বিদায় নিয়েছে। ইসলাম যে পবিত্র জীবনের রূপরেখা দিয়েছে, সেটিকে তারা পশ্চাতপদ মনে করছে। অথচ সেটিই আসল জীবন। এ জীবন লাভ করা সম্ভব না হলে দুনিয়া ও আখেরাত দুটোই ব্যর্থ।

এ লক্ষ্যেই আমাদের বর্তমান আয়োজন মুজাদ্দিদে মিল্লাত, হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. (১৮৬৩-১৯৪৩)-এর কালজয়ী গ্রন্থ *ইসলাহে খাওয়াতিন*-এর অনুবাদ—*নারীদের আত্মিক রোগ ও প্রতিকার*। এটি তার একটি অনবদ্য কীর্তি। অত্যন্ত বিচক্ষণ ও দয়ার্দ্র হৃদয়ে হাকীমুল উম্মত রহ. মুসলিম নারীদের আত্মিক রোগ ও প্রতিকার নিয়ে গ্রন্থটি লিখেছেন, যা যুগ যুগ ধরে নারীদের আত্মশুদ্ধির এক অনবদ্য উৎস হয়ে আছে। দুনিয়া ও আখেরাতে সফল হওয়ার জন্য নারীদের জন্য এটি একটি আবশ্যকীয় গ্রন্থ।

গ্রন্থটি বাংলাভাষীদের জন্য অনুবাদ করেছেন এ দেশের একজন বিজ্ঞ, অভিজ্ঞ ও বিশ্বস্ত অনুবাদক মাওলানা ইলিয়াস আশরাফ সাহেব। মূল গ্রন্থে হাদীসসমূহের সূত্র দেওয়া ছিল না। তিনি যথেষ্ট পরিশ্রম করে বেশিরভাগ হাদীসের সূত্র সংযুক্ত করেছেন। উল্লেখ্য ইতোমধ্যে তার বেশ কয়েকটি গ্রন্থ *মাকতাবাতুল ফুরকান* থেকে প্রকাশিত হয়েছে, যা পাঠকমহলে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত। আমরা আশা করি, তথ্যসমৃদ্ধ ও সহজবোধ্য ভাষায় অনূদিত এ গ্রন্থটিও ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা পাবে। ইনশাআল্লাহ, কালের পরিক্রমায় এটি এ দেশের মুসলিম নারীদের ইসলামের পথে আরও অগ্রসর হওয়ার ক্ষেত্রে এক অনবদ্য পাথেয় হয়ে থাকবে।

গ্রন্থটি ত্রুটিমুক্ত করার সার্বিক চেষ্টা করা হয়েছে। সুহৃদ পাঠকের দৃষ্টিতে কোনো অসংগতি ধরা পড়লে তা জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো। আল্লাহ তাআলা এ অনুবাদ কবুল করুন। যারা গ্রন্থটি প্রকাশের ব্যাপারে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন, তাদেরকেও কবুল করুন। সবাইকে এর ওসিলায় বিনা হিসেবে জান্নাত নসীব করুন। আমীন।

মুহাম্মাদ আদম আলী
প্রকাশক, মাকতাবাতুল ফুরকান
১০ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা

৩০ জুন ২০২৪

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় : নারীজাতি সম্পর্কে কিছু হাদীস ১৫

দ্বিতীয় অধ্যায় : নারীজাতির সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা ১৯
নারীদের চরিত্র সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা ২০
শিক্ষা ও পরিশুদ্ধি ফরজে আইন ২১
নারীদের আত্মিক পরিশুদ্ধির গুরুত্ব ২১
নারীদের প্রতি জিজ্ঞাসা এবং তাদের দুরবস্থার আক্ষেপ ২২
স্ত্রীদের পরিশুদ্ধির দায়িত্ব স্বামীদের ওপর ২৩
নারী-সংস্কারের কর্মপদ্ধতি ২৪
আকিদা-বিশ্বাস বিশুদ্ধকরণ-পদ্ধতি ২৪
নামায বিশুদ্ধকরণ-পদ্ধতি ২৫

তৃতীয় অধ্যায় : নেক ও দ্বীনদার নারীর গুণাবলি ২৭
দ্বীনে ইসলাম ২৮
ইসলাম ধর্মের উপাদান ২৯

চতুর্থ অধ্যায় : কিছু গুরুত্বপূর্ণ আকিদার বিবরণ ৩১
গুরুত্বপূর্ণ আকিদাগুলোর বিশ্লেষণ ৩৩
কালিমা তাইয়িবার ব্যাখ্যা ৩৩
পূর্ণাঙ্গ একত্ববাদ ৩৪
শিরক ৩৫
শিরকের প্রকারভেদ ৩৬
কেয়ামত ও আখেরাত ৩৭
জান্নাত ও জাহান্নাম ৩৯
তাকদীর বা ভাগ্য ৩৯
তাকদীরের ওপর ভরসা রাখার লাভ ৪১
ফেরেশতা ৪১
নবী ও রাসূল ৪২
কিছু ভ্রান্ত বিশ্বাস ৪৩
কোনো কিছুই অশুভ নয় ৪৪
কিছু ভ্রান্ত আকিদা ৪৪

জাদু-টোনা ৪৫
সন্তান লাভের জাদুমন্ত্র ৪৬
দ্বিতীয় বিয়ে-সংক্রান্ত ভ্রান্ত আকিদা ৪৬

পঞ্চম অধ্যায় : নামাযের গুরুত্ব ৪৮
কিছু হাদীস ৪৯
নামায আদায়ে অবহেলা ৪৯
নামাযের মাঝে কিছু অবহেলা ৫০
অযথা ওজর দেখিয়ে নামাযে অবহেলা ৫২
নামাযে ধারাবাহিক হওয়ার পদ্ধতি ও কৌশল ৫৩
মহিলাদের নামাযী ও দ্বীনদার বানানোর পদ্ধতি ৫৫
সারকথা ৫৫

ষষ্ঠ অধ্যায় : রোযার গুরুত্ব ৫৬
রমাযানের উপকারিতা ৫৭
রোযার উদ্দেশ্য ৫৮
নারীদের রোযা-সংক্রান্ত ভুলত্রুটি ৫৯
ইতিকাফ ৬১
সদকাতুল ফিতর ৬২

সপ্তম অধ্যায় : যাকাত ৬৩
যাকাতের গুরুত্ব ৬৩
যাকাত না দেওয়ার শাস্তি ৬৪
যাকাতের ব্যাপারে নারীদের ত্রুটি ৬৫
মহিলাদের একটি অভ্যাস ৬৬
যাকাতে কি সম্পদ কমে? ৬৬

অষ্টম অধ্যায় : হজ ও কুরবানী ৬৮
কিছু হাদীস ৬৮
মদীনা যিয়ারত ৬৯
কুরবানী ৭০
কুরবানী-সংক্রান্ত কিছু হাদীস ৭১

নবম অধ্যায় : আল্লাহর যিকির ৭২
যিকরুল্লাহ-সংক্রান্ত কিছু হাদীস ৭৩

আল্লাহর যিকির করার পদ্ধতি ৭৪
ঘরের কাজকর্মের মাঝে যিকির ও তাসবীহের আমল ৭৫
বিশেষ কিছু যিকির ৭৬
ইস্তেগফার ৭৬
কালিমা তাইয়িবা ৭৬
মাসনূন আমল ৭৭
তাসবীহে ফাতেমী ৭৭
কুরআন তিলাওয়াতের গুরুত্ব ৭৯
কুরআন তিলাওয়াতের গুরুত্বপূর্ণ আদব ৮১
দুআর গুরুত্ব ও আদব ৮১
দুআর প্রকৃতি ৮৩

দশম অধ্যায় : দুনিয়ায় নিবিষ্ট না হয়ে আখেরাতের প্রস্তুতি নেওয়া ৮৪
গুনাহ থেকে তাওবা ও ইস্তেগফার ৮৫
সবর ও শোকরের পরিচয় ৮৭

এগারোতম অধ্যায় : নারীদের আত্মিক রোগ ও তার চিকিৎসা ৮৯
ধন-সম্পদের ভালোবাসা ৮৯
লোভ-লালসা ৯১
দুনিয়াপ্রীতি ৯২
লালসা ও অপ্রয়োজনীয় চাহিদা ৯৩
অল্পে তুষ্ট না হওয়া ৯৩
অস্বস্তি ও বচসা ৯৪
প্রয়োজনের অধিক আসবাব জমা করার বাসনা ৯৫
প্রয়োজন ও অপচয়ের সীমানা ৯৬
গৌরবপ্রীতি ৯৭
কৃত্রিমতা ও অহংকার ৯৯
আত্মঅহমিকার ব্যাধি ১০১
অহংকার ও দুনিয়াপ্রীতি থেকে বাঁচার উপায় ১০৪
লোভ-লালসার একটি প্রতিকার ১০৫
মহিলাদের পরস্পর সাক্ষাতে সতর্কতা ১০৮
লোভ ও অধৈর্য কীভাবে জন্মায় ১০৯
একটি ঘটনা ১১০
নিজের চেয়ে নিম্নমানের কাউকে দেখুন ১১১

জবানের হেফাজত ১১২
মিথ্যা ১১৩
গীবত বা পরনিন্দা ১১৪
গীবতের অভ্যাস ১১৫
গীবতের বিধিবিধান ১১৬
গীবত থেকে নিষ্কৃতির উপায় ১১৭
হক্কুল ইবাদ তথা বান্দার হকের গুরুত্ব ১১৮
বান্দার হক থেকে নিষ্কৃতির পদ্ধতি ১২০

বারোতম অধ্যায় : স্বামীদের ব্যাপারে স্ত্রীদের অবহেলা
স্বামীকে নামাযী বানানোর চেষ্টা না করা ১২১
স্ত্রী চাইলে স্বামী পাক্কা দ্বীনদার হয়ে যেত ১২২
আল্লাহর কিছু বান্দির অবস্থা ১২২
স্বামীর সম্মান ও সেবায় ত্রুটি ১২৪
স্বামীকে তুচ্ছ মনে করবেন না ১২৫
স্বামীর সাথে কথা কাটাকাটি ও বেয়াদবি ১২৬
স্বামীর সাথে চাটুকারিতা ও তামাশা করা ১২৭
স্বামীকে অসন্তুষ্ট করা ১২৮
স্বামীর ভুল ও অযথা রাগের সময় স্ত্রীর করণীয় ১২৯
স্বামী অন্য নারীর চক্করে পড়লে স্ত্রী কী করবে? ১২৯
মন্দ ভাষা ও প্রগলভতা ১৩১
মহিলাদের অনর্থক চাহিদা ১৩২
নিজেকে পুরুষের সমান মনে করা এবং রাগ করা ১৩৩
স্বামী ঘরে ফেরার পর স্ত্রীর অবহেলা ১৩৪
স্বামীর সম্পদে হস্তক্ষেপ ১৩৫

তেরোতম অধ্যায় : মহিলাদের বিভিন্ন আত্মিক রোগ ১৩৬
অকৃতজ্ঞতা ১৩৬
কেনাকাটায় অপচয় ১৩৭
বিয়ে-শাদিতে অপচয় ১৩৮
শোকসভায় অপব্যয় ১৩৯
প্রয়োজনের সীমানা ১৪০
অপচয়ের সীমানা ১৪১
অন্যের জামা দেখে তার মতো জামা বানানো ১৪১
অহংকার ১৪২
অহংকার ও আত্মম্ভরিতার চিকিৎসা ১৪৪

বিনয় : প্রয়োজনীয়তা ও অর্জন করার পদ্ধতি ১৪৫
বুযুর্গদের বিনয় ১৪৭
ধোঁকাবাজি ও চালাকি ১৪৮
বেশি কথা বলা ১৪৯
কুধারণা ১৫১
অভিশাপ দেওয়া ১৫২
হিংসা-বিদ্বেষ ১৫২
চেয়ে নেওয়া জিনিস ফেরত না দেওয়া ১৫৩
ঋণ পরিশোধ না করা ১৫৪
আত্মীয়দের সাথে পর্দায় অবহেলা ১৫৬

চৌদ্দতম অধ্যায় : মহিলাদের ঝগড়া-বিবাদ ১৫৭
নারী-পুরুষের ঝগড়ার পার্থক্য ১৫৭
ঝগড়া লাগানোর অভ্যাস ১৫৮
পুরুষদের মাঝে ঝগড়া লাগানো ১৫৮
মহিলাদের পরস্পর ঝগড়া ১৫৯
ভাবির রাগ; দেবর ও ইয়াতিমের প্রতি অবিচার ১৬১
ঝগড়া-বিবাদ থেকে বাঁচার উত্তম পদ্ধতি ১৬৩
পারিবারিক ঝগড়া থেকে বাঁচার উপায় ১৬৪
আপনজনের সাথে লেনদেন না করাই নিরাপদ ১৬৪

পনেরোতম অধ্যায় : নারীদের প্রথাপ্রীতি ১৬৫
নারীরা রুসুম-রেওয়াজ ও বিভিন্ন প্রথার শেকড় ১৬৭
মহিলাদের একত্রিত হওয়ার ক্ষতি ১৬৭
বিয়ে-শাদিতে মহিলাদের মন্দ কাজের বিবরণ ১৬৮
সাজসজ্জা, অলংকার ও পোশাক-আশাকের মন্দ দিক ১৭০
নারীদের মারাত্মক ভুল ১৭০
নববী এরশাদ ও গুরুত্বপূর্ণ একটি মাসআলা ১৭১
প্রথা পালনে বৃদ্ধাদের অপতৎপরতা ১৭২
রুসুম-রেওয়াজ দূর করার পদ্ধতি ১৭৩
রুসুম-রেওয়াজ দূর করার শরয়ী পদ্ধতি ১৭৪
রুসুম-রেওয়াজের বিরোধিতাকারী আল্লাহর ওলী ১৭৬
কুসংস্কার ও রুসুম-রেওয়াজে নিমজ্জিত ব্যক্তি ১৭৬
সকল মুসলিমের দায়িত্ব ১৭৬
নারীদের নিকট নিবেদন ১৭৭
নারীরা সচেষ্ট হলে সকল রুসুম-রেওয়াজ বিলীন হয়ে যাবে ১৭৭

নারীদের কিছু ত্রুটি এবং জরুরি সংশোধন ১৭৮
নারীদের মাধ্যমে ফেতনা-ফ্যাসাদ তৈরি হওয়ার কারণ ১৭৯
নারীদের কিছু মন্দ অভ্যাস ১৮০
নারীদের প্রতি গুরুত্বপূর্ণ কিছু নসীহত ১৮১

ষোলোতম অধ্যায় : অধিকারসমূহের আলোচনা ১৮৪
মা-বাবার হক ১৮৪
সৎ মায়ের হক ১৮৫
ভাই-বোনের হক ১৮৫
স্বামীর হক ১৮৫
স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক হক ১৮৬
স্বামীর দায়িত্ব ১৮৬
স্ত্রীর দায়িত্ব ১৮৭
আত্মীয়-স্বজনের হক ১৮৭
শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়দের হক ১৮৭
এতিম অসহায়দের হক ১৮৮
মেহমানের হক ১৮৮
প্রতিবেশীর হক ১৮৮
অমুসলিমদের হক ১৮৯
প্রাণীদের হক ১৮৯

সতেরোতম অধ্যায় : ভালো অভ্যাস ও শিষ্টাচারের বিবরণ ১৯১
খাওয়া-দাওয়ার আদব ১৯১
পরিধানের আদব ১৯৩
অসুস্থতা ও চিকিৎসার আদব ১৯৪
স্বপ্নের আদব ১৯৪
সালামের আদব ১৯৪
বসা, শোয়া ও চলার আদব ১৯৫
সমবেত বসার আদব ১৯৫
মুখকে গুনাহ থেকে বাঁচানোর পদ্ধতি ১৯৬
বিশেষ কিছু আদব ১৯৮
বিক্ষিপ্ত কিছু মাসআলা ১৯৯
কিছু জরুরি বিষয় ২০১
সুখে থাকার কিছু উপাদান ২০২
মহিলাদের পরিহার্য কিছু বিষয় ২০৯

কিছু অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষিত বিষয়	২১৫
কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ	২২৩
বাচ্চাদের ব্যাপারে বিশেষ সতর্কতা	২২৯
নবীজীর সংক্ষিপ্ত জীবনী ও উত্তম চরিত্রাবলি	২৩২
কতিপয় সত্য ঘটনা	২৩৫
নারীরাও উচ্চ শিখরে পৌঁছতে পারেন	২৪২
নারীজাতির সংশোধনের পদ্ধতি	২৪৫
নারী সংশোধনের পরিকল্পনা ও নিয়মতান্ত্রিক আমল	২৪৬
নারী সংশোধনের সহজ পদ্ধতি	২৪৯
নারীরাও কি পীরের মতো অন্যদের ইসলাহ করতে পারবে	২৪৯
নারী-মনে পুরুষ হওয়ার কামনা	২৫১
নারীজাতির ভালো গুণ	২৫২
নেককার মহিলাদের গুণাবলি	২৫৩
নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা	২৫৪
পুরুষের তুলনায় নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অত্যধিক	২৫৫
নারীদের দ্বীনি শিক্ষার উপকারিতা	২৫৬
দ্বীনি শিক্ষা বনাম আধুনিক শিক্ষা	২৫৬
দ্বীনি শিক্ষার অভাবে অপূরণীয় ক্ষতি	২৫৭
নারীশিক্ষায় উত্থাপিত প্রশ্ন ও তার জবাব	২৫৭
নারীদের শিক্ষিত করা পুরুষদের আবশ্যকীয় দায়িত্ব	২৫৮
নারীদের দ্বীনি শিক্ষা না দেওয়া অন্যায়	২৫৯
নারীদের আরবী শিক্ষা	২৬০
কন্যাশিশু ও নারীদেরকে আলেমা হিসেবে গড়ে তোলা	২৬১
নারী বা পুরুষ উভয়কে আলেম বানানোর জন্য যাচাই	২৬১
নারীদের কুরআনে কারিম হিফজ করা	২৬২
নারীদের পাঠ-পরিকল্পনা	২৬৩
মৌলিক কথা	২৬৩
নারীশিক্ষার পাঠ্যসূচি	২৬৪
নারীশিক্ষার পাঠ্যসূচির সারসংক্ষেপ	২৬৫
জাগতিক বিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জন ও পেশাজীবী শিক্ষা	২৬৬
নারীদেরকে ইংরেজি শিক্ষা ও আধুনিক শিক্ষা	২৬৬
আধুনিক শিক্ষার ক্ষতি	২৬৭
আধুনিক শিক্ষা লজ্জাহীনতার উন্মুক্ত দ্বার	২৬৭
পাশ্চাত্য সমাজের নতি স্বীকার	২৬৯
নারীর দর্শন ও তর্কবিদ্যা শিক্ষা	২৬৯

নারীর ইতিহাস শিক্ষা	২৭০
নারীর ভূগোল শিক্ষা	২৭০
নারীদের জন্য অপ্রয়োজনীয় ভৌগোলিক ও দুনিয়াবি শিক্ষা	২৭১
অপ্রয়োজনীয় বই-পুস্তক পাঠ করা	২৭২
নারীদের কবিতা আবৃত্তি শিক্ষা	২৭৪
নারীদের হাতের লেখা ও ড্রয়িং শিক্ষা	২৭৫
সতর্কতা অবলম্বন জরুরি	২৭৫
নারীদের লেখা শিক্ষায় বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ি	২৭৬
স্বাধীনচেতা নারীদের দ্বারা নারীশিক্ষার ব্যবস্থা	২৭৭
বালিকা বিদ্যালয় সম্পর্কে অভিমত	২৭৭
বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষার ক্ষতি	২৭৮
এটা কোনো ফাতওয়া নয়, বরং আমার নিজস্ব অভিমত	২৭৯
বালিকা বিদ্যালয়ে অনিষ্টের মূল কারণ	২৮০
নারীদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের শর্ত ও উত্তম পদ্ধতি	২৮১
কন্যাসন্তানের শিক্ষাপদ্ধতি	২৮২
বিবাহিতা নারীদের শিক্ষাপদ্ধতি	২৮২
অশিক্ষিত নারীদের দ্বীনি শিক্ষার পদ্ধতি	২৮৩
গৃহিণীরা দ্বীনি বিষয়াদি শ্রবণে অনাগ্রহী হলে	২৮৩
পুরুষ দ্বারা নারীকে দ্বীনি শিক্ষা দেওয়া	২৮৪
নারীদেরকে বেহেশতী জেওর শেখানোর পদ্ধতি	২৮৪
নারীরাও পারে লেখিকা হতে	২৮৬
পুস্তক-পত্রিকায় নারীদের নাম-ঠিকানা উল্লেখ	২৮৬



প্রথম অধ্যায়

নারীজাতি সম্পর্কে কিছু হাদীস

১। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে নারী পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করবে, রমাযানের রোযা পালন করবে, নিজের পবিত্রতা রক্ষা করবে এবং স্বীয় স্বামীর আনুগত্য করবে, সে জান্নাতের যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা জান্নাতে প্রবেশ করবে।[১]

২। এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, অমুক নারী অধিকহারে নফল নামায পড়ে, রোযা রাখে এবং দান-সদকা করে, কিন্তু মুখের ভাষায় প্রতিবেশীদের কষ্ট দেয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সে জাহান্নামে যাবে। তারপর ওই ব্যক্তি বলল, অমুক নারী নফল নামায, রোযা ও দান-সদকা এত বেশি করে না। মাঝে মাঝে কয়েক টুকরো পনীর দান করে, কিন্তু মুখের ভাষায় প্রতিবেশীদের কষ্ট দেয় না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সে জান্নাতে যাবে।[২]

৩। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, নারীর জন্য ঘরে বসে সাংসারিক কাজ করা জিহাদের সমপর্যায়ের।[৩]

৪। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, হে নারীজাতি, আমি তোমাদেরকে অধিকহারে জাহান্নামে দেখেছি। নারীরা জিজ্ঞেস করল, এর কারণ কী? তিনি বললেন, তোমরা অনেক বেশি অভিশাপ দাও এবং খুব বেশি স্বামীর প্রতি অকৃতজ্ঞ হও এবং সে যা দেয় তার অনেক অসম্মান করো।[৪]

৫। আসমা বিনতে ইয়াযিদ রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, নারীরা আমাকে এ কথা বলে আপনার নিকট

---

[১] *সহীহ ইবনে হিব্বান*, হাদীস নং ৪১৬৩।

[২] *মুসনাদে আহমাদ*, হাদীস নং৯৬৭৫; *ইবনে হিব্বান*, হাদীস নং ৫৭৬৪।

[৩] আবু ইয়ালা, হাদীস নং ৩৪১৫; *আল মুজামুল আওসাত*, ২৮০৭।

[৪] *সহীহ বুখারী*, হাদীস নং ৩০৪; *সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং ৮০।

পাঠিয়েছে যে, পুরুষরা জুমার নামায পড়ে, জামাতের সাথে নামায আদায় করে, অসুস্থের সেবা করে, জানাজায় অংশগ্রহণ করে, হজ ও উমরা করে এবং ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত রক্ষা করে আমাদের চেয়ে অধিক সওয়াব অর্জন করে নিয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি তাদের গিয়ে বলো, স্বামীর জন্য সাজসজ্জা করা, স্বামীর হক আদায় করা, স্বামীর সন্তুষ্টির প্রতি যত্নশীল হওয়া এবং তার সন্তুষ্টি অনুযায়ী চলাই তোমাদের জন্য উপরোক্ত সমস্ত আমলের সমপর্যায়ের বলে গণ্য হবে।[৫]

৬। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ওই নারীর ওপর আল্লাহর রহমত অবতীর্ণ হয়, যে রাতে উঠে নিজে তাহাজ্জুদ নামায পড়ে এবং তাহাজ্জুদ পড়ার জন্য নিজের স্বামীকেও জাগিয়ে দেয়।[৬]

৭। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সর্বশ্রেষ্ঠ নারী হলো ওই নারী, যার দিকে তার স্বামী তাকালে সে তাকে আনন্দ দেয়, স্বামী কোনো আদেশ দিলে সে তা পালন করে এবং নিজের জান ও মালের ক্ষেত্রে তার বিরোধিতা করে তাকে অসন্তুষ্ট করে না।[৭]

৮। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কোনো স্ত্রী যখন দুনিয়াতে তার স্বামীকে কোনো কষ্ট দেয়, তখন জান্নাতে সে যে হুর লাভ করবে, সে বলতে থাকে, আল্লাহ তোকে ধ্বংস করুক, সে তোর কাছে কিছুদিনের মেহমান। খুব শীঘ্রই তোকে ছেড়ে আমাদের নিকট চলে আসবে।[৮]

৯। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সবচেয়ে উত্তম ওই স্ত্রী, যে নিজের ইজ্জত-আবরু হেফাজত করে এবং নিজের স্বামীর প্রতি আসক্ত হয়।

১০। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা ওই নারীকে পছন্দ করেন, যে নিজ স্বামীর সাথে প্রেমময় সম্পর্ক রাখে এবং পরপুরুষ থেকে নিজেকে হেফাজত করে।

---

[৫] *আস সিলসিলাতুয যইফা* : ২২১।
[৬] *সহীহ ইবনে হিব্বান*, হাদীস নং ২৫২৭।
[৭] *আবু দাউদ*, হাদীস নং ১৬৬৪; *হাকীম*, হাদীস নং ১৬৮৭।
[৮] *তিরমিযী*, হাদীস নং ১১৭৪; *ইবনে মাজাহ*, হাদীস নং ২০১৪।

১১। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, এক নারী অন্য নারীর সাথে এমনভাবে মেলামেশা করবে না যে, সে নিজ স্বামীর কাছে এমনভাবে তার বর্ণনা দেওয়া শুরু করে, কেমন যেন স্বামী স্বচক্ষে তাকে দেখছে।[৯]

১২। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, একদল জাহান্নামী মহিলা, যাদেরকে আমি দেখিনি। আমার পর তারা পৃথিবীতে আসবে। তারা বস্ত্র পরিহিত হয়েও উলঙ্গ থাকবে। (অর্থাৎ শরীরে নামেমাত্র কাপড় থাকবে। কিন্তু কাপড় এত পাতলা হবে যে, পুরো শরীর দেখা যাবে।) যারা অন্যদের আকর্ষণকারিণী ও আকৃষ্টা। তাদের মাথার চুল হবে উটের হেলে পড়া কুঁজের ন্যায়। এরা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এমনকি তার খুশবুও পাবে না। অথচ এত এত দূর থেকে তার খুশবু পাওয়া যায়।[১০]

১৩। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে নারী লোকদেখানোর জন্য অলংকার পরবে, কেয়ামতের দিন তাকে তা দিয়েই শাস্তি দেওয়া হবে।

১৪। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা কোনো এক সফরে ছিলেন। সে সময় এক আনসারী নারী একটি উটের পিঠে সওয়ার ছিল। সে তার আচরণে বিরক্ত হয়ে তাকে অভিশাপ দিতে লাগল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুনে বললেন, এর ওপরে যা আছে তা নিয়ে নাও এবং একে ছেড়ে দাও। কেননা সে তো অভিশপ্ত হয়ে গেছে।[১১]

১৫। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে জ্বরের কথা ওঠানো হলে একজন ব্যক্তি তার ব্যাপারে মন্দ বলা শুরু করল। রাসূল বললেন, তোমরা জ্বরকে মন্দ বলো না। এর দ্বারা গুনাহ মাফ হয়।[১২]

১৬। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, বিলাপকারিণী যদি তার মৃত্যুর পূর্বে তাওবা না করে, তাহলে কেয়ামতের দিন তাকে দাঁড়

---

[৯] *সহীহ বুখারী*, হাদীস নং ৫২৪০।
[১০] *সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং ৫৩৯৭।
[১১] *সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং ৬৩৬৮।
[১২] *ইবনে মাজাহ*, হাদীস নং ৩৪৬৯; *ইবনে আবি শাইবা*, হাদীস নং ১০৯১৫।

করানো হবে, তখন তার দেহে আলকাতরার আবরণ থাকবে এবং খসখসে লোহার পোশাক থাকবে।[১৩]

১৭। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, হে মুসলমান নারীরা, কেউ যেন প্রতিবেশীর পাঠানো কোনো জিনিসকে তুচ্ছজ্ঞান না করে, যদিও তা বকরির একটি খুর হয়।[১৪]

১৮। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, এক নারীকে একটি বিড়ালের জন্য আজাব দেওয়া হয়েছে। সে তাকে ধরে বেঁধে রেখেছিল। তাকে খেতেও দেয়নি, ছেড়েও দেয়নি। এভাবেই সে তড়পাতে তড়পাতে মারা গেছে।[১৫]

ফায়েদা : জানোয়ার লালন করে তার খাবার-দাবারের যত্ন না নেওয়াও আজাবের বিষয়।

১৯। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, অনেক নারী-পুরুষ ষাট বছর পর্যন্ত আল্লাহর ইবাদত করে। তারপর যখন মৃত্যুর সময় আসে তখন শরীয়ত-পরিপন্থি অসিয়ত করে জাহান্নামের উপযুক্ত হয়ে যায়।[১৬] (যেমন : অমুক ওয়ারিশকে এই পরিমাণ বেশি দেওয়া।)

নোট : অসিয়তের মাসআলা কোনো বিজ্ঞ আলেমের নিকট জিজ্ঞেস করে সে অনুযায়ী আমল করবেন। কখনো তার বিপরীত করবেন না।[১৭]

---

[১৩] *সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং ২০৩১।
[১৪] *সহীহ বুখারী*, হাদীস নং ২৫৬৬; *সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং ১০৩০।
[১৫] *সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং ২৬১৯।
[১৬] *তিরমিযী*, হাদীস নং ২১১৭।
[১৭] বেহেশতী জেওর : ৮/৬৩।

দ্বিতীয় অধ্যায়

নারীজাতির সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা

এ কথা অনস্বীকার্য যে, বাহ্যিক খাবার-দাবার ও খরচা দিয়ে যেমন স্ত্রী-সন্তান ও পরিবারের অন্যান্যদের শারীরিক প্রতিপালন আবশ্যক, তেমনই শরয়ী জ্ঞান ও সংস্কার-পদ্ধতি অনুসরণ করে তাদের আত্মিক প্রতিপালন করা তার চেয়েও অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের অবহেলা করা হয়। অনেক মানুষ তো এটাকে প্রয়োজনীয়ই মনে করে না। তারা নিজের পরিবারকে না কখনো দ্বীন-ধর্মের কথা বলে, না কোনো অন্যায় কাজে তাদের বাধানিষেধ করে। তারা মনে করে যে, পরিবারকে তাদের চাহিদা অনুপাতে ভরণপোষণ দিয়ে দিলেই নিজের দায়িত্ব থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। অথচ কুরআনে কারীমে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজেদের এবং নিজেদের পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও। (সূরা তাহরিম, ৬৬ : ৬)

এই আয়াতের তাফসীরে আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নিজের পরিবারের সদস্যদের দ্বীন-ধর্মের কথা শেখাও।[১৮] এখান থেকে এ কথা স্পষ্ট হলো যে, নিজের স্ত্রী-সন্তানদের দ্বীনি শিক্ষা দেওয়া ফরয। অন্যথায় জাহান্নামে যেতে হবে। অন্য এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা সকলেই দায়িত্ববান। তোমাদের সকলকেই অধীনস্তদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।[১৯]

অন্য এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, পরিবারকে আল্লাহ-ভীতির উপদেশ প্রদান করো এবং তাদেরকে শাসন করা থেকে বিরত থেকো না।[২০]

---

[১৮] *মুসতাদরাকে হাকীম।*

[১৯] *সহীহ বুখারী*, হাদীস নং ৮৯৩।

[২০] *আল মুজামুল আওসাত; তাবারানী*, হাদীস নং ১৮৬৯; *ইসলাহে ইনকিলাব।*

নারীদের চরিত্র সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা

আমাদের নারীদের আখলাক-চরিত্রের অনেক দুরবস্থা। তাদের এই অবস্থার সংশোধন অনেক বেশি জরুরি। এ কথা স্মরণ রাখতে হবে যে, আখলাক সংশোধন করা ব্যতীত ইবাদত ও আমল কোনো কাজে আসবে না। হাদীসে আছে, এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, অমুক নারী অনেক ইবাদত করে। রাত জেগে ইবাদত করে, কিন্তু নিজের প্রতিবেশীদের কষ্ট দেয়। নবীজী বললেন, সে জাহান্নামে যাবে। তদ্রূপ আরেকজন নারীর ব্যাপারে বলা হলো, সে খুব বেশি ইবাদত করে না, কিন্তু প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণ করে। নবীজী বললেন, সে জান্নাতে যাবে।[২১]

পক্ষান্তরে আমাদের নারীরা শুধু ইবাদত ও যিকির নিয়েই পড়ে আছে। আখলাক-চরিত্র ও সদ্ব্যবহারের প্রতি তাদের কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। অথচ দ্বীনের একটি অংশও যদি অনুপস্থিত থাকে, তাহলে দ্বীনদারি অসম্পূর্ণ থেকে যায়।[২২]

সন্তানদের সুসভ্য করে গড়ে তোলার জন্য নারীদের ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া অত্যন্ত জরুরি। কেননা নারীদের সংস্কার না হওয়ার প্রভাব পুরুষদের ওপরও পড়ে। অধিকাংশ সন্তানই মায়ের কোলে প্রতিপালিত হয়, যারা ভবিষ্যতে পুরুষ হবে। তাদের ওপর মায়েদের অভ্যাস ও ব্যবহারের বিপুল প্রভাব পড়ে। এমনকি বিজ্ঞজনেরা বলে থাকেন, যে সময় বাচ্চাদের মাঝে বুঝবুদ্ধি তৈরি হয়, তখন সে কথা বলতে না পারলেও সমস্ত কাজ ও কথা তার মস্তিষ্কে অঙ্কিত হয়ে যায়। এ জন্য তার সামনে অনর্থক ও সভ্যতা-পরিপন্থি কোনো কথা না বলা কর্তব্য। অনেক দার্শনিক তো এও লিখেছেন যে, বাচ্চা যখন মায়ের পেটে থাকে, তখনও তার ওপর মায়ের কাজের প্রভাব পড়ে। এ জন্যই মেয়েদের শিক্ষাদীক্ষা এবং আত্মিক সংশোধন অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।[২৩]

---

[২১] *মুসনাদে আহমাদ*, হাদীস নং ৯৬৭৫; *ইবনে হিব্বান*, হাদীস নং ৫৭৬৪।
[২২] *ইসলাহুন নিসা মাআ হুকুকুয যাওজায়িন*, ১৯৪।
[২৩] *আত-তাবলীগ ওয়াহজুল ইসতিমা ওয়াল ইত্তিবা*, ১৬৪।

শিক্ষা ও পরিশুদ্ধি ফরজে আইন

অনেকেই আক্ষরিক শিক্ষাকে সকলের জন্য প্রয়োজনীয় মনে করলেও আত্মিক পরিশুদ্ধিকে সকলের জন্য প্রয়োজনীয় মনে করে না। অথচ পরিশুদ্ধির গুরুত্ব শিক্ষার চেয়ে অনেক গুণে বেশি। অ্যাকাডেমিক শিক্ষা ফরজে আইন নয়। অনেক সাহাবী অ্যাকাডেমিক শিক্ষা লাভ করেননি, তথাপি তাদের ওপর তা আবশ্যক করা হয়নি। কিন্তু আত্মিক পরিশুদ্ধি প্রত্যেক ব্যক্তির ওপরই ফরয। বস্তুত ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষা দ্বারা মূলত পরিশুদ্ধিই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। কেননা শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো ইলম তথা জ্ঞান অর্জন করা আর পরিশুদ্ধির উদ্দেশ্য হলো জ্ঞান অনুযায়ী আমল করানো। ইলম দ্বারা আমল করাই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, আর উদ্দেশ্য কর্ম থেকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ হওয়াই স্বাভাবিক। অতএব শুধু শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে পরিশুদ্ধি থেকে দূরে থাকা এবং তা অপ্রয়োজনীয় মনে করার কোনো অবকাশ নেই।[২৪]

নারীদের আত্মিক পরিশুদ্ধির গুরুত্ব

অনেক স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক এমন হয় যে, সব সময় ঝগড়া লেগেই থাকে এবং স্বামী নিজ স্বার্থের কারণে স্ত্রীকে ছাড়তেও পারে না, আবার তাদের অজ্ঞতাকে বরদাশতও করতে পারে না। তাই সংসারে সব সময়ের জন্য লড়াই-ঝগড়ার ভিত্তি স্থাপন হয়ে যায়। যার ফলে উভয় দিকের অবস্থাই ক্রমে খারাপ হতে থাকে এবং উভয়ের জীবন মৃত্যুর চেয়েও বিষাদময় হয়ে যায়। এই সবকিছুর মূল কারণ হলো, প্রথমেই আত্মিক পরিশুদ্ধির প্রতি মনোযোগ না দেওয়া। এখন যদি কারও সংসারের অবস্থা এরূপ হয়েই যায়, তাহলে তা এভাবেই চলতে দেওয়া যাবে না। বরং যখনই সুযোগ হবে, আত্মিক পরিশুদ্ধি করার চেষ্টা করতে থাকতে হবে। মোটকথা বাচ্চাদের শিক্ষাদীক্ষা ও সংস্কারের দায়িত্ব মা-বাবা ও প্রতিপালনকারীদের ওপর বর্তায় আর স্ত্রীদের সংস্কারের দায়িত্ব স্বামীদের কাঁধে বর্তায়।[২৫]

---

[২৪] *ইসলাহে ইনকিলাব*, ২/১৯৭।
[২৫] প্রাগুক্ত, ২/২০১।

নারীদের প্রতি জিজ্ঞাসা এবং তাদের দুরবস্থার আক্ষেপ

নারীদের গাফলতির ব্যাপারে আমার অভিযোগ হলো, তাদের মধ্যে দুনিয়া পূর্ণ করার চিন্তা আছে কিন্তু দ্বীন পূর্ণ করার চিন্তা বিলক্ষণ নেই। হায় আফসোস! আমি বলতে চাচ্ছি, নারীদের দ্বীন-ধর্ম থেকে গাফেল হওয়া যাবে না। তারা যেমন নিজের অলংকার, কাপড় ও ঘরের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের পূর্ণতার ব্যাপারে কখনো গাফেল হন না এবং সময়ে সময়ে স্বামীদের কাছে এসব জিনিসের তাগাদা দিতে থাকেন, তদ্রূপ দ্বীনের পূর্ণতার দিকেও সব সময় সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

দেখা যায়, পুরুষ যদি কখনো স্ত্রীর কোনো চাহিদাকে অপ্রয়োজনীয় বলে দেয়, তখন থালাবাসন ও ঘরের আসবাবপত্র নিয়ে উভয়ের মাঝে বিবাদ শুরু হয়ে যায়। পুরুষ বলে, এসব জিনিসের কোনো প্রয়োজন নেই। আর স্ত্রী বলে, তুমি এই জিনিসের কী বুঝবে, তোমার তো আর সব সময় ঘরের মধ্যে থাকতে হয় না, থাকতে তো হয় আমাকে! কিছু ক্ষেত্রে স্ত্রীর এসব কথা যথার্থই হয়ে থাকে; কেননা বাস্তবেই তার স্বামীর এসব প্রয়োজনের ব্যাপারে কোনো জ্ঞান থাকে না।

পক্ষান্তরে কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই বিবাদের মূল কারণ হয় এই যে, স্ত্রীর তুলনায় স্বামীর মাঝে অল্পেতুষ্টির পরিমাণ বেশি থাকে। স্বামী অল্প জিনিস দিয়েই জীবন চালিয়ে নিতে পারে। কিন্তু স্ত্রীর মাঝে অল্পেতুষ্টির গুণ হয় শূন্যের কোঠায়, তার স্বভাবে বক্রতা থাকে অনেক বেশি। তার পক্ষে অল্প জিনিসে জীবন অতিবাহিত করা তো সম্ভব হয়ই না; বরং যতক্ষণ পর্যন্ত পুরো ঘর বিভিন্ন সামানায় কানায় কানায় পূর্ণ না দেখতে পায়, ততক্ষণ পর্যন্ত সে শান্তি পায় না।

এসব বলার দ্বারা আমার উদ্দেশ্য হলো, স্ত্রীদের দুনিয়ার পরিপূর্ণতার দিকে এতই মনোযোগ থাকে যে, অল্প জিনিসের ওপর তুষ্ট না হয়ে স্বামীদের সাথে ঝগড়া করা শুরু করে দেয়। তাহলে দ্বীনদারিতার বেলায় কেন এই পরিমাণ মনোযোগ থাকে না! এ ক্ষেত্রে অল্পতেই কেন সন্তুষ্ট হয়ে যায়![২৬]

---

[২৬] *আল কামাল ফিদ দ্বীন*, ৭৪।

স্ত্রীদের পরিশুদ্ধির দায়িত্ব স্বামীদের ওপর

স্বামীরা স্ত্রীদের ব্যাপারে আদব-কায়দাহীনতা এবং অজ্ঞতার অভিযোগ করে। কিন্তু তারা নিজেদের দিকে তাকিয়ে দেখুক, তারা নিজেরা স্ত্রীদের সাথে কেমন ব্যবহার করে! তারা তো স্ত্রীদের থেকে শুধু নিজেদের শান্তি কামনা করে। কিন্তু তাদের দ্বীনদারিতার প্রতি সামান্য গুরুত্বও দেয় না। স্ত্রীদের মধ্যে অবশ্যই বেয়াদবি ও ভুলত্রুটি রয়েছে, কিন্তু তাদের এই অবস্থার জন্য স্বামীই অনেকাংশে দায়ী। কেননা তারা স্ত্রীদের দ্বীনদারিতা ঠিক করার প্রতি গুরুত্ব দেয় না এবং তাদের ধর্মীয় অধিকার নষ্ট করে।

আমরা স্বামীরা স্ত্রীদের ব্যাপারে অনেক অভিযোগ তো করিই, কিন্তু এটা ভেবে দেখি না যে, আমরা তাদের কোন কোন হক আদায় করেছি। উদাহরণস্বরূপ তাদের একটি হক ছিল তাদের দ্বীনদারিতার প্রতি খেয়াল রাখা; আরেকটি হক ছিল তাদের সাথে সৌহার্দের আচরণ করা; দাসী ও চাকরদের মতো আচরণ না করা। কিন্তু আমরা এসব হক নষ্ট করে ফেলেছি।

আফসোস! আমরা দুনিয়াবি হকও যথার্থভাবে আদায় করি না, ধর্মীয় হকগুলোর প্রতিও আমাদের ভ্রুক্ষেপ থাকে না। তাই স্ত্রীর নামাযের প্রতিও আমাদের খেয়াল নেই, তার রোযার প্রতিও আমরা দৃষ্টিপাত করি না। এসবের কথা তাদের কাছে বলিও না। স্মরণ রাখবেন, কেয়ামতের দিন আপনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে যে, তুমি স্ত্রী-সন্তানদের দ্বীনদার বানানোর জন্য কতটুকু চেষ্টা করেছ।[২৭]

স্ত্রীদের দ্বীনদার বানানো এবং তাদের পরিশুদ্ধ করা পুরুষদের দায়িত্ব। যদি তারা এতে অবহেলা করে তাদেরকে পাকড়াও করা হবে। কেননা আল্লাহ তাআলা নির্দেশ করেছেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজেদের এবং নিজেদের পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও। (সূরা তাহরিম, ৬৬ : ৬)

---

[২৭] *বুকুকুল বাইত*, ৪৬।

যদি কোনো পুরুষ নিজে মুত্তাকী আল্লাহওয়ালা হয়ে যায় এবং নিজের পরিবারের সদস্যদের দ্বীনদারির খবর না নেয়, তাহলে আল্লাহ তাআলা তাকে পরিবারের সদস্যের সাথে জাহান্নামে পাঠিয়ে দেবেন। শুধু তার মুত্তাকী হয়ে যাওয়া কেয়ামতের দিন তার আজাব থেকে মুক্তির জন্য যথেষ্ট হবে না।[২৮]

পরিবারকে জাহান্নাম থেকে বাঁচানোর উদ্দেশ্য হলো তাদেরকে সতর্ক করতে হবে। অনেকে সতর্ক করে ঠিক, কিন্তু ঢিলেঢালা ছেড়ে দেয়। অনেক সময় বলে, কতবার তো বললাম, সে না মানলে আমি কী করব! বস্তুত স্বামীরাও দ্বীনদারির প্রয়োজনকে প্রয়োজন মনে করেনি। খানা খাওয়া গুরুত্বপূর্ণ, ফ্যাশন প্রয়োজনীয়; একমাত্র অপ্রয়োজনীয় কিছু থাকলে তা হলো ধর্ম![২৯]

নারী-সংস্কারের কর্মপদ্ধতি

আকিদা-বিশ্বাস বিশুদ্ধকরণ-পদ্ধতি

নারীর শিক্ষা ও পরিশুদ্ধির সংক্ষিপ্ত কিন্তু জরুরি কিছু মূলনীতি এই—

১। বিয়ের পর স্ত্রীকে ঘরে আনার সাথে সাথে নিজের সাথে তাকে আন্তরিক করে নেবে।

২। স্বামী-স্ত্রীর মাঝে পরিপূর্ণ আন্তরিকতা সৃষ্টি হওয়ার পর স্বামী তার স্ত্রীর গুরুত্বপূর্ণ আকিদাগুলো যাচাই করে নেবে। উদাহরণস্বরূপ বেহেশতী জেওরের প্রথম খণ্ডে লিখিত আকিদাগুলো তাকে শুনিয়ে ভালো করে বুঝিয়ে তারপর তাকে জিজ্ঞেস করবে, তোমরা আকিদা-বিশ্বাস কী? সে যে বর্ণনা দেবে তার ওপরই ক্ষান্ত থাকবে, বেশি বিশ্লেষণে যাবে না। সমস্ত আকিদা সে বিশদভাবে বলতে পারবে—তার প্রয়োজন নেই। কেননা অনেক সাধারণ মানুষ আকিদা-বিশ্বাসের বিশদ বিবরণ দিতে অক্ষম। তাই এমন লোকদেরকে এ জাতীয় প্রশ্ন করে কষ্টে ফেলবে না।

---

[২৮] *আল কামাল ফিদ দ্বীন*, ১০২।
[২৯] *হুকুকুয যাওজাইন*, ৩৫।

যে আকিদার ব্যাপারে স্ত্রী সন্দেহ ও সংশয় প্রকাশ করবে কিংবা লক্ষণ থেকে তার সংশয় বুঝে আসবে, সে আকিদা তাকে খুব ভালো করে বুঝিয়ে দেবে এবং বলবে, এভাবে বিশ্বাস পোষণ করা আবশ্যক। এভাবে বিশ্বাস তৈরি করে নাও।[৩০]

নামায বিশুদ্ধকরণ-পদ্ধতি

৩। স্ত্রী থেকে পরিপূর্ণ নামাযের বর্ণনা শুনবে। অর্থাৎ নামাযে যা কিছু পাঠ করা হয়, ফরয ওয়াজিব ও সুন্নাত বিষয়গুলো, নামাযের রাকাতসংখ্যা, নিয়ত কীভাবে করতে হয় তা শুনবে, এবং রুকু-সাজদা ও বৈঠকে কীভাবে বসতে হয় তা দেখে নেবে। এ ক্ষেত্রে কোনো ভুল করে থাকলে তা সংশোধন করে দেবে। সংশোধন করে দেওয়ার মানে এই না যে, শুধু একবার মুখে বলে দিয়েই বসে থাকবে। হতে পারে আবার ভুলে যাবে। এমনও হতে পারে যে, একসাথে অনেকগুলো ভুল সংশোধন করার কারণে দুয়েকটা ছুটে যাবে। এ জন্য প্রতিটি ভুল সংশোধন করে তার ওপর বারবার আমল করিয়ে দেখবে। এভাবে আস্তে আস্তে পুরো নামায ঠিক করবে।[৩১]

৪। স্ত্রীকে পর্দার সমস্ত বিধান ও মাসায়েল জানিয়ে দেবে। কার কার সাথে পর্দা করা জরুরি এবং কে কে মাহরাম, যাদের সাথে পর্দা করা জরুরি নয়—এসব জানিয়ে দেবে এবং এর প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেবে। এসব মাসায়েল বেহেশতী জেওরে এবং বক্ষ্যমাণ বইয়েও বিস্তারিত পাওয়া যাবে। এগুলো দেখে দেখে বলে দেবে।

৫। যাদের সাথে স্ত্রীর সব সময় ওঠাবসা করতে হবে, তাদের হকগুলো তাকে ভালোভাবে বুঝিয়ে দেবে। হুকুকুল ইসলাম নামক বইয়ে এবং বক্ষ্যমাণ বইয়েও এই আলোচনা আসবে। তা দেখে দেখে তাকে শুনিয়ে দেবে অথবা বুঝিয়ে দেবে।

৬। স্ত্রীর অন্তরে সমাজের অজ্ঞতাপ্রসূত রীতিনীতির কদর্যতা তৈরি করে দেবে এবং এমনভাবে ঘৃণা তৈরি করবে, যেন সে আর সেগুলোর কাছে না ভিড়ে।

---

[৩০] *ইসলাহে ইনকিলাব*, ২/২০২।
[৩১] *ইসলাহে ইনকিলাব*, ২/২০২।

৭। অন্যান্য অভ্যাস, আমল ও আখলাক-চরিত্রেরও সংশোধন করার প্রচেষ্টা জারি রাখবে। যার সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি হলো, নিম্নোল্লিখিত কিতাবগুলো প্রতিদিন অল্প অল্প করে পড়ে শুনিয়ে দেবে। যেমন : বেহেশতী জেওর, ফুরুয়ুল ঈমান, জাযাউল আমাল, কসদুস সাবিল, তালিমুদ দ্বীন, ইসলাহুর রুসুম, তাবলিগে দ্বীন, আদাবুল মুয়াশারাত, ইসলাহে ইনকিলাহ, আমার (থানভী রাহিমাহুল্লাহর) ওয়াজের বইগুলো অথবা তা থেকেই সংগৃহীত ইসলামী শাদি, তোহফায়ে যাওজাইন, ইসলামী তাহযীব আওর আদাবে যিন্দেগী, আহকামে পর্দা, তারবিয়াতে আওলাদ এবং বিশেষ করে বক্ষ্যমাণ বইটি পড়ে শোনালে অনেক বেশি উপকার হবে। অতঃপর এ সমস্ত কিতাবের শিক্ষা-পরিপন্থি কোনো কাজ দেখা গেলে নরম ভাষায় সতর্ক করে দেবে। এভাবে বারবার সতর্ক করলে বিরক্ত হওয়ার পরিবর্তে উপকার হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ বলেছেন :

وَّذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرٰى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

আপনি মনে করিয়ে দিন। মনে করিয়ে দেওয়া অবশ্যই ঈমানদারকে উপকার করবে। (সূরা যারিয়াত, ৫১ : ৫৫)

৮। স্ত্রীকে খরচ করার আদবগুলোও বোঝাবে; যেন সে অযথা খরচ না করে। অলংকার ও পোশাক-আশাকের প্রতি বেশি গুরুত্ব দেওয়ার ব্যাপারে তার মাঝে ঘৃণা তৈরি করে দেবে।

৯। যদি কোনো সহীহ সুন্নাহর অনুসারী আল্লাহওয়ালা বুযুর্গ পাওয়া যায়, তাহলে স্ত্রীর কাছে তার বরকত ও গুণাবলি নিয়ে আলোচনা করবে। যখন তার মধ্যে ভক্তি সৃষ্টি হবে, তখন তাকে বাইয়াত করিয়ে দেবে। ওই বুযুর্গ যে আমল করতে দেবেন, তা গুরুত্ব দিয়ে পালন করবে। অন্যথায় কসদুস সাবিল নামক কিতাব থেকে কিছু আমল ও যিকির শিখিয়ে দেবে।

১০। যদি ঘরোয়া কাজের মাঝে পড়াশোনা করার একটু সময় বের করা যায় এবং কিছু দ্বীনি কিতাব পড়ানো যায়, তাহলে এটা স্ত্রীর জন্য অনেক কল্যাণকর হবে। এতে করে দ্বীনের ব্যাপারে তার দৃষ্টিভঙ্গি বিস্তৃত হবে। আর দৃষ্টিভঙ্গি যত বিস্তৃত হবে, তত বেশি সংশোধনের আশা বৃদ্ধি পাবে।[৩২]

---

[৩২] *ইসলাহে ইনকিলাব*, ২০৩।

তৃতীয় অধ্যায়

নেক ও দ্বীনদার নারীর গুণাবলি

আল্লাহ তাআলা উত্তম ও দ্বীনদার নারীদের গুণাবলি উল্লেখ করতে গিয়ে কুরআনে কারীমে ইরশাদ করেছেন :

مُسْلِمٰتٍ مُّؤْمِنٰتٍ قٰنِتٰتٍ تٰٓئِبٰتٍ عٰبِدٰتٍ سٰٓئِحٰتٍ

মুসলিম, মুমিন, অনুগত, তাওবাকারী, ইবাদতকারী ও সিয়াম পালনকারী। (সূরা তাহরিম, ৬৬ : ৫)

উপর্যুক্ত আয়াতে আল্লাহ তাআলা উত্তম নারীর যে গুণাবলি বর্ণনা করেছেন, নিম্নে সেগুলোর পরিচয় তুলে ধরছি :

১। মুসলিম হওয়া। মুমিন নারীর সাথে যখন মুসলিম শব্দ ব্যবহার হয়, তখন তা দ্বারা আমল উদ্দেশ্য হয়। অর্থাৎ যে নারী বিশ্বাসী হওয়ার পাশাপাশি আল্লাহর সমস্ত বিধিবিধানের আনুগত্য করে।

২। মুমিন হওয়া। অর্থাৎ বিশ্বাসী হওয়া। একজন মানুষ মুমিন হওয়ার জন্য যেসব বিষয়ের সত্যায়ন করা জরুরি, যেমন একত্ববাদ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালত, পরকাল ইত্যাদি, সেসব জিনিসের প্রতি তার বিশ্বাস থাকতে হবে। সুতরাং এই শব্দ দিয়ে তার আকিদা-বিশ্বাস সঠিক হওয়ার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

৩। কানিতাত তথা অনুগত হওয়া। যার অর্থ হলো তার মধ্যে খুশু-খুযু থাকতে হবে। আমার মনে হয়, এই শব্দ দিয়ে এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মুমিন মুসলমান হওয়ার পাশাপাশি সে আধ্যাত্মিকভাবেও উচ্চ পর্যায়ের হবে। কেননা আধ্যাত্মিকতার মূল উপাদান হলো খুশু-খুযু তথা আল্লাহর ভয় ও বিনয় বিদ্যমান থাকা। কানিতাতের আরেক ব্যাখ্যা হলো, নারী তার স্বামীর অনুগত হবে।

৪। তাওবাকারী হবে। অর্থাৎ সে আমল করার পাশাপাশি তাওবাও করবে। আমল করা সত্ত্বেও নিজের ত্রুটি ও গুনাহের কারণে তাওবা করবে।

৫। ইবাদতকারী হবে। অর্থাৎ তাওবা করার পরও সে নারী ইবাদত ও আমলে কোনো ত্রুটি করবে না। বরং পূর্বের চেয়ে বেশি তৎপর হবে। আমাদের মতো হবে না। আমরা তো তাওবার ভরসায় গুনাহও করি, আবার আমলের মধ্যেও ত্রুটি করি।

৬। সিয়াম পালনকারী হবে। অর্থাৎ সে নারী রোযা পালন করবে। আয়াতের মধ্যে আলাদা করে রোযার উল্লেখ এ কথারই ইঙ্গিত বহন করে যে, রোযা অনেক বড় ইবাদত। অন্যথায় মুসলিম ও ইবাদতকারী হওয়ার গুণের মাঝেই রোযা অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু আল্লাহ তাআলা রোযার বিশেষ গুরুত্ব ও ফযিলতের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য আলাদা করে তার কথা উল্লেখ করেছেন।[৩৩]

দ্বীনে ইসলাম

আল্লাহ তাআলা বলেছেন :

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ

আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য একমাত্র দ্বীন হলো ইসলাম। (সূরা আলে-ইমরান, ৩ : ১৯)

وَ مَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَ هُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۝٨٥

যে ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো ধর্ম অবলম্বন করবে, কস্মিনকালেও তা তার থেকে গৃহীত হবে না। আর পরকালে সে হবে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত। (সূরা আলে-ইমরান, ৩ : ৮৫)

وَ مَنْ يَّرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَيَمُتْ وَ هُوَ كَافِرٌ فَاُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ ۚ وَ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

তোমাদের মধ্যে যে নিজের দ্বীন থেকে ফিরে যাবে এবং কাফের অবস্থায় মারা যাবে, এমন লোকদের নেক আমলগুলো দুনিয়া ও আখেরাতে বরবাদ হয়ে যাবে এবং এমন লোকেরা চিরকাল জাহান্নামে থাকবে। (সূরা আল-বাকারা, ২ : ২১৭)

---

[৩৩] *আন নিসওয়ান ফি রমাযান*, ২১৯।

ফায়েদা : আল্লাহ তাআলা বান্দাদের বুঝশক্তি ও ইচ্ছাশক্তি দিয়েছেন। যা দ্বারা তারা নিজের ইচ্ছায় গুনাহ ও সওয়াবের কাজ করে। গুনাহের কাজে আল্লাহ তাআলা অসন্তুষ্ট হন এবং সওয়াবের কাজে হন সন্তুষ্ট। সারা জীবন কেউ যতই ভালো-মন্দ থাকুক, তার জীবনের সমাপ্তি যে অবস্থায় হবে, প্রতিদান কিংবা শাস্তি সে অনুযায়ীই দেওয়া হবে।[৩৪]

ইসলাম ধর্মের উপাদান

দ্বীনে ইসলামের পাঁচটি উপাদান রয়েছে :

১। প্রথম উপাদান হলো আকিদা-বিশ্বাস। অর্থাৎ মন থেকে এবং মুখে এ কথার স্বীকারোক্তি দেওয়া যে, আল্লাহ এবং রাসূল যে বিষয়ের যেভাবে সংবাদ দিয়েছেন, তা-ই সত্য। এর বিস্তারিত আলোচনা আকিদার কিতাবাদি থেকে জানা যাবে।

২। দ্বীনের দ্বিতীয় উপাদান হলো ইবাদত। অর্থাৎ নামায রোযা হজ যাকাত ইত্যাদি।

৩। মুয়ামালাত। অর্থাৎ বিয়েশাদি, তালাকের বিধিবিধান ও কাফফারা, ক্রয়-বিক্রয়, ভাড়া, কৃষিকাজ ইত্যাদি। এগুলো দ্বীনের উপাদান হওয়ার উদ্দেশ্য এই নয় যে, কীভাবে চাষাবাদ করতে হয় শরীয়ত তা শিখিয়ে দেবে কিংবা ব্যবসা-বাণিজ্যের পদ্ধতি শিখিয়ে দেবে। বরং শরীয়ত বলে যে, কারও ওপর অন্যায় ও অত্যাচার করো না। এমনভাবে লেনদেন করো না, যার দ্বারা ঝগড়া-বিবাদ হওয়ার আশঙ্কা হয়। অর্থাৎ শরীয়ত শুধু জায়েজ-নাজায়েজ ও বৈধ-অবৈধের কথা বলে দেয়। যার বিস্তারিত আলোচনা ফিকহের কিতাবে পাওয়া যাবে।

৪। চার নম্বর উপাদান হলো মুয়াশারাত তথা সামাজিকতা। অর্থাৎ মানুষের সাথে কীভাবে ওঠাবসা করতে হবে, কীভাবে মিলেমিশে থাকতে হবে, কারও ঘরে কীভাবে যেতে হবে, মেহমান কীভাবে হতে হবে এবং তার শিষ্টাচার কী কী, স্ত্রী-সন্তান আত্মীয়-স্বজন অপরিচিত ও চাকর-বাকরদের সাথে কীভাবে ব্যবহার করতে হবে, শরীয়ত এগুলো শিখিয়ে দেবে।

৫। আখলাক-চরিত্র তথা আত্মশুদ্ধি।

---

[৩৪] *হায়াতুল মুসলিমীন*, ৬৭, *তালিমুদ-দ্বীন*, ১২।

এই হলো দ্বীনের পাঁচ উপাদান। এই পাঁচের সম্মিলিত নাম হলো দ্বীন। যদি কারও মধ্যে কোনো উপাদান অনুপস্থিত থাকে, তাহলে তার দ্বীনদারি ত্রুটিপূর্ণ হবে। যেমন : কারও যদি এক হাত না থাকে, সে হয় ত্রুটিপূর্ণ মানুষ। সুন্দর সে, যার নাক কান চোখ সবই সুন্দর। যদি সবই ভালো থাকে শুধু চোখ অন্ধ হয় কিংবা নাক কাটা হয়, তাহলে সে সুন্দর নয়। ঠিক তদ্রূপ দ্বীনদার সে যার মধ্যে দ্বীনের পাঁচটি উপাদানই সম্মিলিত হয়।

এখন ভাবার বিষয় হলো, আমরা এই পাঁচটি উপাদানের প্রতি কতটা গুরুত্ব দিয়েছি। অবস্থা এমন যে, কিছু মানুষ আকিদা-বিশ্বাস ও ইবাদতকে কম করে রেখেছে। একত্ববাদ ও রিসালতের আকিদায় যে গড়বড় করে রেখেছে, তা তো সকলেরই জানা আছে। আকিদার মধ্যে কুরআন-সুন্নাহ বাদ দিয়ে বিদআত-রুসুম ও মানবসৃষ্ট প্রথা প্রচলনের অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে। আল্লাহর ওলীদেরকে আল্লাহর নবীদের চেয়েও বেশি মর্যাদা দিয়ে রেখেছে। আর নবীদেরকে আল্লাহর চেয়ে বেশি মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছে।

দ্বিতীয় উপাদান হলো ইবাদত। এটাও স্পষ্ট বিষয় যে, কতজন মানুষ ধারাবাহিক নামায পড়ে, রোযা কতজন রাখে, যাকাত আদায় করে কয়জনে আর হজ পালন করে কতজন! তৃতীয় উপাদান হলো মুয়ামালাত তথা লেনদেন। এখানে অবস্থা এমন শোচনীয় যে, অনেক বড় বড় দ্বীনদার মানুষও লেনদেনকে দ্বীনের অংশ মনে করে না। অথচ লেনদেন দ্বীনের অংশ হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। চতুর্থ উপাদান হলো মুয়াশারাত তথা সামাজিকতা। এর যে করুণ অবস্থা তা সকলেরই জানা আছে। বিয়েশাদি, আনন্দ অনুষ্ঠান কিংবা শোকপালন—যে যার মনমতো করছে। কারও কাছে জিজ্ঞেস করারও গরজ নেই। ফতোয়া কী বলে তাও জানার প্রয়োজন নেই। বিবি সাহেবা যা বলে দিয়েছেন তাই করে ফেলেছে, যেন বিবি সাহেবাই শরীয়তের মুফতি! দ্বীনের পঞ্চম উপাদান হলো আখলাক-চরিত্র। এ ক্ষেত্রে এত দুরবস্থা যে, দ্বীনদার লোকদের মাঝে এই চিন্তা তো সর্বদাই থাকে যে, পোশাক-আশাক দাড়ি শরীয়ত অনুযায়ী হয়েছে তো! কিন্তু অনেকের আখলাক দেখেন, কী দুরবস্থা! যেন শরীয়তের বাতাস পর্যন্ত লাগেনি।[৩৫]

---

[৩৫] *তরিকুন নাজাত*, ১৫; *তাজদিদে তালিম ওয়া তাবলীগ*, ২২৭।

চতুর্থ অধ্যায়

কিছু গুরুত্বপূর্ণ আকিদার বিবরণ

আল্লাহ তাআলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে যেসব জিনিসের সংবাদ দিয়েছেন, সেগুলোকে এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সত্য জানা এবং এই জ্ঞান যখন বিশ্বাসের পর্যায়ে উন্নীত হয়, তখনই তাকে ঈমান বলে।[৩৬] আল্লাহ তাআলা বলেছেন :

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ لٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ الْمَلٰٓئِكَةِ وَ الْكِتٰبِ وَ النَّبِيّٖنَ ۚ وَ اٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِي الْقُرْبٰى وَ الْيَتٰمٰى وَ الْمَسٰكِيْنَ وَ ابْنَ السَّبِيْلِ ۙ وَ السَّآئِلِيْنَ وَ فِي الرِّقَابِ ۚ وَ اَقَامَ الصَّلٰوةَ وَ اٰتَى الزَّكٰوةَ ۚ وَ الْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا ۚ وَ الصّٰبِرِيْنَ فِي الْبَاْسَآءِ وَ الضَّرَّآءِ وَ حِيْنَ الْبَاْسِ ؕ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا ؕ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ﴿۱۷۷﴾

তোমরা নিজেদের মুখ পূর্ব দিকে করো কিংবা পশ্চিম দিকে, এতে কোনো কল্যাণ নেই; বরং কল্যাণ আছে এতে যে, কোনো ব্যক্তি ঈমান আনবে আল্লাহ, শেষ দিবস, ফেরেশতাগণ, কিতাবসমূহ ও নবীগণের প্রতি এবং আল্লাহর ভালোবাসার্থে ধন-সম্পদ, আত্মীয়-স্বজন, এতিম-মিসকিন, মুসাফির ও যাচনাকারীদের এবং দাসত্বজীবন হতে নিষ্কৃতি দিতে দান করবে এবং নামায কায়েম করবে ও যাকাত দিতে থাকবে, ওয়াদা করার পর স্বীয় ওয়াদা পূর্ণ করবে এবং অভাবে, দুঃখ-ক্লেশে ও সংকটে ধৈর্যধারণ করবে, এ লোকেরাই সত্যপরায়ণ আর এ লোকেরাই মুত্তাকী। (সূরা বাকারা, ২ : ১৭৭)

এই আয়াতে দ্বীনের সমস্ত উপাদানের আলোচনা এসে গেছে। যার বিশ্লেষণ হলো এমন যে, শরীয়তের সমস্ত বিধিবিধান তিন প্রকারের

---

[৩৬] *আল আকিলাত আল গাফিলাত*, ৩১২।

অন্তর্ভুক্ত : (১) আকিদা-বিশ্বাস; (২) আমল এবং (৩) আখলাক। সমস্ত বিধিবিধান এই তিন প্রকারেরই অন্তর্ভুক্ত।[৩৭]

উপরোক্ত আয়াতের মর্ম থেকে বোঝা যায়, শুধু নামাযে পূর্ব-পশ্চিমে মুখ ফিরিয়ে নেওয়াই যথেষ্ট নয়, এতেই সন্তুষ্ট হওয়া যাবে না। বরং আরও অনেক ভালো কাজ আছে। যেমন : ওই ব্যক্তি যে আল্লাহ তাআলা ও কেয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান আনে। আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার ক্ষেত্রে তার সত্তা ও গুণাবলি-সংক্রান্ত সমস্ত বিধিবিধানের ওপর ঈমান আনতে হবে। তদ্রূপ কেয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান আনার ক্ষেত্রে পুরস্কার-শাস্তি, হিসাব-কিতাব, জান্নাত-জাহান্নাম ইত্যাদির ওপর ঈমান আনতে হবে। ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান আনার উদ্দেশ্য হলো, তাদের অস্তিত্ব স্বীকার করা। এতে সমস্ত গায়েবী ও অদৃশ্য সকল বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। যেহেতু শরীয়ত জানার মূল মাধ্যম ছিল ফেরেশতা, তাই তাদেরকে বিশেষ করে উল্লেখ করা হয়েছে।

কিতাব তথা কুরআনে কারীমের প্রতি ঈমান আনতে হবে। কুরআন এমন এক পূর্ণাঙ্গ কিতাব, যা পূর্বের সমস্ত কিতাবের বিষয়বস্তুকে ধারণ করে। তাই তার ওপর ঈমান আনলে সকল আসমানী কিতাবের পর ঈমান আনা হয়ে যাবে। তা ছাড়া আসমানী প্রত্যেক কিতাব পরবর্তী কিতাবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার নির্দেশ দেয়। সুতরাং যদি কেউ একটি বিশ্বাস করে এবং অন্যটি অস্বীকার করে, তাহলে বস্তুত সে প্রথম কিতাবের প্রতিই বিশ্বাসী নয়। এটা তো হলো বিশ্বাস স্থাপনের ব্যাপার। কিন্তু আমলের ক্ষেত্রে সমস্ত কিতাবের ওপর আমল করা যাবে না। বরং শুধু সর্বশেষ কিতাবের ওপর আমল করতে হবে। আর তা হলো আল কুরআন। কেননা কুরআন পূর্বের সমস্ত কিতাবকে রহিত করে দিয়েছে।

উক্ত আয়াতে পঞ্চম যে বিষয়ের প্রতি ঈমান আনার কথা বলা হয়েছে তা হলো, সমস্ত নবীর প্রতি ঈমান আনা।[৩৮] আল্লাহর প্রেরিত সমস্ত নবীর প্রতিই ঈমান আনতে হবে। তবে আমলের ক্ষেত্রে শুধু সর্বশেষ নবীকেই

---

[৩৭] *আল কামাল ফিদ দীন*, ১৯০।
[৩৮] প্রাগুক্ত।

অনুসরণ করতে হবে। আর তিনি হলেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

গুরুত্বপূর্ণ আকিদাগুলোর বিশ্লেষণ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ঈমান হলো এই, আল্লাহ তাআলা, তাঁর সমস্ত ফেরেশতা, তাঁর সমস্ত নবী, তাঁর সমস্ত কিতাব, পরকাল দিবস এবং তাকদীর তথা ভালো-মন্দ ভাগ্যের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা।[৩৯] মুসলিম শরীফের অন্য বর্ণনায় আছে, জান্নাত জাহান্নাম ও মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হওয়ার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা।[৪০]

আল্লাহ তাআলার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করার পাশাপাশি তাঁর সত্তা ও তাঁর গুণাবলির ওপরও বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। তাকে এক ও অনন্য জানতে হবে।[৪১] আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের নিকট আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার উদ্দেশ্য হলো, তাঁর একত্ববাদের এবং তাঁর অন্যান্য সমস্ত পরিপূর্ণতার গুণাবলির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। অর্থাৎ তিনি এক। তাঁর কোনো শরীক নেই। তিনি সর্বদা আছেন এবং সর্বদা থাকবেন। সমগ্র বিশ্ব তিনিই সৃষ্টি করেছেন। তিনি মহা ক্ষমতার অধিকারী। তিনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। সমগ্র পৃথিবীতে যা কিছু ঘটবে, তিনি পূর্বেই সবকিছু লিখে দিয়েছেন। তাঁর মতো কোনো জিনিস নেই। তাঁর ক্ষমতা ও জ্ঞানের বাহিরে কোনো জিনিস নেই। তিনিই সকলের সৃষ্টিকর্তা ও রিযিকদাতা। তিনিই জীবন দান করেন, তিনিই মৃত্যু দান করেন। তিনিই ক্ষমতাবান। তিনি প্রজ্ঞাবান—এ সবকিছু বিশ্বাস করা।[৪২]

কালিমা তাইয়িবার ব্যাখ্যা

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর মর্ম হচ্ছে আল্লাহ তাআলার একত্ববাদের স্বীকারোক্তি দেওয়া। শরীয়তপ্রণেতা থেকে তাওহীদ তথা একত্ববাদের

---

[৩৯] *সহীহ বুখারী*, হাদীস নং ৫০; *সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং ০৯।
[৪০] *ফুরুউল ঈমান*, ৮।
[৪১] প্রাগুক্ত, ৮।
[৪২] *খুতবাতুল আহকাম*, ১৫।

দুটি অর্থ প্রমাণিত রয়েছে : এক। আল্লাহ ছাড়া উপাসনার উপযুক্ত কেউ নেই। দুই। আল্লাহ ছাড়া কেউ উদ্দেশ্য নয়। প্রথম অর্থটি কুরআনে কারীমের স্পষ্ট বিবরণ থেকে প্রমাণিত হয়। আল্লাহ তাআলা বলেছেন :

وَمَآ أُمِرُوٓا۟ إِلَّا لِيَعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ

তাদের তো কেবল এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তারা একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর জন্য ইবাদত করবে। (সূরা বাইয়্যিনাহ, ৯৮ : ৫)

কুরআনে কারীমের অসংখ্য স্থানে এ কথা বিদ্যমান রয়েছে। এটাই ওই তাওহীদ—যা একদম ছেড়ে দিলে কিংবা যার মধ্যে ত্রুটি করলে মানুষ কাফের ও মুশরিক হয়ে যায় এবং চিরকালীন জাহান্নামের বাসিন্দা হয়ে যায়; এটা কখনো ক্ষমা করা হবে না।

তাওহীদের দ্বিতীয় অর্থের প্রমাণ এভাবে পাওয়া যায়, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকদেখানো ইবাদতকে শিরকে আসগর তথা ছোট শিরক আখ্যায়িত করেছেন। মাহমুদ বিন লাবিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের ব্যাপারে অত্যন্ত ভয়াবহ যে জিনিসের আশঙ্কা করি তা হলো শিরকে আসগর। লোকজন বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, শিরকে আসগর কী? তিনি বললেন, রিয়া তথা লোকদেখানো ইবাদত।[৪৩] এ কথা স্পষ্ট যে, যে লোকদেখানো ইবাদত করে, সে অন্যদেরকে মাবুদ তথা প্রভু হিসেবে মানে না। বরং তাদের সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য থাকে। আল্লাহ ভিন্ন অন্য কারও সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য হওয়াও একটি শিরক। অতএব শিরকের বিপরীত তাওহীদের মূল উদ্দেশ্য হবে এই যে, ইবাদত শুধু আল্লাহর জন্য করা হবে এবং একমাত্র তাঁর সন্তুষ্টির লক্ষ্যেই করা হবে।[৪৪]

পূর্ণাঙ্গ একত্ববাদ

ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমার উম্মতের সত্তর হাজার মানুষ বিনা হিসাবে

---

[৪৩] *আল বুদুরুস সাফিরা*, ২৩৩।
[৪৪] *বয়ানুল কুরআন; ফুরুউল ঈমান*।

জান্নাতে প্রবেশ করবে। তারা হলো এই—যারা ঝাড়ফুঁক করে না, যারা কুলক্ষণ গ্রহণ করে না; বরং নিজ রবের ওপর ভরসা করে।[৪৫] হাদীসে ঝাড়ফুঁক দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যে ঝাড়ফুঁক নাজায়েজ, তা না করা। কতক উলামায়ে কেরাম বলেছেন, উত্তম হলো একেবারেই ঝাড়ফুঁক না করা।

কুলক্ষণ গ্রহণের মানে হলো, উদাহরণস্বরূপ কেউ হাঁচি দিল কিংবা সামনে দিয়ে কোনো প্রাণী চলে গেল—ইত্যাদি বিষয়কে অপয়া মনে করে ওয়াসওয়াসায় পড়ে যাওয়া। এ জাতীয় ওয়াসওয়াসা থেকে বিরত থাকতে হবে। কেননা প্রকৃত প্রভাব বিস্তারকারী একমাত্র আল্লাহ তাআলা।[৪৬]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বলেন, তুমি কিছু চাইলে আল্লাহর কাছে চাইবে। সাহায্য প্রার্থনা করলে আল্লাহর কাছে করবে। এ কথা বিশ্বাস করবে যে, যদি সমস্ত মানুষ তোমার কোনো উপকার করার জন্য একত্রিত হয়, তাহলে শুধু ততটুকুই করতে পারবে, যতটুকু আল্লাহ তাআলা তোমার জন্য লিখে রেখেছেন। তদ্রূপ যদি সমস্ত মানুষ তোমার কোনো ক্ষতি করার জন্য একমত হয়, তাহলে শুধু ততটুকুই ক্ষতি করতে পারবে, যতটুকু আল্লাহ তোমার জন্য লিখে রেখেছেন।[৪৭]

শিরক

শিরক দুই প্রকার : আকিদা-বিশ্বাসে শিরক এবং আমল ও কর্মে শিরক।
এক। আকিদার শিরক হলো, আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে উপাসনা করার যোগ্য মনে করা। এই শিরকের ব্যাপারেই কুরআনে কারীমে বলা হয়েছে,

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

> আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করলে আল্লাহ তা ক্ষমা করবেন না। এ ছাড়া যাকে ইচ্ছা অন্য সবকিছু ক্ষমা করে দেবেন। (সূরা নিসা, ৪ : ৪৮)

---

[৪৫] *সহীহ বুখারী*, হাদীস নং ৬৪৭২; *সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং ২২০।
[৪৬] *ফুরুউল ঈমান*, ১১।
[৪৭] *মুসনাদে আহমাদ*, হাদীস নং ২৭৬৩; *তিরমিযী*, হাদীস নং ২৫১৬।

দুই। আমলের শিরক হলো, আল্লাহর সাথে যে আচরণ করা দরকার, অন্য কারও সাথে তা করা। এই শিরকে অধিকাংশ সাধারণ মানুষ এবং বিশেষত নারীরা বেশি লিপ্ত। যেমন : আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্য কারও কসম খাওয়া, অন্য কারও মানত মানা, কোনো জিনিসকে স্বাভাবিক শক্তিশালী মনে করা, কাউকে সম্মানের সাজদা করা, বাইতুল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুর তাওয়াফ করা, সওয়াবের উদ্দেশ্যে কোনো কবরের ওপর কিছু উৎসর্গ করা। এ জাতীয় সহস্র কাজ আছে যেগুলো কঠিন গুনাহের কাজ। মুসলমানদের দায়িত্ব হলো নিজেদের ঘরে এসব বিষয়কে চূড়ান্তভাবে বন্ধ করে দেওয়া।[৪৮]

শিরকের প্রকারভেদ

১। **শিরক ফিল ইলম** : কোনো বুযুর্গ বা পীরের ব্যাপারে এই বিশ্বাস রাখা যে, তিনি সব সময় আমাদের সবকিছুর খবর জানেন। জ্যোতিষী পণ্ডিতের কাছে অদৃশ্যের খবরাখবর জিজ্ঞেস করা। কোনো বুযুর্গের কথায় সুলক্ষণ দেখে তাকে নিশ্চিত মনে করা। মানুষজন আজকাল ফালনামা দেখে তার ওপর বিশ্বাস করে। তদ্রূপ কাউকে দূর থেকে ডাকা এবং মনে করা যে, সে এই ডাক শুনতে পেয়েছে। এ জাতীয় ধারণা ও বিশ্বাসগুলো শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

২। **শিরক ফিত তাসাররুফ** : আল্লাহ ব্যতীত কাউকে লাভ-ক্ষতির ক্ষমতাবান মনে করা। কারও কাছে মনের আর্জি প্রার্থনা করা। কারও কাছে জীবিকা ও সন্তান কামনা করা। এ জাতীয় বিষয়গুলো এই শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

৩। **শিরক ফিল ইবাদত** : আল্লাহ ব্যতীত কাউকে সাজদা করা। কারও নামে প্রাণী উৎসর্গ করা। কারও নামে পশু জবাই করা। কারও নামে মানত মানা। কারও কবর বা বাড়ি তাওয়াফ করা। আল্লাহর হুকুমের বিপরীতে অন্য কারও কথা বা কোনো রসম-রেওয়াজকে প্রাধান্য দেওয়া। কারও নামের দোহাই দেওয়া। কারও নামে রোযা রাখা। কোনো স্থানকে

---

[৪৮] *ফুরুউল ঈমান*, ১৩।

কাবা শরীফের মতো সম্মান করা। এ জাতীয় কাজগুলো এই শিরকের আওতাভুক্ত।[৪৯]

৪। **গাইরুল্লাহর মানত মানা :** অনেকে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও নামে মানত করে। এমনকি কিছু লোক তো প্রকাশ্যে এভাবে বলে যে, হে অমুক বুযুর্গ, যদি আমার কাজ হয়ে যায় তাহলে আপনার নামে খানা খাওয়াব অথবা আপনার কবর তাওয়াফ করব। এসব স্পষ্ট শিরক। কেননা মানত মানাও এক ধরনের ইবাদত। আর ইবাদতে কাউকে শরীক করা স্পষ্ট শিরক। এর প্রতিকার হলো তাওবা করা এবং আকিদা-বিশ্বাস ঠিক করা।[৫০]

কেয়ামত ও আখেরাত

আখেরাত তথা পরকালের প্রতি ঈমান আনাও অতীব জরুরি। কবরের প্রতিদান কিংবা শাস্তি, মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হওয়া, পুলসিরাত, হাউজে কাউসার, আমলনামা মাপা এবং কেয়ামতের বিভিন্ন ঘটনার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা আখেরাতের ওপর ঈমান আনার অন্তর্ভুক্ত।[৫১] এই বিশ্বাস লালন করতে হবে, মৃত্যুর পর কবরে প্রশ্ন করা হবে। কবর থেকে কেয়ামতের দিন ওঠানো হবে। আমলনামা মাপা হবে। সকল কাজের হিসাব হবে। নেক বান্দাদেরকে হাউজে কাউসার থেকে পানি পান করানো হবে। জাহান্নামের ওপর পুলসিরাত নির্মাণ করা হবে, যা চুলের চেয়েও তীক্ষ্ণ এবং তরবারির চেয়েও ধারালো হবে। জান্নাতীরা এটা পাড়ি দিয়ে জান্নাতে যাবে আর জাহান্নামীরা এখান থেকে কাটা পড়ে জাহান্নামে যাবে। কেয়ামতের দিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুপারিশ করবেন। জান্নাত ও জাহান্নাম সর্বদাই থাকবে, কখনো তা শেষ হবে না এবং সেখানকার বাসিন্দারাও কখনো মরবে না।[৫২]

মানুষ মারা গেলে যদি দাফন করা হয়, তাহলে দাফনের পর কিংবা মৃত্যুর পর যে অবস্থাতেই থাকুক, তার কাছে দুইজন ফেরেশতা আসবেন।

---

[৪৯] *তালিমুদ দ্বীন*, ১৩-১৪।
[৫০] *ইসলাহে ইনকিলাব*, ১/১৮৮।
[৫১] *ফুরুউল ঈমান*, ১৩।
[৫২] *খুতবাতুল আহকাম*, ৬১।

একজনের নাম মুনকার, আরেকজনের নাম নাকির। তারা এসে জিজ্ঞেস করবেন, তোমার প্রতিপালক কে? তোমার দ্বীন কী? মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হবে যে, ইনি কে?

যদি মৃত ঈমানদার ঠিকঠাক উত্তর দিতে পারে, তাহলে তার জন্য সব ধরনের আরামের ব্যবস্থা করা হয়। আর যদি সে ঈমানদার না হয়, তাহলে সে সব প্রশ্নের উত্তরে বলতে থাকে যে, আমি এসব কিছুই জানি না। তখন তার ওপর অনেক কঠোর শাস্তি নেমে আসে। কিছু মানুষকে আল্লাহ তাআলা এই পরীক্ষা থেকে মাফ করে দেন। তবে কবরের এই বিষয়গুলো শুধু মৃত ব্যক্তিরই জানা থাকে, অন্য লোকজন তা টের পায় না। যেমন : ঘুমন্ত ব্যক্তি স্বপ্নে সবকিছু দেখতে পায়, কিন্তু জাগ্রত ব্যক্তি তার নিকটে বসে থাকলেও কিছুই টের পায় না।

আল্লাহ তাআলা ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেয়ামতের ব্যাপারে যে আলামতের বর্ণনা দিয়েছেন, সেগুলো অবশ্যই সংঘটিত হবে। যখন সমস্ত নিদর্শন বাস্তবায়ন হবে, তখনই কেয়ামতের কার্যক্রম শুরু হবে। ইসরাফিল আলাইহিস সালাম আল্লাহর নির্দেশে শিঙ্গায় ফুঁ দেবেন। এই ফুঁয়ের আওয়াজে সমস্ত আসমান-জমিন ফেটে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। সমগ্র সৃষ্টি মারা যাবে। যারা মারা গেছে তাদের আত্মাগুলো বেহুঁশ হয়ে যাবে। তবে আল্লাহ তাআলা যাদেরকে বাঁচিয়ে রাখতে চান, তারা স্ব অবস্থায় বহাল থাকবে। একটা দীর্ঘ সময় এভাবেই কেটে যাবে।

তারপর আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা অনুযায়ী সমগ্র জগৎ পুনরায় সৃষ্টি হবে। দ্বিতীয়বার শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়া হবে। সমগ্র জগৎ অস্তিত্বে চলে আসবে। মৃতরা জীবিত হয়ে যাবে। সকলে কেয়ামতের ময়দানে একত্র হবে এবং সেখানকার ভয়াবহতা দেখে ঘাবড়ে গিয়ে সকল নবীর কাছে সুপারিশ করার আবেদন করার জন্য যাবে। পরিশেষে আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুপারিশ করবেন। সেদিন ভালো-মন্দ সমস্ত আমল পরিমাপ করা হবে এবং তার হিসাব হবে। তবে কিছু লোক বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। ভালো লোকদের আমলনামা ডান হাতে আর খারাপ লোকদের আমলনামা বাম হাতে দেওয়া হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় উম্মতকে হাউজে কাউসারের পানি

পান করাবেন—যা দুধের চেয়েও সাদা এবং মধুর চেয়েও মিষ্টি হবে। সকল মানুষকে পুলসিরাতের ওপর চলতে হবে। যারা ভালো মানুষ, তারা তা অতিক্রম করে জান্নাতে চলে যাবে। আর যারা খারাপ মানুষ, তারা তার ওপর থেকে জাহান্নামে পতিত হবে।[৫৩]

জান্নাত ও জাহান্নাম

জান্নাত সৃষ্টি করা হয়ে গেছে। তার মধ্যে বিচিত্র নেয়ামত ও আরাম-আয়েশ রয়েছে। জান্নাতীদের কোনো ধরনের ভয় বা দুশ্চিন্তা থাকবে না। তারা চিরকাল সেখানে থাকবে। সেখান থেকে বেরও হবে না, মারাও যাবে না। জান্নাতের সবচেয়ে বড় নেয়ামত হলো আল্লাহর দর্শন লাভ। এই নেয়ামতের সামনে সমস্ত নেয়ামত তুচ্ছ মনে হবে।

জাহান্নামও সৃষ্টি করা হয়ে গেছে। তার মধ্যে সাপ-বিচ্ছু এবং বিভিন্ন ধরনের শাস্তি রয়েছে। জাহান্নামীদের যাদের মধ্যে অণু পরিমাণ ঈমান থাকবে, সে যত বড় গুনাহগারই হোক না কেন, নিজের কৃতকর্মের শাস্তি ভোগ করার পর নবী ও নেক বান্দাদের সুপারিশে সেখান থেকে বের হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যারা কাফের-মুশরিক আছে, তারা চিরকাল সেখানে থাকবে, তাদের মৃত্যুও হবে না।[৫৪]

ফায়দা : মৃত ব্যক্তির জন্য দুআ করে কিছু দান-সদকা করলে সে এর সওয়াব লাভ করে এবং এতে তার অনেক বেশি উপকার হয়।[৫৫]

তাকদীর বা ভাগ্য

দুনিয়াতে ভালো-মন্দ যা কিছু ঘটে আল্লাহ তাআলা তা সংঘটনের পূর্ব থেকেই জানেন এবং নিজের জ্ঞান অনুযায়ী তা সৃষ্টি করেন। এটার নামই তাকদীর। যার ওপর বিশ্বাস রাখা অপরিহার্য।[৫৬]

---

[৫৩] *তালিমুদ দ্বীন*, ১১-১২।
[৫৪] প্রাগুক্ত, ১২।
[৫৫] প্রাগুক্ত, ১১।
[৫৬] *তালিমুদ দ্বীন*, ৭।

জাবের রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ পরিপূর্ণ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তাকদীরের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে; ভালো ও মন্দ সকল তাকদীরের ওপরই ঈমান আনবে। এমনকি এ কথাও বিশ্বাস করবে যে, যা তার ভাগ্যে লেখা আছে তা তার থেকে লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে না, আর যা তার ভাগ্যে লেখা নেই সে তা পাবে না।[৫৭]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা সমস্ত বান্দার পাঁচটি বিষয় নির্ধারণ করে দিয়েছেন : (১) তার জীবনকাল; (২) তার রিযিক; (৩) তার আমল; (৪) তার দাফন হওয়ার স্থান এবং (৫) সে সৌভাগ্যবান বা হতভাগা।[৫৮]

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, দুর্বল মুমিনের চেয়ে শক্তিশালী মুমিন উত্তম এবং আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয়। তবে উভয়ের মাঝেই কল্যাণ রয়েছে। তোমার উপকারী বিষয়ের প্রতি যত্নবান হও। আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করো এবং হাত গুটিয়ে বসে থেকো না। তোমার ওপর কোনো আপদ এলে এ কথা বলবে না যে, যদি আমি এমন করতাম তাহলে এমন হতো; বরং বলবে, এটা আল্লাহর নির্ধারণ, তিনি যা ইচ্ছা করেছেন।[৫৯]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আদম সন্তানের সৌভাগ্য হলো এই যে, সে আল্লাহর কাছে কল্যাণ কামনা করবে এবং তার নির্ধারণের ওপর সন্তুষ্ট থাকবে। আর তার হতভাগ্য হলো, সে আল্লাহর কাছে কল্যাণ কামনা ছেড়ে দেবে এবং তাঁর বিধানের প্রতি অসন্তুষ্ট থাকবে।[৬০]

ফায়দা : তাকদীরের ওপর সন্তুষ্ট থাকার মানে এই না যে, কোনো দুর্ঘটনার কারণে অন্তরেও কোনো ধরনের ব্যথা আসতে পারবে না।

---

[৫৭] *তিরমিযী*, হাদীস নং ২১৪৪।
[৫৮] *সহীহ বুখারী*, হাদীস নং ৬১৪২, ৬৫৯৪।
[৫৯] *সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং ২৬৬৪।
[৬০] *তিরমিযী*, হাদীস নং ২১৫১।

বেদনা তো স্বাভাবিক বিষয়, এটা কারও ইচ্ছাধিকারে নেই। বরং উদ্দেশ্য হলো, অন্তর থেকে তাকদীরের প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে, তার বিপরীতে অভিযোগ ও অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে না। যেমন : কারও টিউমার হলে সে খুশিমনে ডাক্তারকে অপারেশন করার অনুমতি দেয়, কিন্তু তার কষ্ট ও ব্যথা হয়ে থাকে। এতে তার অন্তর সন্তুষ্ট থাকে।[৬১]

তাকদীরের ওপর ভরসা রাখার লাভ

বিপদাপদ ও পেরেশানি যত কঠিনই হোক না কেন, তাকদীরের বিশ্বাস থাকলে অন্তর শক্ত থাকবে। বান্দা তখন মনে করবে যে, আল্লাহ তাআলা এমনই নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এর বিপরীত হওয়া সম্ভব নয়। তিনি যখন ইচ্ছা এই মুসিবত শেষ করে দেবেন। এই বিশ্বাস কারও অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে গেলে বিপদ দূর হতে বিলম্ব হলেও সে পেরেশান ও হতাশ হবে না, তার অন্তর দুর্বল হবে না। সে মনে মনে ভাববে, আল্লাহ না চাইলে এই মুসিবত দূর করা সম্ভব না। তখন সে সমস্ত চেষ্টা-তদবিরের পাশাপাশি আল্লাহ তাআলার কাছে দুআও করতে থাকবে। যার ফলে আল্লাহর সাথে তার ঘনিষ্ঠতা তৈরি হবে; যা সকল সুখের মূল।[৬২]

ফেরেশতা

আল্লাহ তাআলা নূর দ্বারা কিছু জীব সৃষ্টি করেছেন এবং তাদেরকে আমাদের চোখের আড়াল করে দিয়েছেন। তাদেরকে ফেরেশতা বলে। তাদের হাতে অনেক কিছুর দায়িত্ব ন্যস্ত। তারা কখনো আল্লাহ তাআলার নির্দেশের বিপরীত কোনো কাজ করে না। তাদের মধ্য থেকে চারজন অধিক প্রসিদ্ধ : জিবরীল আলাইহিস সালাম, মিকাইল আলাইহিস সালাম, ইসরাফিল আলাইহিস সালাম ও আজরাইল আলাইহিস সালাম।[৬৩] ফেরেশতারা পুরুষ না মহিলা, কোনো দলিল দ্বারা তা প্রমাণিত হয়নি বিধায় নির্দিষ্ট করে তাদের পুরুষ বা নারী হওয়ার বিশ্বাস রাখা যাবে না।

---

[৬১] *ফুরুউল ঈমান*, ২৮।
[৬২] *হায়াতুল মুসলিমীন*, ৮৮।
[৬৩] *তালিমুদ দ্বীন*, ৮।

এ বিষয়কে আল্লাহর জ্ঞানের ওপর ন্যস্ত করে দেবে।[৬৪] যারা ফেরেশতাদের অস্তিত্ব অস্বীকার করবে তারা কাফের।[৬৫]

নবী ও রাসূল

মানবজাতিকে সঠিক রাস্তা দেখানোর জন্য আল্লাহ তাআলা অনেক নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। তারা সকলেই সব ধরনের গুনাহ থেকে পবিত্র। তাদের সঠিক সংখ্যা একমাত্র আল্লাহ তাআলাই জানেন।[৬৬]

নবী-রাসূলদের ওপর ঈমান আনার উদ্দেশ্য হলো এই বিশ্বাস লালন করা যে, তারা আল্লাহর নেক বান্দা এবং তাঁর রাসূল। আল্লাহ তাআলা মানবজাতির হেদায়েতের জন্য তাদেরকে প্রেরণ করেছেন। তারা সত্য। যে সংবাদ ও বিধিবিধান তারা দিয়ে গেছেন তা সত্য।[৬৭] নবীদের মধ্যে কেউ কেউ অন্যদের তুলনায় মর্যাদায় বড়। সবচেয়ে বেশি মর্যাদা আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের। তার পর কোনো নতুন নবী আসবে না। কেয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ ও জিন আসবে, তিনি সকলের নবী।

আল্লাহ তাআলা জিবরীল আলাইহিস সালামের মাধ্যমে নবীদের ওপর ছোট-বড় অনেক কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। যেন তারা নিজ নিজ জাতিকে দ্বীনের কথা বলতে পারেন। এর মধ্যে চারটি কিতাব অনেক বেশি প্রসিদ্ধ : তাওরাত, ইনজিল, যাবুর ও কুরআন।

কুরআন মাজীদ আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর নাযিল করা হয়েছে। কুরআন মাজীদ আল্লাহ তাআলার কালাম। জিবরীল আলাইহিস সালাম তা বহন করে এনেছেন। কুরআন মাজীদ সর্বশেষ কিতাব। এখন আর আসমান থেকে কোনো কিতাব আসবে না। কেয়ামত পর্যন্ত কুরআনের বিধান চলতে থাকবে। অন্যান্য কিতাবগুলোকে

---

[৬৪] *ফুরুউল ঈমান*, ১৩।
[৬৫] *খুতবাতুল আহকাম*, ১৬।
[৬৬] *তালিমুদ দ্বীন*, ৭।
[৬৭] *খুতবাতুল আহকাম*, ১৬।

ভ্রান্ত লোকেরা অনেক বেশি বিকৃত করে ফেলেছে। কিন্তু কুরআনের হেফাজতের প্রতিশ্রুতি স্বয়ং আল্লাহ তাআলা গ্রহণ করেছেন। ফলে কেউ তা বিকৃত করতে পারবে না।[৬৮]

কিছু ভ্রান্ত বিশ্বাস

লোক সমাজে প্রচলিত কিছু বিশ্বাস রয়েছে ভুল আর কিছু আছে বাস্তবতাবিরোধী। নারীরা এসব বিশ্বাসে বিশ্বাসী হয়ে থাকে। নারীরা অনেক ভালো জিনিসকে মন্দ আর অনেক মন্দ জিনিসকে ভালো মনে করে। যেমন, নির্দিষ্ট দিনকে অশুভ মনে করা। অধিকাংশ নারী বুধবার দিনকে এবং যিলকদ ও মুহাররম মাসকে অশুভ ও বরকতহীন মনে করে। এমনকি কিছু পুরুষও এই বিশ্বাসে লিপ্ত আছে। অনেক নারী বিশ্বাস করে, কোনো দিন যদি ঘরে কাক প্রবেশ করে তাহলে ওই দিন অবশ্যই ঘরে মেহমান আসে। তদ্রূপ যদি আটায় পানি বেশি হয়ে যায় তাহলে ঘরে মেহমান আসার কথা মনে করে। অনেক প্রাণীকে অশুভ মনে করে। যেমন : ঘুঘু পাখিকে অশুভ মনে করে, তাই ঘরে তা পালতে চায় না।

পুরুষরাও কিছু জিনিসকে অশুভ মনে করে। যেমন, প্যাঁচার ব্যাপারে বলা হয়, যে স্থানে প্যাঁচা ডাকে তা বিরান হয়ে যায়, তাই তা অশুভ। অথচ এটা একদম ভুল। না প্যাঁচা অশুভ, না তার আওয়াজে কোনো স্থান বিরান হয়। স্মরণ রাখবেন, সে যখন ডাকে তখন মূলত আল্লাহর যিকির করে। তো আল্লাহর যিকির থেকে কি কুলক্ষণ সৃষ্টি হতে পারে! নাউযুবিল্লাহ। অনেকের ধারণা, প্যাঁচা যিকির করে ঠিক, কিন্তু তার যিকির হলো যিকরে জালালী তথা পাওয়ারফুল যিকির। এ জন্য তার প্রভাব পড়ে। অথচ যিকিরের এই প্রকার এবং তার বৈশিষ্ট্য পুরোটাই অমূলক কথা।

তবে এ কথা বাস্তবসম্মত যে, প্যাঁচা সাধারণত নির্জন স্থান তালাশ করে, যেন সব আশঙ্কা থেকে মুক্ত থাকা যায়। এখন বলুন, যে স্থান আগে থেকেই নির্জন বিরান, সেটা কীভাবে বিরান হলো? সেটা তো আমাদের গুনাহ ও মন্দ কাজের কারণে হয়েছে। তারপর প্যাঁচা সেখানে আসে এবং আওয়াজ দেয়, তখন আমরা নিজেদের দোষারোপ করার পরিবর্তে

---

[৬৮] *তালিমুদ দ্বীন*, ১৮; *খুতবাতুল আহকাম*, ১৬।

প্যাঁচাকে দোষারোপ করতে থাকি! এখন বলুন, অশুভ প্যাঁচা নাকি গুনাহগার লোকজন?![৬৯]

কোনো কিছুই অশুভ নয়

কোনো জিনিসকে অশুভ বিশ্বাস করা একটি বিভ্রান্তি। অশুভ যা কিছু হয় তা আমাদের মধ্যে থাকা গুনাহের কারণে হয়ে থাকে। কিন্তু আফসোসের বিষয় হলো, আমাদের নিজেদের ভেতর দৃষ্টি পড়ে না, অন্যদের ওপর ঠিকই পড়ে। অশুভতা খোদ নিজের মধ্যেই বিদ্যমান; একের পর এক গুনাহ করেই যাচ্ছি। আর মনে করছি কি! প্যাঁচা অশুভ, ঘুঘু অশুভ! কিছু মানুষ মহিলাদের কালো ঠোঁট দেখলে তাকেও অশুভ মনে করে। এটাও ভুল।

অনেক নারী কলাগাছকে অশুভ মনে করে। বলা হয়, এই গাছ মুর্দার কাজে ব্যবহৃত হয়, তাহলে তা ঘরে আনা ঠিক না। কেননা এটা অশুভ লক্ষণ। মুর্দার খাট এবং তার কাপড়কে অশুভ মনে করে। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় হলো, মুর্দার কাপড়কে ঠিকই অশুভ মনে করা হয়, কিন্তু তার যদি দামি চাদর থাকে কিংবা তার ধন-সম্পদ থাকে, তাকে অশুভ মনে করে না। অথচ মুর্দার সংস্পর্শে আসার কারণে যদি তার কাপড়ে অশুভতা আসতে পারে, তাহলে তার দামি কাপড়েও অশুভতা আসার কথা। উপরন্তু তার ধনসম্পদের মাঝেও অশুভতা তৈরি হওয়ার কথা। কিন্তু কেউ সেখানে কুলক্ষণ খুঁজে পায় না! এই ধ্যানধারণা একেবারেই বাতিল এবং অমূলক। মুসলমানদের মধ্যে এর প্রচলন হিন্দুদের থেকে এসেছে।

কিছু ভ্রান্ত আকিদা

১। আমাদের দেশে কাকের আওয়াজ থেকে মেহমান আসার লক্ষণ গ্রহণ করা হয়। অর্থাৎ কাক ডাকলে মনে করা হয় যে, কেউ আসবে। এটা অমূলক।

---

[৬৯] *দাওয়াতে আবদিয়্যাত*, ৮/১০১।

২। প্রচলন আছে যে, কেউ কোনো দিকে যাওয়ার সময় যদি হাঁচি দেয়, তাহলে সে সেখানে না গিয়ে ফিরে আসে আর বলে যে, এখন আর এই কাজ হবে না। এটাও ভুল।[৭০]

৩। অনেকে বিশেষ দিন বা বিশেষ সময়ে যাত্রা করাকে ভালো-মন্দ বলে থাকে। এটা কাফের অথবা জ্যোতিষীদের বিশ্বাস। এটা ঠিক নয়।

৪। অনেকে রাতের বেলা ঝাড়ু দেওয়া বা মুখ দিয়ে চেরাগ গোল করা অথবা অন্যের চিরুনি ব্যবহার করাকে মন্দ মনে করে। এরও কোনো ভিত্তি নেই।

৫। প্রসিদ্ধ কথা, হাতের তালুতে চুলকালে কিছু পাওয়ার আভাস পাওয়া যায়। এটা ভিত্তিহীন কথা।

৬। অনেকে বলে, অমুক প্রাণী ডাকলে মৃত্যু ছড়িয়ে পড়ে। এটা অমূলক।

৭। অনেক নারী পুরুষদের পূর্বে খানা খাওয়াকে শরয়ীভাবে দোষণীয় মনে করে। এর কোনো ভিত্তি নেই।

৮। শোনা যায়, খাটের ওপর নামায পড়লে মানুষ বানর হয়ে যায়। এটা ভিত্তিহীন।

৯। অনেক নারী নামায পড়ে এই মনে করে জায়নামায উল্টে রাখে যে, এভাবে থাকলে শয়তান তাতে নামায পড়বে। এরও কোনো ভিত্তি নেই।

১০। অনেকে বলে, কারও গায়ে ঝাড়ু লাগলে তার শরীর শুকিয়ে যায়, তাই ঝাড়ুর ওপর থু থু মারতে হবে। এটাও একদম অমূলক কথা।[৭১]

জাদু-টোনা

নারীরা আকিদা-বিষয়ক আরও একটি গুনাহ করে থাকে। তা হলো, তারা জাদু-টোনা করে। আফসোস! না শরীয়তের মূল্য আছে, না আল্লাহর ভয়।

---

[৭০] *দাওয়াতে আবদিয়াত*, ১০১।
[৭১] *আগলাতুল আওয়াম*।

অনেক নারী এই বলে মানত মানে যে, যদি আমার এই কাজ হয়ে যায়, তাহলে অমুক বুযুর্গকে নেয়ায দেবো। এর স্বপক্ষে আবার তারা বলে, আমরা তো ইসালে সওয়াব করি। ইসালে সওয়াবের মধ্যে কী সমস্যা। অথচ এখানে শুধু ইসালে সওয়াবই হয় না; বরং উদ্দেশ্য এমন হয় যে, আমার এই কাজ দ্বারা সে খুশি হবে। আর যেহেতু সে আল্লাহর কর্তৃত্বে অংশীদার, তাই সে খুশি হলে আমার কাজ হয়ে যাবে।

হে নারীরা! স্মরণ রাখবেন, আল্লাহর কর্তৃত্বে কোনো অংশীদার নেই। সেখানে কারও কোনো প্রভাব চলে না।[৭২]

সন্তান লাভের জাদুমন্ত্র

অনেক মানুষ বিশেষত নারীরা সন্তান লাভের জন্য তাবিজ-কবজ ও মন্ত্রটোনা করে। এটা শরীয়তে অনুমোদিত নাকি বিপরীত তার কোনো পরোয়া করে না। এমনকি কিছু নারী এতটাই নিম্নপর্যায়ে চলে যায় যে, কেউ যদি বলে যে, অমুক মহিলার বাচ্চাকে মেরে ফেলো তাহলে তোমার বাচ্চা হবে, তবে তারা এহেন কর্ম করতেও পিছপা হয় না। ফলে হোলি দিওয়ালির দিন অনেক বাচ্চার ওপর জাদু করিয়ে দেয়।

কতক মূর্খ নারী সুতার পূজা করে। চৌরাস্তায় কিছু একটা গেঁথে রাখে। শুধু এই আশায় যে, সন্তান লাভ হবে। তারপর যখন অবাধ্য ও খবিশ সন্তান জন্ম নেয় এবং বড় হয়ে বাবা-মাকে কষ্ট দেয়, তখন তার স্মরণ হয় যে, যে সন্তান লাভের আশায় এত এত কুকর্ম করেছি তার এই অবস্থা! তখন হাজার বার আফসোস করে। কিন্তু তখন আফসোস করে কী লাভ![৭৩]

দ্বিতীয় বিয়ে-সংক্রান্ত ভ্রান্ত আকিদা

প্রায় সকল নারী এবং অনেক পুরুষও দ্বিতীয় বিয়েকে মন্দ মনে করে। আফসোস! অনেক শিক্ষিত মানুষও এ কথা বলে যে, মিয়াঁ! দ্বিতীয় বিয়ে

---

[৭২] *তাফসিলুত তাওবা*, ৮/৪৩।
[৭৩] *আসবাবুল গাফলা*, ৩৯৬।

করা তো আর ফরয নয়, তাহলে না করলে কী সমস্যা? আমি বলি, দ্বিতীয় বিয়ে ফরয নয় ঠিক, প্রথম বিয়ে কি ফরয? যদি ফরয না হয়ে থাকে, তাহলে প্রথম বিয়ের সাথে এমন আচরণ কেন করা হয় না? প্রথম বিয়ের জন্য কেন এত চেষ্টা-প্রচেষ্টা করতে হয় যে, মেয়ের বয়স চৌদ্দ-পনেরো হয়ে গেলে কোনো প্রস্তাব না এলে দুশ্চিন্তা শুরু হয়ে যায় এবং বিভিন্ন ধরনের কথাবার্তা শুনতে হয়!

অনেক জায়গায় মূর্খতা এতটাই প্রকট যে, কাবিন বা আকদের পর যদি ছেলে মারা যায় তাহলে ওই মেয়েকে আর বিয়েই দেয় না, ঘরে বসিয়ে রাখে। এটা ভয়াবহ মূর্খতা। নারীদের চেয়ে পুরুষদের অবস্থা দেখে বেশি আফসোস হয়। তারা বুঝমান হয়েও এ বিষয়কে দোষণীয় মনে করে। কিছু পুরুষ মুখে যদিও তাকে মন্দ বলে না, কিন্তু এমন নারীকে যে দ্বিতীয় বিয়ে করে তাকে তুচ্ছ ভাবতে থাকে। সারা জীবন বিধবা থেকে যাওয়া নারীর প্রতি তার যে সম্মান থাকে, ওই নারীর প্রতি তার ওতটুকু সম্মান থাকে না।

উলামায়ে কেরামের দায়িত্ব হলো, মানুষজনের মন থেকে দ্বিতীয় বিয়ের ঘৃণা দূর করা এবং তাদের মনে বদ্ধমূল দোষকে বের করে দেওয়া। তবে হা, যদি কোনো মহিলা প্রথম স্বামীর জন্য অনেক বেশি ব্যথিত হয় কিংবা তার ছোট ছোট বাচ্ছা থাকে, দ্বিতীয় বিয়ের পর যাদের প্রতিপালন কষ্টকর হয়ে যাবে অথবা বাচ্চাদের জমিজিরাতের দায়িত্ব তার কাঁধে ন্যস্ত থাকে, তাহলে এমন মহিলার জন্য দ্বিতীয় বিয়ে না করার অনুমতি আছে। তবে শর্ত হলো, কোনো পুরুষ তাকে বিয়ে করতে আগ্রহী না হতে হবে। কিন্তু যদি কোনো প্রতিবন্ধকতা না থাকে, শুধু সমাজের লজ্জার ভয়ে দ্বিতীয় বিয়ে না করে এবং তাকে দোষণীয় মনে করে, তাহলে এটা অনেক বড় গুনাহের কাজ হয়ে যাবে।[৭৪]

---

[৭৪] *তাফসিলুত তাওবা*, ৮/৪৩।

পঞ্চম অধ্যায়

নামাযের গুরুত্ব

আল্লাহ তাআলার নিকট নামাযের মর্যাদা অপরিসীম। নামাযের চেয়ে কোনো ইবাদত আল্লাহর কাছে অধিক পছন্দনীয় নয়। আল্লাহ তাআলা স্বীয় বান্দাদের ওপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। নামায পড়লে অনেক সওয়াব লাভ হয়, না পড়লে অনেক গুনাহ হয়।

হাদীস শরীফে আছে, যে ব্যক্তি উত্তমভাবে ওজু করবে এবং তারপর মসজিদে এসে দু-রাকাত নামায পড়ে বসে থাকবে, তার পূর্বের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।[৭৫]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, নামায হলো দ্বীনের মূল স্তম্ভ। অতএব যে সুন্দর করে নামায আদায় করল, সে দ্বীনকে ঠিক রাখল। আর যে নামায পড়ল না, সে দ্বীনকে ধ্বংস করে দিল। অন্য এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম নামাযের হিসাব হবে।[৭৬]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেছেন, কেয়ামতের দিন নামাযীর হাত পা ও মুখ সূর্যের ন্যায় চমকাতে থাকবে। আর বেনামাযী এই নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হবে।[৭৭] এ জন্য নামায পড়া অতীব জরুরি বিষয়। নামায না পড়লে দ্বীন ও দুনিয়া উভয়েরই অনেক ক্ষতি হয়। বেনামাযীর হাশর হবে কাফেরদের সাথে—এর চেয়ে ভয়াবহ কথা আর কী হতে পারে! বেনামাযীকে কাফেরদের সমপর্যায়ের আখ্যায়িত করা হয়েছে। আল্লাহর পানাহ! তবে পাগল, নাবালক ছেলে/মেয়েদের ওপর নামায ফরয নয়। এ ছাড়া সকল মুসলমানের ওপর নামায ফরয।[৭৮]

---

[৭৫] *সহীহ বুখারী*, হাদীস নং ৬৪৩৩।
[৭৬] *শরহু কিতাবিশ শাহাদাহ*, ৩০২।
[৭৭] *সহীহ ইবনে হিব্বান*, হাদীস নং ১৪৬৮; *মুসনাদে আহমাদ*, হাদীস নং ৬৫৭৬।
[৭৮] *বেহেশতী জেওর*, ২/১০।

কিছু হাদীস

১। ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে নামায পড়ে না, তার কোনো দ্বীনদারিতা নেই। শরীরের সাথে মাথার যে সম্পর্ক, দ্বীনের সাথে নামাযেরও তেমন সম্পর্ক।[৭৯] অর্থাৎ মাথা ছাড়া যেমন দেহ মূল্যহীন, নামায ছাড়াও তেমন দ্বীন মূল্যহীন।

ফায়েদা : যে বিষয়ের ওপর দ্বীনের এত বেশি গুরুত্ব, তা পরিহার করে অন্য নেক আমলকে যথেষ্ট মনে করা কত বড় ভুল!

২। আবদুল্লাহ বিন কুরত রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম নামাযের হিসাব হবে। যার নামাযের হিসাব যথাযথ পাওয়া যাবে, তার অন্যান্য আমলও যথাযথ হয়ে যাবে। আর যার নামাযের হিসাবে গড়মিল হবে, তার সমস্ত আমল নষ্ট হয়ে যাবে।[৮০]

৩। জাবের রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মুমিন বান্দা ও কুফরের মধ্যে দূরত্ব হলো নামায পরিহার করা।[৮১] অর্থাৎ নামায ছেড়ে দিলে দূরত্ব মিটে যায় এবং কুফর উপস্থিত হয়। বান্দার ভেতরে কুফর প্রবেশ না করলেও দূরত্ব থাকে না। খেয়াল করে দেখুন, নামায পরিত্যাগ করার ব্যাপারে কত ভয়াবহ কথা বলা হয়েছে যে, এতে বান্দা কুফরের কাছাকাছি চলে যায়।[৮২]

নামায আদায়ে অবহেলা

কিছু আমলের কথা বলছি, যাতে অধিকাংশ নারী অবহেলা করে থাকে। এগুলোর ওপর ভিত্তি করে অন্যান্য আমলের ওপর থেকেও যেন অবহেলা দূর হয়ে যায়। এখানে এমন আমলের কথা বলব, যা একদম প্রকাশ্য ও স্পষ্ট। যে এখানে অবহেলা করবে সে অন্যান্য আমলে আরও বেশি

---

[৭৯] *আল মুজামুল আউসাত*, ২২৯২।
[৮০] *আত তারগীব ওয়াত তারহীব*, ১/১৮৯।
[৮১] *সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং ৮২; *তিরমিযী*, হাদীস নং ২৬২০।
[৮২] *হায়াতুল মুসলিমীন*, ১২৮।

অবহেলা করবে। সর্বপ্রথম নামাযের কথাই বলছি। ফরয নামায ফরয—এ কথা সকল মুসলমানই জানে। কিন্তু আফসোসের বিষয় হলো, নারীদের মধ্যে নামাযীর সংখ্যা অনেক কম। অথচ কুরআনের এক আয়াতে নামায ত্যাগ করাকে শিরক আখ্যায়িত করা হয়েছে! আল্লাহ তাআলা বলেছেন :

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝

তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং নামায কায়েম করো। তোমরা মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। (সূরা রূম, ৩০ : ৩১)

এই আয়াত থেকে জানা গেল, নামায না পড়া মানে হলো মুশরিক হয়ে যাওয়া। হাদীসে এই বিষয়টি আরও স্পষ্ট ভাষায় এসেছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত নামায ছেড়ে দেবে সে কাফের হয়ে যাবে।[৮৩]

উলামায়ে কেরাম এই আয়াত ও হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এর উদ্দেশ্য হলো, নামায না পড়া কাফেরদের মতো কাজ। কিন্তু প্রিয় পাঠক! উলামায়ে কেরাম ব্যাখ্যা করলেও আল্লাহ তাআলা ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিন্তু স্পষ্ট শব্দই উচ্চারণ করেছেন। আমি এ কথা বলছি না যে, এই ব্যাখ্যা ভুল। কিন্তু আমাদের এই ব্যাখ্যার ওপর ভরসা করে নিশ্চিন্তে বসে থাকলে হবে না। কেননা আল্লাহ ও রাসূল যে বিষয়কে কুফর বলেছেন, তা বাস্তবে কুফর না হলেও নিশ্চিতভাবে তা কুফরের নিকটবর্তী। আর কুফরের পরিণাম কী—তা সকলেরই জানা আছে। চিরকাল জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করতে হবে। তাহলে যে কাজ তার নিকটবর্তী হবে, তা থেকে তো মুসলমানদের সহস্র মাইল দূরে থাকা আবশ্যক।[৮৪]

নামাযের মাঝে কিছু অবহেলা

১। অনেক নারী নামায পড়ে ঠিকই, কিন্তু আফসোস, তারা রুকু-সাজদা ঠিকঠাক আদায় করে না। অনেক তাড়াহুড়ো করে। অথচ নামাযের প্রতিটা

---

[৮৩] *আত তারগীব ওয়াত তারহীব*, ১/২৬১।
[৮৪] *আল কামাল ফিদ দ্বীন*, ১০৩।

কাজ ধীরেসুস্থে আদায় করা ওয়াজিব, এমনকি অনেক আলেম ফরযও বলেছেন। ধীরেসুস্থে নামায পড়ার মানে হলো, উদাহরণস্বরূপ রুকু থেকে মাথা উঠিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ ও রাব্বানা লাকাল হামদ বলতে হবে।

তারপর আরামসে সাজদায় যাবে। রুকু থেকে ওঠা ও সাজদায় যাওয়ার মধ্যবর্তী দাঁড়ানোকে 'কাওমা' বলে। নারীরা কাওমা একেবারেই করে না, কতক পুরুষও এমনই। রুকু থেকে ওঠার সময় একটু মাথার ইশারা দিয়েই সাজদায় চলে যায়, সোজা হয়ে দাঁড়ায় না। এভাবে নামায হয় না। রুকুর পর সোজা হয়ে দাঁড়ানো জরুরি। অনুরূপ অনেক মহিলা দুই সাজদার মাঝে বসে না। এক সাজদা করে একটু মাথা উঠিয়ে আরেক সাজদায় চলে যায়। এভাবেও নামায হয় না। এদিকে খুব গুরুত্ব দিতে হবে। ধীরেসুস্থে নামায আদায় করতে হবে।[৮৫]

২। অনেক মহিলা সময়মতো নামায পড়ে না। নামাযের সময় হয়ে গেলেও বসে বসে গল্প করতে থাকে। যখন সময় যায় যায় অবস্থা হয়, তখন পেশাব-পায়খানার জন্য হাতে বদনা নিয়ে ছুটে। এভাবেই নামাযের সময় হাতছাড়া হয়ে যায়। স্মরণ রাখতে হবে, কোনো ওজর ব্যতীত সময়মতো নামায না পড়া কঠিন গুনাহের কাজ।

মাসিকের সময় শেষ হওয়ার পর অনেক নারী সাথে সাথে নামায পড়া শুরু করে না। দুই-তিন ওয়াক্ত নামায ছেড়ে দেয়। এ আশায় থাকে যে, আগামীকাল ভালো করে গোসল করে তারপর নামায শুরু করব। এ ক্ষেত্রে শরীয়তের বিধান হলো, যদি তিনদিন পূর্ণ হওয়ার আগেই মাসিক থেমে যায়, তাহলে শেষ ওয়াক্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করা ওয়াজিব। যদি শেষ ওয়াক্ত পর্যন্ত আর রক্ত না আসে, তাহলে সাথে সাথে গোসল করে নামায পড়া ওয়াজিব। আর যদি তিনদিনের পর কিন্তু সাধারণ অভ্যাসের আগে মাসিক বন্ধ হয়, তাহলে শেষ ওয়াক্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করা মুস্তাহাব। তারপর যদি রক্ত না আসে, তাহলে গোসল করে নামায পড়া ওয়াজিব। মোটকথা, পবিত্রতা লক্ষ করার পর এক ওয়াক্ত নামাযও কাযা করা জায়েজ নেই। রোযার ক্ষেত্রেও একই বিধান।

---

[৮৫] *আল কামাল ফিদ দ্বীন*, ১০৩।

নারীদের পবিত্রতা-অপবিত্রতার মাসআলা জানাও আবশ্যক। প্রয়োজন পরিমাণ মাসআলা বেহেশতী জেওর কিতাবে উল্লেখ আছে। কোনো বুঝমান মহিলা থেকে অথবা নিজ স্বামী থেকে ভালো করে বুঝে পড়ে নিতে হবে।[৮৬]

৩। অনেক নারী নিজে ধারাবাহিক নামায পড়লেও বাচ্চাদের এবং ঘরের চাকর-বাকরদের নামাযের তাগাদা দেয় না। তাদেরকেও নামাযের তাগাদা দেওয়া উচিত। যেহেতু সে আপনার অধীনস্থ, তাই আপনি তাকে জোর গলায় তাগাদা দিলে অবশ্যই প্রভাব পড়বে। আর এ ক্ষেত্রে অবহেলা করলে আপনার ওপরই জবাবদিহি আসবে যে, আপনি ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কেন অবহেলা করলেন! বরং যে বুয়া নিয়োগ দেবেন, তাকে এই শর্ত দিয়ে দেবেন যে, তোমাকে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করতে হবে। যে ঘরে একজন মানুষও বেনামাযী থাকে, ওই ঘরে অভিশাপ অবতীর্ণ হয়। নারীরা এদিকে তেমন একটা গুরুত্ব দেয় না।[৮৭]

অযথা ওজর দেখিয়ে নামাযে অবহেলা

অনেক নারী তো নামাযই পড়ে না এবং ওজর পেশ করতে গিয়ে বলে, ঘরের কাজ করে সুযোগই পাইনি। আমি বলি, এই ওজর পেশকারীর যদি এই সময়ে পেশাবে চাপ দেয় কিংবা বাথরুমে এমন চাপ দেয় যে, না গিয়ে উপায় নেই, তাহলে এমতাবস্থায় সে কী করবে? এ সময় কি সে কাজ ছেড়ে বাথরুম সেরে নেবে? অবশ্যই, তাকে বাধ্য হয়ে তা-ই করতে হবে। তাহলে প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণ করার যতটুকু গুরুত্ব, আল্লাহ তাআলার নির্দেশ পালনের ক্ষেত্রে ওতটুকু গুরুত্বও দেওয়া যায় না![৮৮]

বাচ্চা হওয়ার পর নেফাসের রক্ত থেকে পবিত্র হওয়ার নামায না পড়া, অনেক নারীই এই রোগে আক্রান্ত। কেউ নামাযের কথা বললে সে বলে, বাচ্চা নিয়ে নামায পড়া সম্ভব? সব সময় তো কাপড় নাপাক থাকে; বাচ্চা কখনো পেশাব করে দেয়, কখনো পায়খানা করে দেয়। কাপড় যে পাল্টাব সে সুযোগও তো পাই না, বাচ্চা তো কোল থেকে নামেই না।

---

[৮৬] *আল কামাল ফিদ দ্বীন*, ১০৪।
[৮৭] *আল কামাল ফিদ দ্বীন*, ১০৫।
[৮৮] *তাফসীলুত তাওবা*, ৮/৪৪।

এমতাবস্থায় নামাযের জন্য চাপ দিলে সে কান্নাকাটি শুরু করে দেয়, চিল্লাচিল্লি করতে থাকে। অনেকে এমনও বলে যে, মৌলবীদের তো বাচ্চা হয় না, এর কষ্ট তারা কী বুঝবে, তারা তো শুধু নামাযের তাগাদাই দিতে পারে!

আমি বলি, মৌলবী নারীদের কি বাচ্চা হয় না? তাদের তো বাচ্চা হয়। তাহলে একটু খোঁজ নিয়ে দেখুন তারা কত গুরুত্বের সাথে পাঁচ ওয়াক্তের নামায আদায় করে। আল্লাহর কতক বান্দি তো নামাযের পর কুরআন তিলাওয়াত, মুনাজাতে মাকবুল, এমনকি ইশরাক পর্যন্ত নিয়মতান্ত্রিক পড়ে। তাহলে তাদের কি সন্তান হয় না! এমন অনন্য সন্তান শুধু আপনাদেরই হয়, যাকে সাথে নিয়ে নামায পড়া যায় না! আমি আরও বলি, যখন আপনার বাচ্চা কান্না করে কিংবা কোল থেকে নামতেই চায় না, তখন যদি আপনার পেশাব-পায়খানা চাপ দেয়, তখন কী করবেন? তাকে কান্নারত অবস্থাতেই খাটের ওপর রেখে বাথরুমে যাবেন না? অবশ্যই, সবাই যায় এবং গিয়ে অনেক সময় বিলম্বও করে, বাচ্চার কান্নার পরোয়া করে না। তাহলে আপনি পেশাব-পায়খানার জন্য যতটুকু করেন নামাযের জন্য অতটুকুও করতে পারেন না? আফসোস! এসব অনর্থক ওজর-আপত্তি ছাড়া কিছুই নয়।[৮৯]

কিছু নারী অনেক বিলম্বে একদম মাকরুহ ওয়াক্তে গিয়ে নামায আদায় করে। উপরন্তু এত তাড়াহুড়ো করে যে, কেয়াম রুকু সাজদা কিছুই ঠিকমতো হয় না। যেন নামায একটা মুসিবত, যেভাবে পারা যায় তা থেকে নিস্তার লাভ করতে হবে! প্রিয় পাঠক! যদি বেশি পড়তে না পারেন, তাহলে নফল নামায পড়ার দরকার নেই। কিন্তু ফরয ও সুন্নত নামাযে কাটছাঁট ও অবহেলা করবেন না। এসব ধীরেসুস্থে আদায় করার প্রতি মনোযোগী হোন।[৯০]

নামাযে ধারাবাহিক হওয়ার পদ্ধতি ও কৌশল

মানুষ যে কাজের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে যায়, আল্লাহ তাআলা অবশ্যই তাকে সে জন্য সাহায্য করেন। যেসব নারী নামায না পড়ার জন্য বিভিন্ন

---

[৮৯] *আসবাবুল গাফলাহ*, ৩৯৮।
[৯০] *তাফসীলুত তাওবা*, ৮/৪৫।

বাহানা তৈরি করে, তারা একবার নামায শুরু করেই দেখুক। ইনশাআল্লাহ ফুলের মতো সবকিছু হালকা হয়ে যাবে। কিন্তু সমস্যা হলো, এখন নারীরা ইচ্ছাই করে না। এ জন্য নামায না পড়ার শত বাহানা তৈরি করে। ন হয় ইচ্ছাশক্তি এমন এক উপাদান যে, বৃষ্টির দিনে কিংবা শীতকালে যে ব্যক্তি নিজে উঠে পানি পান করতে পারে না, তার কাছে যদি কালেক্টর সাহেবের নির্দেশ আসে যে, এখনই অমুক জায়গায় আমার সাথে সাক্ষাৎ করো, তাহলে এই ব্যক্তিই তখন এক-দুই মাইল পায়ে হেঁটে চলে যায়। মানুষজন আশ্চর্য হয়ে যায় যে, তার মধ্যে এই শক্তি কোত্থেকে এলো। আমি বলি, এটা হলো ইচ্ছার শক্তি, যার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা সাহায্যের ওয়াদা করেছেন।

মহিলারা নামাযের ইচ্ছাই করে না। নাহয় এটা তেমন কঠিন বিষয় ছিল না। চলুন আমি একটি কৌশল বলে দিই, যার দ্বারা অনেক দ্রুতই নামাযে ধারাবাহিক হয়ে যাবেন। আর তা হলো এই যে, এক ওয়াক্ত নামায কাযা হয়ে গেলে একবেলার খাবার বন্ধ করে দেবেন। তারপরে দেখুন কীভাবে নামায কাযা হয়। এখন যদি কেউ বলে যে, খাবার বন্ধ করার দ্বারা নামায কাযা হওয়া থেকে বিরত থাকা গেল, কিন্তু খাবার বন্ধ করার নিয়ম বাস্তবায়ন করবে কীভাবে? এখানেও কোনো কৌশল বলে দিন। কেননা এটা তো নামাযের চেয়েও কঠিন কাজ।

আমি বলি, খানা বন্ধের ক্ষেত্রে তো কিছুই করতে হয় না। শুধু কিছু কাজ থেকে বিরত থাকতে হয়। আর কোনো কাজ না করা তো মানুষের ইচ্ছাধীন বিষয়। কোনো কাজ করা কঠিন, কিন্তু না করা তো কঠিন নয়! কেউ যদি না খেয়ে থাকতে না পারে, তাহলে সে নিজের ওপর আর্থিক জরিমানা আরোপ করতে পারে। এক নামায কাযা হলে এত টাকা দান করব। অথবা কিছু নামাযও নির্ধারণ করতে পারে যে, এক ওয়াক্ত নামায কাযা হলে জরিমানাস্বরূপ দশ রাকাত নফল নামায পড়ব। এভাবে কিছুদিন আমল করলে নফস ঠিক হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। একটু আমল করেই দেখুন না![৯১]

---

[৯১] আসবাবুল গাফলাহ।

মহিলাদের নামাযী ও দ্বীনদার বানানোর পদ্ধতি

আমি একটি সহজ পদ্ধতি বলে দিচ্ছি। এর ওপর আমল করলে স্ত্রী অবশ্যই দ্বীনের প্রতি গুরুত্ববান হয়ে যাবে। যেদিন স্ত্রীর মধ্যে নামায ইত্যাদি বিষয়ে একটু অবহেলা কিংবা অলসতা দেখবেন, সেদিন তার হাতে রান্না খাবার খাবেন না। এটা এত কঠিন শাস্তি যে, এরপর খুব জলদি তার সংশোধন হয়ে যাবে। কেননা যেদিন আপনি তার হাতের খাবার খাবেন না, সেদিন সেও অবশ্যই না খেয়েই থাকবে। এভাবে দু-চারদিন গেলে সে নিজেনিজেই ঠিক হয়ে যাবে।[৯২]

সারকথা

মহিলারা নামাযে অনেক অবহেলা করে। অনেকে নামাযই পড়ে না। অনেকে পড়ে ঠিক, কিন্তু তাদের কুরআন তিলাওয়াত বিশুদ্ধ না এবং তারা কুরআন বিশুদ্ধ করার চেষ্টাও করে না। অনেকের কুরআন তিলাওয়াত বিশুদ্ধ, কিন্তু সে সময়ের দিকে খেয়াল করে না। যোহরের নামায আসরের সময় আর আসরের নামায মাগরিবের সময় পড়ে। পুরুষদের জন্য কোনো কোনো সময় নামায শেষ ওয়াক্তে পড়া সুন্নত। কিন্তু নারীদের জন্য সব নামাযই প্রথম সময়ে পড়া মুস্তাহাব। প্রথম সময় তো দূরের কথা শেষ ওয়াক্তেও পড়ে না; বরং কাযা করে ফেলে। অনেক মহিলা মাসিকের সময় গোসলে বিলম্ব হওয়ার কারণে যে নামায ছুটে যায়, তার কাযা করে না। যদি সতর্ক থাকে এবং ভালো করে মাসআলা জেনে নেয়, তাহলে তো এমন পরিস্থিতিই তৈরি হয় না, আর হয়ে গেলেও তখন তাড়াতাড়ি কাযা করে নেওয়া যায়। বাহ্যিক আমলের মধ্যে নামায হলো সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাই এর দিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া দরকার। মন লাগিয়ে নামায পড়তে হবে। তাড়াহুড়ো করা যাবে না।[৯৩] অনেক মহিলা কুরআন ভুল তিলাওয়াত করে। তাদের জন্য কুরআন সহীহ ও বিশুদ্ধ করার প্রতি মনোযোগী হওয়া উচিত। অনেক সময় তিলাওয়াতে এমন ভুল হয়ে যায়, যার কারণে নামায ভেঙে যায়। তাই কমপক্ষে নামায সহীহ হওয়ার মতো স্বল্প কিছু সূরা বিশুদ্ধ করে নেওয়া উচিত।[৯৪]

---

[৯২] *দাওয়াতে আবদিয়াত*, ৮/৭২।
[৯৩] *আত তাবলীগ*, ৩/৫৫।
[৯৪] *আল কামাল ফিদ দ্বীন*, ১০৩।

ষষ্ঠ অধ্যায়

রোযার গুরুত্ব

নামায ও যাকাতের মতো রোযাও ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ একটি স্তম্ভ। অবশ্যপালনীয় বিধান। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ

হে ঈমানদারগণ, তোমাদের ওপর রোযা ফরয করা হয়েছে। (সূরা বাকারা, ২ : ১৮৩)

হাদীসে রোযার অনেক গুরুত্ব এবং রোযাদারের অনেক মর্যাদার কথা বর্ণিত হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে সওয়াবের উদ্দেশ্যে রোযা রাখবে, তার পূর্বের সমস্ত সগীরা গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।[৯৫]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, রোযাদারের মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহর নিকট মেশকের চেয়েও অধিক প্রিয়। কেয়ামতের দিন রোযার বিনা হিসাবে প্রতিদান দেওয়া হবে।[৯৬] বর্ণিত আছে, কেয়ামতের দিন রোযাদারদের জন্য আরশের নিচে দস্তরখান বিছানো হবে। তারা সেখানে বসে খানা খেতে থাকবে আর এদিকে মানুষজন হিসাব-নিকাশে আটকে থাকবে। তারা বলতে থাকবে, এরা কারা? আমরা হিসাবে আটকে আছি আর তারা খানা খাচ্ছে? তাদের উত্তরে বলা হবে, তারা রোযা রাখত আর তোমরা রোযা রাখতে না। সুতরাং রোযা দ্বীনে ইসলামের একটি মৌলিক বিধান। যে রমাযানের রোযা রাখবে না, তার অনেক বড় গুনাহ হবে এবং তার দ্বীনদারি দুর্বল হয়ে যাবে। রোযার মধ্যে একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে, যা অন্য ইবাদতের মধ্যে নেই। তা হলো, রোযা রাখা না রাখার ব্যাপারে যেহেতু আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেন না, তাই রোযা শুধু সেই রাখবে, যার অন্তরে আল্লাহর ভালোবাসা কিংবা ভয় আছে। যদি কারও মাঝে একটু ভালোবাসাও থাকে, তাহলে অভিজ্ঞতা বলে যে,

---

[৯৫] *সহীহ বুখারী*, হাদীস নং ২০১৪।

[৯৬] *সহীহ বুখারী*, হাদীস নং ৫৯২৭; *সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং ১১৫১।

ভালোবাসার কাজ করলে ভালোবাসা সৃষ্টি হয়। ফলে রোযা রাখলে এই ত্রুটিও পূর্ণ হয়ে যায়। আর যার অন্তরে আল্লাহর ভয় ও ভালোবাসা থাকবে, তার দ্বীনদারি কী পরিমাণ শক্তিশালী হবে, তা তো সহজেই অনুমেয়। সুতরাং এ কথা প্রমাণিত হয়ে গেল যে, রোযা রাখলে দ্বীনদারি মজবুত হয়।

রোজা মানুষকে গুনাহ থেকে বাঁচায়, যা অভ্যন্তরীণ রোগ। তদ্রূপ অনেক প্রকাশ্য রোগ থেকেও বাঁচায়। কেননা অধিকাংশ রোগ বেশি খাওয়া-দাওয়ার ফলেই হয়ে থাকে। রোযা রাখলে খাওয়া-দাওয়া কম হয়, যার ফলে রোগও কম হয়। হাদীস শরীফেও এর ইঙ্গিত রয়েছে। আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, প্রত্যেক জিনিসের একটি যাকাত আছে। শরীরের যাকাত হলো রোযা রাখা।[৯৭] অর্থাৎ যাকাতের মাধ্যমে যেভাবে ধনসম্পদের ময়লা বেরিয়ে যায়, তদ্রূপ রোযার দ্বারাও শরীরের ময়লা তথা রোগ সৃষ্টিকারী উপাদান ধ্বংস হয়ে যায়। অন্য এক হাদীসে এই বিষয়টি আরও স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা রোযা রাখো, তাহলে সুস্থ থাকবে।[৯৮] রোযা রাখলে যেমন প্রকাশ্য ও আত্মিক রোগ দূর হয়, তদ্রূপ এর দ্বারা প্রকাশ্য ও আত্মিক আনন্দও লাভ হয়।[৯৯]

রমাযানের উপকারিতা

অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায়, রমাযান মাসের ইবাদতের প্রভাব পরবর্তী এগারো মাসেও থাকে। যে ব্যক্তি রমাযানে মনের সাথে যুদ্ধ করে ইবাদতে মনোযোগ দিতে পারে, পরবর্তীতে তার জন্য ইবাদত করা সহজ হয়ে যায়। কেউ পুরো রমাযান কোনো গুনাহ থেকে বেঁচে থাকলে, সারা বছর খুব সহজে সেই গুনাহ থেকে বিরত থাকতে পারে। তা ছাড়া এই মাসে গুনাহ পরিহার করা সহজ হয়ে যায়।

---

[৯৭] *ইবনে মাজাহ*, হাদীস নং ১৭৪৫।
[৯৮] *তবারানী*, হাদীস নং ৮৩১২।
[৯৯] *হায়াতুল মুসলিমীন*, ১৬০।

হাদীস শরীফে এসেছে, এই মাসে শয়তানকে বন্দি করে রাখা হয়। সুতরাং শয়তান যখন আবদ্ধ থাকে, তখন গুনাহ এমনি এমনিই কমে যায় এবং তা ছেড়ে দেওয়া সহজ হয়ে যায়। কেননা গুনাহের দিকে আগ্রহ দানকারী জিনিস দুইটি : এক। শয়তান। দুই। নফস। শয়তান তো রমাযান মাসে বন্দি হয়ে যায়, ফলে এখন শুধু নফস গুনাহের দিকে আগ্রহদাতা থেকে যায়। এখন তাকে প্রতিহত করাও সহজ হয়ে যায়। কেননা রমাযানে শুধু তাকেই প্রতিহত করতে হবে, দুজনকে একসাথে প্রতিহত করতে হবে না। আর এই মাসে একটি মেহনত করে ফেলা কোনো কঠিন বিষয় নয়। মনে রাখবেন, কেউ যদি এই মাসে গুনাহ পরিহার করতে পারে, তাহলে অবশিষ্ট বছরে গুনাহ থেকে দূরে থাকা সহজ হয়ে যাবে। তাই এই মাসে প্রত্যেক অঙ্গকেই গুনাহ থেকে বাঁচিয়ে রাখা উচিত।[১০০]

রোযার উদ্দেশ্য

এই মাসে আল্লাহ তাআলা এমন অনেক জিনিস হারাম করে দিয়েছেন, যা অন্য মাসে হালাল ছিল। তাহলে যে জিনিস পূর্বে থেকেই হারাম ছিল, এই মাসে তার কদর্যতা কী পরিমাণ হবে? আল্লাহ তাআলা রোযা রাখার উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, যেন তোমরা মুত্তাকী পরহেজগার হয়ে যাও।[১০১] তাই প্রত্যেকের চিন্তা করা উচিত যে, রমাযান মাসে সে পূর্বের চেয়ে কতটুকু পরহেজগার হবে। পূর্বের অবস্থা এবং বর্তমান অবস্থার মধ্যে পার্থক্য কতটুকু হবে? পর্দাহীনতা পরিত্যাগ করেছে কি না? গীবত থেকে বিরত থেকেছে কি না? কিন্তু আফসোসের বিষয় হলো, দেখা যায় অনেকে কোনো কিছুই পরিহার করেনি। পূর্বের ও বর্তমানের অবস্থা একই। কোনো কিছুই পরিবর্তন হয়নি। শুধু এতটুকু করেছে যে, খানার সময়টা একটু পরিবর্তন করে ফেলেছে। খানার মধ্যেও কমতি আসেনি, রমাযানের আগে যে পরিমাণ খেত এখনো তেমনই খায়।

মোটকথা আল্লাহ তাআলা আমাদের ওপর রোযা ফরয করেছেন যেন মন্দ কাজ কমে যায়, কিন্তু আমরা কিছুই কম করি না। আল্লাহওয়ালা বুযুর্গরা তো এই মাসে খানার পরিমাণও কমিয়ে দিতেন। পূর্বের মতো খানা

---

[১০০] *তাসহীলুল মাওয়ায়েয*, ১/৭৮।
[১০১] দেখুন সূরা বাকারা, ২ : ১৮৩।

খাওয়া তো নাজায়েজ নয়, কিন্তু গুনাহ তো সর্বাবস্থাতেই নাজায়েজ। কিন্তু আমাদের অবস্থা হলো এই যে, দিনভর গুনাহের মধ্যে ডুবে থাকি। বরং অনেকে তো রমাযান মাসে আরও অধিক গুনাহ করে। খেয়াল করে দেখুন, পাঁচ ওয়াক্ত নামায সময়মতো আদায় করা হয় কি না। সাধারণত রমাযানে ওয়াক্ত থেকে বিলম্ব করে নামায পড়ার অভ্যাস হয়ে গেছে। বিশেষত মহিলারা খানা ও ইফতার তৈরি করতে গিয়ে আসরের নামাযে বিলম্ব করে ফেলে। অনেকের তো নামায কাযাও হয়ে যায়। অনেকে তো এই চিন্তা করেই আনন্দিত যে, আমি রোযা রেখেছি। কিন্তু সে নামায ছেড়ে দেয়। তাহলে শুধু রোযাই কি তার জন্য যথেষ্ট হবে!

আল্লাহ তাআলা রমাযান মাসে এই পরিমাণ প্রতিদান বাড়িয়ে দিয়েছেন যে, প্রত্যেক আমলের সওয়াব দশ গুণ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কিন্তু আমরা এই পরিমাণ গুনাহ করি যে, সওয়াবগুলো দশ গুণ করার পরিবর্তে গুনাহের পরিমাণই বেশি হয়ে যায়। অথচ উচিত ছিল সওয়াবের পরিমাণ বেশি থাকা। তাও না হলে কমপক্ষে সমান সমান তো হওয়া দরকার ছিল। কিন্তু না, গুনাহের পরিমাণই বেশি হয়ে যায়। আমরা যদি সারা বছর গুনাহ থেকে বিরত না থাকতে পারি, তাহলে কমপক্ষে রমাযান মাসে তো নিজের সমস্ত অঙ্গকে গুনাহমুক্ত রাখতে পারি![১০২]

নারীদের রোযা-সংক্রান্ত ভুলত্রুটি

নারীদের জন্য রোযা রাখা কষ্টকর নয়। এ ক্ষেত্রে তারা মাশাআল্লাহ পুরুষদের চেয়েও এগিয়ে। দেখা যায় নারীরা রোযা ঠিকই রাখে, কিন্তু নামায পড়তে গেলে তাদের জান বেরিয়ে যায়। নারীদের জন্য রোযা সহজ হওয়ার কারণ হলো, এখানে একটি চিকিৎসাশাস্ত্রীয় কথা আছে। তা হলো, নারীদের মধ্যে আর্দ্রতা ও ঠান্ডার পরিমাণ বেশি। ঠান্ডা মেজাজের মানুষের ক্ষুধা-পিপাসা কম লাগে। এ জন্য তাদের জন্য রোযা রাখা সহজ। তা ছাড়া তারা খানা পাকানোর দায়িত্বে ব্যস্ত থাকে। তাদের হাতেই সবকিছু রান্না হয়। খাবারের ঘ্রাণ শুঁকতে থাকে। এ জন্য ক্ষুধা কমে যায়। শুধু পিপাসার কষ্ট থেকে যায়। এটা সহ্য করাও তাদের জন্য সহজ। কেননা তাদের মধ্যে সেই আর্দ্রতা ও ঠান্ডা পিপাসাকে প্রতিহত করে।

---

[১০২] *তাসহীলুল মাওয়ায়েয*, ১/৭৬।

তদ্রূপ নারীরা দিনভর ঘরের মধ্যেই অবস্থান করে। রোদে যাওয়া-আসার প্রয়োজন হয় না। হাঁ, খানা পাকানোর জন্য তাদের চুলার সামনে যেতে হয়। এ ক্ষেত্রে অনেক নারী রোযার দিন নিজ হাতে রান্না করে না। বরং তাদের ঘরে বুয়া থাকে, তারাই রান্না করে। আর যাদের নিজেদেরই রান্না করতে হয়, তারাও এখানে কৌশল কাজে লাগায়। প্রথমেই তরকারির পাতিল প্রস্তুত করে নেয়, যে কারণে তরকারি পাকানোর জন্য আগুনের সামনে দীর্ঘ সময় বসে থাকতে হয় না। একেবারে আগুন জ্বালিয়ে তার ওপর পাতিল বসিয়ে দেয় এবং ঘুরেফিরে রান্না করে ফেলে। তারপর যখন আসরের সময় হয় এবং গরম কমে আসে, তখন তাড়াতাড়ি পনেরো-বিশ মিনিটে রুটি বানিয়ে ফেলে। এ জন্য তখন খানা পাকাতে বেশি সময় লাগে না।

নারীদের রোযা রাখা সহজ হওয়ার আরও একটি কারণ হলো, সাধারণত তাদের খাবারের প্রতি চাহিদা কম থাকে। পছন্দের খাবারের প্রতি তাদের আকর্ষণ থাকে না। কেননা তাদের পাতিল রান্না হয় শুধু স্বামী ও সন্তানদের জন্যই। কোনো সময় তারা ঘরে না থাকলে সে আচার-চাটনি খেয়েই দিন অতিবাহিত করে দেয়। এভাবে যখন তারা নিজেদের আত্মাকে দমিয়ে রাখে, ধীরে ধীরে তাদের ক্ষুধাও মরে যায়। এ জন্য তাদের রোযা রাখা সহজ হয়ে যায়। কিন্তু পুরুষদের মাঝে ক্ষুধার চাহিদা থাকে বেশি। তবুও তারা রোযা রাখে, এটা তাদের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু আফসোস, এখন অনেক পুরুষও রোযা রাখা ছেড়ে দিয়েছে।

আমি এ কথা বলি না যে, নারীরা রোযা রাখে না। বরং আমি বলব, রোযা রাখার পাশাপাশি গীবত থেকেও বেঁচে থাকতে হবে। কেননা গীবত থেকে তাদের রোযা খুব কমই পবিত্র থাকে। রোযার দিন যেহেতু খানা পাকানোর ব্যস্ততা কম থাকে, তাই তারা বৈঠক জমিয়ে বসে যায় এবং পরস্পরের গীবত-শেকায়েত করে রোযা বরবাদ করে দেয়। গীবত তো সর্বাবস্থাতেই হারাম, কিন্তু রোযা অবস্থায় তার গুনাহ অনেক বেশি। যেমন জিনা করা সর্বস্থানেই হারাম, কিন্তু পবিত্র মক্কায় করলে তার গুনাহ অনেক ভয়াবহ। সময় ও কালের মর্যাদায় যেমন ইবাদতের সওয়াব বৃদ্ধি পায়, তদ্রূপ গুনাহের কদর্যতাও বেড়ে যায়। অনেক মহিলা পান খায়। রোযার সময় তারা একটি ভুল করে থাকে। তা হলো, সাহরী খেয়ে মুখে পান

নিয়েই শুয়ে থাকে। যদি সাহরীর শেষ সময় পর্যন্ত মুখে পান থেকে যায়, তাহলে তো রোযা হয় না। এ ব্যাপারে খুব সতর্কতা কাম্য।[১০৩]

রোযার সময় মহিলারা অনেক বাহাদুর হয়ে থাকে। অসুস্থতা, দুঃখ-কষ্ট এমনকি ডাক্তার রোযা না রাখার অনুমতি দিলেও তারা রোযা কাযা করে না। কিন্তু রোযা রাখার পাশাপাশি গীবতও করে প্রচুর। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত কোনো কাজ থাকে না, তাই বসে বসে শুধু কথা বানাতে থাকে। এ জন্য তাদের মধ্যে ওই সমস্ত মহিলারা রোযার সময় ভালো থাকে, যাদের তামাক খাওয়ার অভ্যাস আছে। তামাক খাওয়া যদিও অনেক মন্দ কাজ। তথাপি তামাকের অভ্যাসের কারণে তাদের রোযা লেগে যায়। পান খাওয়া ছাড়া তো তারা কথা বলতে পারে না, তাই ঘরের এক কোনায় একাকী পড়ে থাকে। এভাবে সে গীবত থেকে নিরাপদ থাকে। যাই হোক, মহিলাদের আলাদা করে রোযা রাখার উৎসাহ দেওয়ার প্রয়োজন নেই। তারা অনেক আগ্রহ নিয়েই রোযা রাখে। তবে তাদেরকে রোযার হকগুলো আদায় করার তাগাদা দিতে হবে। তারা যেন অযথা কথাবার্তা বলে রোযা বরবাদ না করে; বরং কুরআন তিলাওয়াত করে। বুযুর্গদের জীবনী পড়ে। এগুলো না পারলে তাহলে যেন একাকী বিছানায় শুয়ে থাকে।[১০৪]

ইতিকাফ

রমাযান মাসের বিশ তারিখ দিনের সূর্য ডোবার আগ থেকে নিয়ে ঈদের চাঁদ দেখার আগ পর্যন্ত নিজের ঘরের নামায পড়ার নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করা—এটা নারীদের ইতিকাফ। এর সওয়াব অপরিসীম।[১০৫] রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি রমাযান মাসে দশদিন ইতিকাফ করবে, সে দুটি হজ ও দুটি উমরার সওয়াব লাভ করবে।[১০৬] ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইতিকাফকারীর ব্যাপারে বলেছেন, সে সমস্ত গুনাহ থেকে বিরত থাকে। কেউ সমস্ত সওয়াবের কাজ করলে যেমন সওয়াব পায়, সেও এমন সওয়াব লাভ করে।[১০৭] মহিলারা নিজের ঘরেই ইতিকাফ

---

[১০৩] *আল কামাল ফিদ দ্বীন*, ১৭০।
[১০৪] *আত তাবলীগ*, ৩/৫৬।
[১০৫] *বেহেশতী জেওর*, ১৪৭।
[১০৬] *বায়হাকী*, হাদীস নং ৩৯৬৭।
[১০৭] *ইবনে মাজাহ*, হাদীস নং ১৭৮১।

করবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীগণ নিজ নিজ ঘরেই ইতিকাফ করতেন।[১০৮]

কোনো মহিলা যদি নিজ ঘরে ইতিকাফ শুরু করে, তাহলে শুধু পেশাব-পায়খানা অথবা খানাপিনার প্রয়োজনে ওই স্থান থেকে উঠতে পারবে। যদি খানাপিনা দেওয়ার মতো কেউ থাকে, তাহলে সব সময় ওই স্থানেই থাকবে, ওই স্থান থেকে উঠবে না। সেখানেই ঘুমাবে। উত্তম হলো, একদম বেকার বসে না থাকা। বরং কুরআন তিলাওয়াত করবে। নিজ সাধ্য অনুযায়ী নফল ইবাদত ও যিকির করবে। যদি হায়েয অথবা নেফাস শুরু হয় তাহলে ইতিকাফ ছেড়ে দেবে। এমতাবস্থায় ইতিকাফ করা জায়েজ নেই। ইতিকাফ অবস্থায় স্বামীর সাথে সহবাস করা, জড়িয়ে ধরা ও চুমু খাওয়াও ঠিক নয়।[১০৯]

সদকাতুল ফিতর

ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি রমাযানের শেষ দিকে এসে বলেছেন, তোমরা নিজেদের রোযার সদকা আদায় করো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক (সামর্থ্যবান) স্বাধীন-দাস নারী-পুরুষ ও বাচ্চা-বুড়োর জন্য এই সদকা নির্ধারণ করে দিয়েছেন; এক সা' খেজুর অথবা এক সা' জব; এবং তা ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে আদায় করতে নির্দেশ দিয়েছেন।[১১০] রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যারা ধনবান তারা যেন সদকাতুল ফিতর আদায় করে। সদকাতুল ফিতর আদায় করলে আল্লাহ রোযাগুলো পবিত্র করে দেন। আর তোমাদের মধ্যে যারা গরিব তারাও যেন সদকা করে। তাহলে আল্লাহ তাআলা তাকে তার দানের চেয়েও অধিক দিয়ে দেবেন। ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সদকা ফিতর শরীয়তসিদ্ধ করেছেন রোযাদারকে অনর্থক কাজ ও কথা থেকে পবিত্র করার জন্য এবং অসহায় মিসকিনদের খাবারের জন্য।[১১১]

---

[১০৮] *ফুরুউল ঈমান*, ৬৩।
[১০৯] *বেহেশতী জেওর*, ৩/১৪৭।
[১১০] *সহীহ বুখারী*, হাদীস নং ১৫০৩; *সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং ৯৮৪, ৯৮৬।
[১১১] *আবু দাউদ*, হাদীস নং ১৬০৯; *ইবনে মাজাহ*, হাদীস নং ১৮২৭।

সপ্তম অধ্যায়

যাকাত

যাকাতের গুরুত্ব

নামাযের মতো যাকাতও ইসলামের একটি স্তম্ভ। একটি গুরুত্বপূর্ণ অপরিহার্য ইবাদত। অনেক আয়াত ও হাদীসে যাকাত দেওয়ার বিধান, যাকাতদাতার প্রতিদান ও না দেওয়ার শাস্তি বর্ণিত হয়েছে। নিম্নে কিছু উল্লেখ করছি :

১। আবু দারদা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যাকাত ইসলামের একটি সেতু বা উঁচু ইমারত; কেউ যদি যাকাত না দেয় তাহলে সে ইসলামের ওপর চলতে পারবে না।[১১২]

২। ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন নিজ সম্পদের যাকাত দেয়।[১১৩]

৩। ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমাদেরকে নামায কায়েম করা এবং যাকাত দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যে ব্যক্তি যাকাত দেবে না, তার নামায কবুল হবে না।[১১৪]

৪। অন্য এক বর্ণনায় ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যে ব্যক্তি নামায আদায় করে কিন্তু যাকাত দেয় না, সে পূর্ণ মুসলমান হতে পারে না; তার আমল তার কোনো কাজে আসবে না।[১১৫]

৫। আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে যাকাত আদায় করবে না, কেয়ামতের দিন সে জাহান্নামে যাবে।[১১৬]

---

[১১২] *ইসবাহানী*।
[১১৩] *তবারানী*, হাদীস নং ১২/৪২৪।
[১১৪] *তবারানী*।
[১১৫] *ইসবাহানী*।

৬। বুরাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, যে জাতি যাকাত দেওয়া বন্ধ করে দেবে, আল্লাহ তাদের দুর্ভিক্ষে পতিত করবেন। অন্য এক বর্ণনায় আছে, আল্লাহ তাদের বৃষ্টি বন্ধ করে দেবেন।[১১৭]

যাকাত না দেওয়ার শাস্তি

১। যে নারীর কাছে সম্পদ আছে কিন্তু সে যাকাত দেয় না, সে আল্লাহর নিকট অনেক বড় গুনাহগার। কেয়ামতের দিন তার ওপর কঠিন আজাব হবে।[১১৮]

২। আসমা রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, আমি এবং আমার খালা নবীজীর দরবারে এমন অবস্থায় উপস্থিত হলাম যে, আমরা স্বর্ণের অলংকার পরিহিত ছিলাম। নবীজী আমাদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি এগুলোর যাকাত দাও? আমরা বললাম, না। নবীজী বললেন, তোমাদের কি এই ভয় নেই যে, আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে আগুনের অলংকার পরাবেন? এগুলোর যাকাত আদায় করবে।[১১৯]

৩। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যার কাছে স্বর্ণ রূপা আছে কিন্তু সে তার যাকাত দেয় না, কেয়ামতের দিন তার জন্য আগুনের পাত বানানো হবে। তারপর সেগুলো জাহান্নামের আগুনে গরম করে তাদের উভয় পার্শ্ব, কপাল ও পিঠে ছেঁক দেওয়া হবে। ঠাণ্ডা হয়ে গেলে পুনরায় গরম করে নেওয়া হবে।[১২০]

৪। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যাকে আল্লাহ সম্পদ দিয়েছেন কিন্তু সে যাকাত আদায় করেনি, কেয়ামতের দিন তার সম্পদকে একটি লোমবিহীন কালো চিহ্নবিশিষ্টি সাপের আকৃতি দেওয়া হবে এবং তার গলায় শিকলের মতো ছেড়ে দেওয়া হবে। সে তার গলায় পেঁচিয়ে যাবে এবং মুখের দু ধার দিয়ে তাকে দংশন করে বলতে থাকবে আমি তোর সম্পদ, আমি তোর খাজানা।[১২১]

---

[১১৬] *তবারানী*।
[১১৭] *হায়াতুল মুসলিমীন*।
[১১৮] *বায়হাকী; মুসতাদরাকে হাকীম*।
[১১৯] *সহীহ বুখারী; সহীহ মুসলিম*।
[১২০] *সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং ২১৬২।
[১২১] *সহীহ বুখারী*, হাদীস নং ৪৫৬৫; *বেহেশতী জেওর*, ৩/২২।

যাকাতের ব্যাপারে নারীদের ত্রুটি

যাকাতের ক্ষেত্রে নারীরা অনেক অলসতা করে থাকে। নিজের অলংকার ও গয়নার যাকাত দেয় না। এ কথা স্মরণ রাখতে হবে যে, বিয়ের সময় নারী বাবার বাড়ি থেকে যে পরিমাণ স্বর্ণ পায় সে তার মালিক। এর যাকাত দেওয়া তার ওপর ওয়াজিব। আর স্বামীর পক্ষ থেকে যে স্বর্ণ পায়, স্বামী যদি তাকে তার মালিক বানিয়ে দিয়ে থাকে, তাহলে এর যাকাতও নারীর ওপরই ওয়াজিব হবে। আর যদি স্বামী তাকে মালিক না বানায়, শুধু পরিধান করার জন্য দিয়ে থাকে, তাহলে তার যাকাত স্বামীর ওপর ওয়াজিব হবে। প্রতি বছর নিজের অলংকারের হিসাব করে যে পরিমাণ যাকাত ওয়াজিব হয়, দ্রুত তা আদায় করে দিতে হবে। এতে অবহেলা করলে গুনাহ হয়।

দেখুন, আল্লাহ তাআলা অনেক গরিব মানুষকে ধনসম্পদ দেননি। অথচ আপনার মধ্যে তাদের চেয়ে বিশেষ কোনো বৈশিষ্ট্য নেই। অনেক গরিব মানুষ দ্বীনদারিতায় আপনার চেয়েও উন্নত। তারা নামায পড়ে, দ্বীনের বিধান পালন করে। তারপরও আল্লাহ তাআলা তাদেরকে সম্পদ না দিয়ে আপনাকে দিয়েছেন। এর কারণ কী? আল্লাহ তাআলা ধনীদের এ জন্যই সম্পদ দিয়েছেন যে, তারা যেন গরিবদের দান করে। কেননা প্রতিটি মানুষ ওতটুকু সম্পদেরই হকদার, যতটুকু তার প্রয়োজন। তারপরও আল্লাহ তাআলা যাকে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি সম্পদ দিয়েছেন, তাকে তা জমা করার জন্য দেননি; বরং তাদেরকে দান করার জন্য দিয়েছেন, যাদের প্রয়োজন অনুপাতে দেওয়া হয়নি। ধনীদের হাতের মাধ্যমে গরিবদের হাতে সম্পদ দেওয়ার পেছনে আল্লাহ তাআলার অনেক বড় তাৎপর্য ও হেকমত রয়েছে।

উপরোক্ত আলোচনার দাবি অনুযায়ী তো ধনীদের ওপর এই বিধান আরোপ হওয়ার কথা ছিল যে, তাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত সমস্ত সম্পদই গরিবদের দিয়ে দিতে হবে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা অনেক দয়াবান যে, তিনি সমস্ত সম্পদ দান করার নির্দেশ দেননি; বরং শুধু চল্লিশ ভাগের এক ভাগ দেওয়ার আদেশ করেছেন। তথাপি এখানে অবহেলা করা অনেক বড় অন্যায়।[১২২]

---

[১২২] *আল কামাল ফিদ দ্বীন*, ১০৭।

মুসলমানদের প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য অধিকাংশ পেরেশানির কারণ হলো দরিদ্রতা। যাকাত দরিদ্রতা বিমোচনের যথার্থ প্রতিকার। যদি ধনীরা সম্পদ অপচয় না করে, কর্মক্ষম লোকেরা কাজ ও পরিশ্রম করে এবং অপারগ লোকদের যাকাত দিয়ে সহযোগিতা করে, তাহলে মুসলমানদের মধ্যে একজন মানুষও ভুখা-নাঙা থাকবে না। যাকাতের সবচেয়ে বেশি হকদার হলো গরিব আত্মীয়-স্বজন, তার নিজের মহল্লার হোক বা অন্য কোথাও থাকুক। তারপর নিজ মহল্লার গরিব লোকজন। তবে যদি অন্য মহল্লার মানুষ বেশি গরিব হয়, তাহলে তারাই অধিক হকদার।[১২৩]

মহিলাদের একটি অভ্যাস

অধিকাংশ মহিলা টাকা খরচ হওয়ার ভয়ে যাকাত দেয় না। অলংকারের যাকাত না স্বামী দেয়, না স্ত্রী। স্বামী বলে অলংকার স্ত্রীর আর স্ত্রী বলে অলংকার স্বামীর, আমি কেন যাকাত দেব, যার মাল সে দেবে। কিন্তু এই বাহানা দিয়ে দুনিয়াতে বেঁচে গেলেও আখেরাতে আল্লাহর সামনে বাঁচা যাবে না। কেননা অলংকার দুজনের যে-কোনো একজনের তো অবশ্যই। যে মালিক তার ওপরই যাকাত আসবে। আর যদি অলংকার দুজনেরই হয়, তাহলে প্রত্যেকে নিজ নিজ অংশের যাকাত আদায় করবে। আর যদি বাস্তবিকই অলংকার কারোরই না হয়, তাহলে এটা আল্লাহর সম্পদ, কোনো মসজিদে বা মাদরাসায় কিংবা গরিব মিসকিনদের মাঝে সদকা করে দিতে হবে।[১২৪]

যাকাতে কি সম্পদ কমে?

অধিকাংশ ধনবান মানুষ এই আশঙ্কায় যাকাত দিতে অবহেলা করে যে, যাকাত দিলে টাকা-পয়সা কমে যাবে। এ ক্ষেত্রে প্রথমত এ কথা বলা যায় যে, অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, যাকাত ও দান-সদকা দ্বারা কখনো সম্পদে টান পড়ে না। দেওয়ার সময় যদিও কিছু সম্পদ হাত থেকে বেরিয়ে যায়, কিন্তু অন্য দিক থেকে এর অধিক চলেও আসে। হাদীসেও এই বক্তব্য বিদ্যমান। যদি মেনে নিই যে, যাকাত দিলে সম্পদ কমে যায়, তাহলে

---

[১২৩] *হায়াতুল মুসলিমীন*, ১৫০।
[১২৪] *আসবাবুল গাফলা*, ৬৮৪।

এখানে লক্ষণীয় ব্যাপার হলো, নিজের চাহিদা পূরণের জন্য যখন হাজার হাজার টাকা খরচ করা হয়, তখনও তো সম্পদ কমে যায়। সরকারি ট্যাক্স দিলেও তো সম্পদ কমে যায়, না দিলে অপরাধী সাব্যস্ত হতে হয়, তখনও সম্পদ কমে যায়। তাহলে যাকাতকেও আল্লাহর ট্যাক্স মনে করে নিলেই হয়।

দুনিয়াতে যদিও যাকাত দেওয়ার দ্বারা সম্পদ কমে যাওয়া দৃশ্যমান, কিন্তু আখেরাতে তা সঞ্চিত হচ্ছে। বিষয়টা এমন যে, ব্যাংকে টাকা রাখলে যেমন নিজের হাত থেকে টাকা অন্যত্র চলে যায় কিন্তু মনের মধ্যে স্বস্তি থাকে যে, টাকা নিরাপদ জায়গায় আছে এবং তার লাভ বৃদ্ধি হচ্ছে। ঠিক তেমনই ঈমানদার ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াদার ওপর ভরসা রাখে এবং যাকাত দিয়ে তাঁর কাছে সম্পদ জমা রাখে। কেয়ামতের দিন মূলধন ও লাভসহ তাকে দেওয়া হবে। আর ওই সময় এটারই প্রয়োজন পড়বে।

সম্পদের নিরাপত্তার জন্য বেতন দিয়ে চকিদার ও চাকর-বাকর নিয়োগ দেন। এ ক্ষেত্রে যদিও সম্পদের সংখ্যা হ্রাস পায়, কিন্তু পুরো সম্পদ নিরাপদে থাকবে এই চিন্তায় কিছু টাকা খরচ করতে তেমন গায়ে লাগে না। যাকাতকেও ঠিক এ রকম সম্পদের হেফাজতকারী ধরে নিন। তাহলে যাকাত দিতেও কষ্ট হবে না। হাদীসের ভাষ্য থেকে জানা যায় যে, যাকাত না দিলে সম্পদ নষ্ট হয়ে যায়। তার ওপর কোনো না কোনো বিপদ চেপে বসে। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, কোনো সম্পদে যাকাতের মালের সংমিশ্রণ ঘটলে তা ধ্বংস হয়ে যায়।[১২৫]

অন্য এক বর্ণনায় আছে, তোমার ওপর যদি যাকাত ওয়াজিব হয়, আর তুমি তা আদায় না করো, তাহলে এই হারাম মাল তোমার হালাল মালকে নষ্ট করে দেয়। সুতরাং নিজের সম্পদের নিরাপত্তার জন্যই যাকাত আদায় করতে হবে। তা ছাড়া এমন কোনো মানুষ নেই, যে গরিব-মিসকিনদের জন্য কিছু না কিছু খরচ না করে। এখানে যদি হিসাব করে খরচ করে, তাহলে যাকাতের বিষয়টা অনেকটা সহজ হয়ে যায়।[১২৬]

---

[১২৫] *সহীহ বুখারী।*
[১২৬] *ফুরুউল ঈমান, ৫৮।*

অষ্টম অধ্যায়

হজ ও কুরবানী

যে ব্যক্তির কাছে নিত্যপ্রয়োজনের চেয়ে অতিরিক্ত এই পরিমাণ সম্পদ আছে যে, মধ্যম পর্যায়ের বাহন নিয়ে খাওয়া-দাওয়া করে হজ করে দেশে ফিরে আসতে পারবে, তার ওপর হজ ফরয। হজের অনেক ফযিলত কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে হজ গুনাহ ও পাপাচার থেকে মুক্ত হয়, তার প্রতিদান জান্নাত ব্যতীত অন্য কিছু নয়।[১২৭]

উমরা করলেও অনেক সওয়াবের কথা বর্ণিত হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, হজ ও উমরা গুনাহগুলোকে এমনভাবে মুছে দেয়, যেভাবে হাপর লোহার ময়লা দূর করে দেয়।[১২৮]

যার ওপর হজ ফরয হয় আর সে তা আদায় করে না, তার জন্য ব্যাপক ধমকির কথাও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যার কাছে খাওয়া-দাওয়া এবং বাহনের জন্য এই পরিমাণ সম্পদ আছে, যার দ্বারা সে বাইতুল্লাহ পর্যন্ত যেতে পারে, তথাপি সে হজ না করলে সে ইহুদি হয়ে মারা যাক কিংবা খ্রিষ্টান হয়ে মারা যাক, আমার আল্লাহর তাতে কোনো পরোয়া নেই।[১২৯]

কিছু হাদীস

১। আবু উমামা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যার কাছে খাওয়া-দাওয়া এবং বাহনের জন্য এই পরিমাণ সম্পদ আছে, যার দ্বারা সে বাইতুল্লাহ পর্যন্ত যেতে পারে, তথাপি

---

[১২৭] *সহীহ বুখারী*, হাদীস নং ১৭৭৩; *সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং ১৩৪৯।
[১২৮] *ইবনে মাজাহ*, হাদীস নং ২৮৮৭; *মুসনাদে আহমাদ*, হাদীস নং ১৬৭।
[১২৯] *তিরমিযী*, হাদীস নং ৮১২; *বাযযার*, হাদীস নং ৮৬১।

সে হজ না করলে সে ইহুদি হয়ে মারা যাক কিংবা খ্রিষ্টান হয়ে মারা যাক, আমার আল্লাহর তাতে কোনো পরোয়া নেই।[১৩০]

২। আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি হজ, উমরা বা জিহাদ করার উদ্দেশ্যে বের হয়ে পথিমধ্যে মারা যাবে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য হজ, উমরা ও জিহাদের সওয়াব লিখে দেবেন।[১৩১]

৩। আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, হজ ও উমরাকারী আল্লাহর মেহমান। তারা দুআ করলে আল্লাহ তাদের দুআ কবুল করেন এবং তারা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইলে আল্লাহ তাদের ক্ষমা করেন।[১৩২]

মদীনা যিয়ারত

যদি সম্ভব হয় হজের পূর্বে অথবা পরে মদীনা মুনাওয়ারায় উপস্থিত হয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রওজা মোবারক ও মসজিদে নববী যিয়ারত করে বরকত লাভ করতে হবে। এ ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে আমার মৃত্যুর পর আমার যিয়ারত করবে, আমি জীবিত অবস্থায় যিয়ারত করলে যে বরকত লাভ হতো, সে ওই বরকতই লাভ করবে। তিনি আরও বলেছেন, যে ব্যক্তি শুধু হজ করবে কিন্তু আমার যিয়ারত করবে না, সে আমার সাথে বড় অবিচার করবে।

মসজিদে নববীর ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি এখানে একটি নামায আদায় করবে, সে পঞ্চাশ হাজার নামাযের সমপরিমাণ সওয়াব পাবে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে এই মহা দৌলত নসীব করুন এবং সমস্ত নেক কাজ করার তাওফিক দান করুন। আমীন।

---

[১৩০] *তিরমিযী*, হাদীস নং ৮১২; *বাযযার*, হাদীস নং ৮৬১।
[১৩১] *আবু ইয়ালা*, হাদীস নং ৬৩৫৭; *আল মুজামুল আওসাত*, হাদীস নং ৫৩২১।
[১৩২] *বেহেশতী জেওর*, ৩৫।

কুরবানী

কুরবানীর অনেক সওয়াব রয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কুরবানীর দিনগুলোতে কুরবানীর চেয়ে বেশি কোনো কাজ আল্লাহর পছন্দ নয়। (এই দিনগুলোতে এই কাজই সকল নেক কাজের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।) কুরবানী করার সময় অর্থাৎ জবাই করার সময় রক্তের যে ফোঁটা জমিনের ওপর পড়ে, তা জমিন পর্যন্ত পৌঁছার আগেই আল্লাহর নিকট মাকবুল হয়ে যায়।[১৩৩] রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কুরবানীর পশুর গায়ে যতগুলো পশম থাকে, প্রতিটি পশমের বিনিময় একটি করে সওয়াব হয়।[১৩৪]

সুবহানাল্লাহ! একটু ভেবে দেখুন, এর চেয়ে বড় সওয়াব আর কী হতে পারে যে, একটি কুরবানী করলেই হাজার হাজার সওয়াব লাভ হয়। ছাগলের গায়ে এই পরিমাণ পশম থাকে যে, কেউ যদি সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত গুনতে থাকে, তবুও শেষ করতে পারবে না। তাহলে ভাবুন কী পরিমাণ সওয়াব লাভ হয়!

একটি বড় দ্বীনদারির কথা বলি, যদি কারও ওপর কুরবানী ওয়াজিব না হয়েও থাকে, তবুও সওয়াবের আশায় কুরবানী করা উচিত। যখন এই দিনগুলো চলে যাবে, তখন কি আর এই দৌলত অর্জন করা যাবে এবং এত সহজে এতে অধিক সওয়াব লাভ করা যাবে! আর যদি আল্লাহ তাআলা ধনসম্পদ দিয়ে থাকেন, তাহলে নিজের কুরবানীর পাশাপাশি যে আত্মীয়-স্বজন মারা গিয়েছেন, যেমন : বাবা-মা প্রমুখ, তাদের পক্ষ থেকেও কুরবানী করা উচিত। তাহলে তাদের কাছেও এই বিশাল পরিমাণ সওয়াব পৌঁছে যাবে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তার স্ত্রীগণ, নিজের পীর প্রমুখের পক্ষ থেকেও কুরবানী করতে পারেন। অন্যথায় কমপক্ষে নিজের পক্ষ থেকে তো করতেই হবে। কেননা ধনীর ওপর কুরবানী করা ওয়াজিব। যার কাছে ধনসম্পদ আছে এবং তার ওপর কুরবানী ওয়াজিব হয়েছে, তথাপি যদি সে কুরবানী না করে, তাহলে তার চেয়ে বড় হতভাগা ও মাহরুম আর কে হতে পারে!

---

[১৩৩] *তিরমিযী*, হাদীস নং ১৪৯৩; *ইবনে মাজাহ*, হাদীস নং ৩১২৬।
[১৩৪] *ইবনে মাজাহ*, হাদীস নং ৩১২৭; *মুসনাদে আহমাদ*, হাদীস নং ১৯২৮৩।

কুরবানী-সংক্রান্ত কিছু হাদীস

১। হুসাইন বিন আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি সওয়াবের নিয়তে খুশি মনে কুরবানী করবে, কেয়ামতের দিন তা তার জন্য জাহান্নাম থেকে প্রতিবন্ধক হবে।[১৩৫]

২। আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, নিজের কুরবানীর পশুকে খাইয়ে-দাইয়ে মোটাতাজা করবে। কেননা সে পুলসিরাতে তোমাদের বাহন হবে।[১৩৬]

৩। আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কুরবানী করার সামর্থ্য রাখে, তথাপি কুরবানী করে না, সে যেন আমাদের ঈদগাহে না আসে।[১৩৭]

ফায়েদা : উক্ত হাদীস থেকে কী পরিমাণ অসন্তুষ্টি প্রকাশ পাচ্ছে! কোনো মুসলমান কি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অসন্তুষ্টি সহ্য করতে পারে! এই অসন্তুষ্টি তার জন্য যার ওপর কুরবানী ওয়াজিব। যার ওপর কুরবানী ওয়াজিব নয়, তার জন্য এই অসন্তুষ্টি নয়।

৪। আবু তালহা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি দুম্বা কুরবানী করেছেন। আরেকটি দুম্বার ব্যাপারে বলেছেন, এটা আমার উম্মতের পক্ষ থেকে, যারা আমার ওপর ঈমান আনবে।[১৩৮]

ফায়েদা : ভাবার বিষয় হলো, যেখানে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ উম্মতকে নিজ কুরবানীতে স্মরণ রেখেছেন, সেখানে উম্মত তাকে স্মরণ রাখে না এবং তার পক্ষ থেকে এক অংশও কুরবানী দেয় না।[১৩৯]

---

[১৩৫] *তবারানী*।
[১৩৬] *কানযুল উম্মাল*।
[১৩৭] *ইবনে মাজাহ*, হাদীস নং ৩১২৩; *মুসনাদে আহমাদ*, হাদীস নং ৮২৮৩।
[১৩৮] *যাখিরাতুল হুফফাজ*, ২/৭৬৪।
[১৩৯] *বেহেশতী জেওর*, ৩২৮; *হায়াতুল মুসলিমীন*, ১২৭, ১৭৭।

নবম অধ্যায়

আল্লাহর যিকির

এখানে এমন একটি বিষয়ের কথা বলব, যার কল্যাণ ব্যাপক এবং যার দ্বারা আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করার শক্তি অর্জন হয়। আর তা হলো, নামায রোযা ইত্যাদির পাশাপাশি আল্লাহ তাআলার যিকির করতে হবে। এর মাধ্যমে অন্তরে আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্ক তৈরি হয় এবং নামাযে মন বসে। কিন্তু নারীদের মধ্যে আল্লাহর যিকির করার প্রচলন খুবই কম। এর কারণ হলো তাদের মধ্যে কোনো শায়েখ নেই। শায়েখতনয়া আছে অনেক, কিন্তু মুর্শিদ কিংবা পীর হওয়ার মতো কেউ নেই।

মহিলারা নিজেদের স্বামীদের মাধ্যমে কোনো আল্লাহওয়ালা থেকে যিকিরের পদ্ধতি জিজ্ঞেস করে নেবে এবং নিজেদের মধ্যে এর চর্চা করবে। আল্লাহর যিকিরের সাথে তাদের স্বভাব-প্রকৃতির একটা বিশেষ সম্পর্ক আছে। কেননা আল্লাহর যিকির ওই সমস্ত মানুষের মাঝে রেখাপাত করে, যাদের অন্তরে প্রশান্তি ও একাগ্রতা আছে। মহিলাদের মধ্যে এটা পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান। পর্দার বরকতে তাদের অন্তরে বিক্ষিপ্ততা থাকে না। তারা ঘরের চার দেয়ালের মাঝেই নিজেদের আবৃত করে রাখে বিধায় তাদের অন্তরে একনিষ্ঠতা অনেক বেশি থাকে। এই অবস্থা পর্দার কারণে সৃষ্টি হয়। এই পরিস্থিতিতে তারা যদি আল্লাহর যিকির করা শুরু করে, তাহলে খুব দ্রুত এর উপকার লাভ করতে থাকে। এজন্য তাদের এদিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত এবং মন লাগিয়ে আল্লাহর যিকির করা উচিত।

কুরআন তিলাওয়াতের জন্য নারীদের কিছু সময় বের করা উচিত। নারীরা কুরআন তিলাওয়াত কম করে। অথচ এর দ্বারা অন্তর পরিষ্কার হয় এবং নেক কাজের প্রতি আগ্রহ-উদ্দীপনা বৃদ্ধি পায়। এজন্য কুরআন তিলাওয়াতের অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।[১৪০]

---

[১৪০] *আত তাবলীগ*, ৩/৬০।

যিকরুল্লাহ-সংক্রান্ত কিছু হাদীস

১। আবু সাইদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো, কেয়ামতের দিন কোন বান্দা আল্লাহর নিকট বেশি মর্যাদাবান এবং উত্তম বলে বিবেচিত হবে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যে পুরুষ অধিকহারে আল্লাহর যিকির করে এবং যে মহিলা অধিকহারে আল্লাহর যিকির করে।

২। আবু মুসা আশআরী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে নিজের রবের যিকির করে আর যে যিকির করে না, তাদের উদাহরণ হলো জীবিত ও মৃতের মতো।[১৪১] অর্থাৎ যে আল্লাহর যিকির করে সে জীবিত আর যে আল্লাহর যিকির করে না সে মৃত। কেননা অন্তরের জীবন হলো আল্লাহর যিকির। অতএব, আল্লাহর যিকির থাকলে অন্তর জীবিত, না থাকলে মৃত।

৩। আবদুল্লাহ বিন বুসর রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, ইসলামের বিধি-বিধান তো অনেক, আমাকে এমন কিছু শিখিয়ে দিন, আমি যার ওপর আমল করব। রাসূল বললেন, তোমার জিহ্বা যেন সর্বদা আল্লাহর যিকির দ্বারা জীবন্ত থাকে।[১৪২]

৪। আবু সাইদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, দুনিয়ায় অনেক মানুষ নরম বিছানায় আল্লাহর যিকির করবে, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে জান্নাতের উঁচু উঁচু স্তরে প্রবেশ করাবেন।

ফায়দা : কেউ যেন এমন ধারণা না করে যে, আরাম-আয়েশের আসবাবপত্র পরিত্যাগ না করে আল্লাহর যিকির দ্বারা কোনো উপকার হবে না।

৫। ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন, প্রত্যেক জিনিসের একটা দুর্গ আছে। অন্তরের দুর্গ হলো আল্লাহর যিকির।

---

[১৪১] *সহীহ বুখারী*, হাদীস নং ৬৪০৭; *সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং ৭৭৯।
[১৪২] *তিরমিযী*, হাদীস নং ৩৩৭৫।

৬। ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর যিকির ব্যতীত অধিকহারে কথাবার্তা বলো না। কেননা অধিক কথা বললে অন্তরের মধ্যে কঠোরতা তৈরি হয়। আর আল্লাহ থেকে সবচেয়ে দূরে থাকে ওই অন্তর, যার মধ্যে কঠোরতা রয়েছে।

৭। ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, শয়তান মানুষের দিলে ঝাপটি মেরে বসে থাকে। যখন সে আল্লাহর যিকির করে, তখন সে দূরে সরে যায়। যখন মানুষের অন্তর আল্লাহর যিকির থেকে গাফেল হয়ে যায়, তখন সে তার মধ্যে কুমন্ত্রণা ঢুকিয়ে দেয়।

ফায়দা : ভালো-মন্দ আমলের মূল ভিত্তি হলো অন্তরের ইচ্ছা। অন্তরের ইচ্ছার মূল ভিত্তি হলো কল্পনা। যখন কল্পনা আল্লাহর স্মরণ থেকে দূরে থাকে, তখন শয়তান তার মধ্যে খারাপ খারাপ জিনিস ঢুকিয়ে দেয়। ফলে অন্তরে খারাপ খারাপ ইচ্ছা তৈরি হয়। ভালো ইচ্ছে করার হিম্মত হয় না। তাই ভালো কাজও হয় না, খারাপ কাজই হতে থাকে। আর যখন বেশি বেশি আল্লাহকে স্মরণ করা হয়, তখন অন্তরের মধ্যে ভালো কাজের ইচ্ছা তৈরি হয়। ফলে ভালো কাজ বেশি বেশি হয়ে থাকে, খারাপ কাজ হয় না। এ জন্য আল্লাহর যিকির ও স্মরণ অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।[১৪৩]

আল্লাহর যিকির করার পদ্ধতি

আল্লাহর যিকির দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, যথাসম্ভব আল্লাহর নাম জপতে থাকা। এ ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সংখ্যা, নির্দিষ্ট সময়, নির্দিষ্ট তাসবীহ, উঁচু আওয়াজ, ওজু করা, কিবলামুখী হওয়া কিংবা নির্দিষ্ট কোনো স্থানের শর্ত নেই। বান্দার এখানে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা ও ইচ্ছাধিকার রয়েছে। তবে কেউ স্বেচ্ছায় সংখ্যা স্মরণ রাখার জন্য কিংবা তাসবীহ হাতে থাকলে যিকির করা সহজ হওয়ার উদ্দেশ্যে যদি হাতে তাসবীহ নিতে চায়, তবে এটাও জায়েজ বরং উত্তম। পাশাপাশি মনের মধ্যে যদি লোকদেখানোর নিয়ত চলে আসে সেদিকেও ভ্রুক্ষেপ করবে না। অর্থাৎ যদি এ কথা মনে হয়

---

[১৪৩] *হায়াতুল মুসলিমীন*, ১৪২।

যে, আমার হাতে তাসবীহ দেখলে মানুষজন আমাকে বুযুর্গ মনে করবে, কিন্তু মনের নিয়ত যদি ঠিক থাকে, তাহলে এর দিকে ভ্রুক্ষেপ করবে না। শয়তান এভাবেই ধোঁকা দিয়ে বান্দাকে সওয়াব থেকে মাহরুম করতে চায়।

শয়তান আরও একভাবে ধোঁকা দিয়ে থাকে। সে বলে, তোর মন যখন দুনিয়া কিংবা ঘরের কাজে মশগুল, তখন মুখে আল্লাহর নাম নিলে লাভ কী? ভালো করে বুঝে নিন, এটাও একটা ভুল। বান্দা অন্তর থেকে যখন একবার নিয়ত করে নেয় যে, আমি সওয়াবের উদ্দেশ্যে আল্লাহর নাম নেব, তাহলে এরপর যদি অন্তর অন্যদিকে চলে যায় কিন্তু নিয়ত পরিবর্তন না হয়, তাহলে আগের মতোই সওয়াব লাভ হবে। তবে যে সময়টুকুতে কাজ থাকবে না, তখন অবশ্যই অন্তরকে আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করানোর চেষ্টা করতে হবে। অনর্থক বিষয় নিয়ে কল্পনা করবে না। তাহলে আরও বেশি সওয়াব লাভ হবে।

উল্লেখ্য যে, মহিলারা হায়েজের দিনগুলোতেও কুরআন তিলাওয়াত ব্যতীত অন্যান্য অজিফাগুলোর সময় হলে ওজু করে অজিফা আদায় করে নেবে। এমতাবস্থায় কুরআন তিলাওয়াত করা বৈধ নয়।[১৪৪]

ঘরের কাজকর্মের মাঝে যিকির ও তাসবীহের আমল

দ্বীনদারির ক্ষেত্রে এত বাড়াবাড়ি করা যাবে না যে, ঘর-সংসারের কোনো খবরই থাকবে না। নামায রোযা ইত্যাদি এমনভাবে আদায় করতে হবে, যেন তার পাশাপাশি ঘর ও পরিবারের হকও আদায় হয়। মহিলাদের জন্য এটাও দ্বীনের অংশ। কেননা আপনাদের ঘরের কাজকর্ম করলেও সওয়াব লাভ হয়। তদ্রূপ ঘরের কাজে এত বেশি নির্লিপ্ত হয়ে যাবেন না যে, দ্বীনকে একদমই ভুলে যান। বরং মধ্যম পন্থায় এমনভাবে কাজ করবেন, যেন দ্বীনের জরুরি আমলগুলোও আদায় হয় এবং ঘরের কাজও হয়ে যায়। তাসবীহ ও নফল ইবাদতে মশগুল হয়ে ঘরের কাজ একেবারেই ছেড়ে দেওয়া বড়ই নির্বুদ্ধিতার কথা। ঘরের কাজের পাশাপাশিই তো

---

[১৪৪] *কসদুস সাবিল*, ১৫; *হুকুকুল বাইত*, ৪৫।

আল্লাহ আল্লাহ করা যায়। তাহলে জায়নামাযে বসেই কেন আল্লাহ আল্লাহ করতে হবে!

হাদীসে আছে, তোমার জিহ্বা যেন সর্বদা আল্লাহর যিকির দ্বারা তরতাজা থাকে।[১৪৫] আর এ কথা স্পষ্ট যে, সব সময় তাসবীহ ও জায়নামায সাথে রাখা সম্ভব হয় না। তাই আল্লাহর যিকিরের জন্য কোনো সময় ও স্থানের বাধ্যবাধকতা নেই। বরং সব সময়, উদাহরণস্বরূপ আটা বানানো, খানা পাকানোর সময়ও করা যায়। তবে কিছু সময় বের করে নফল নামায এবং অন্যান্য তাসবীহও পাঠ করে নেবেন। যদি অতিরিক্ত সময় না পাওয়া যায়, তাহলে চলতে-ফিরতেই আল্লাহ আল্লাহ জপতে থাকবেন।[১৪৬]

বিশেষ কিছু যিকির

ইস্তেগফার

আল্লাহর যিকিরের অন্যতম হলো ইস্তেগফার। আবদুল্লাহ বিন বুসর রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ওই ব্যক্তির জন্য সুসংবাদ, যে নিজ আমলনামায় অনেক বেশি ইস্তেগফার পাবে।[১৪৭] ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি সব সময় ইস্তেগফার করবে, আল্লাহ তাআলা তাকে সমস্ত সংকট থেকে উত্তরণের পথ বের করে দেবেন, সকল দুশ্চিন্তা ও পেরেশানি থেকে প্রশস্ততা দান করবেন এবং তাকে এমন স্থানে রিযিক দান করবেন, যা সে কল্পনাও করেনি।[১৪৮]

কালিমা তাইয়িবা

ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা নিজেদের ঈমান তরতাজা করে নাও। সাহাবীগণ

---

[১৪৫] *তিরমিযী*, হাদীস নং ২৩২৯।
[১৪৬] *হুকুকুল বাইত*, ৪৫।
[১৪৭] *ইবনে মাজাহ*, হাদীস নং ৩৮১৮।
[১৪৮] *আবু দাউদ*, হাদীস নং ১৫১৮; *ইবনে মাজাহ*, হাদীস নং ৩৮১৯।

জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, ঈমান কীভাবে তাজা করে? তিনি বললেন, বেশি বেশি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করবে।

আয়েশা বিনতে সাদ বিন আবু ওয়াক্কাস থেকে বর্ণিত, সাদ বিন আবু ওয়াক্কাস রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে এক মহিলার বাড়িতে গেলেন। ওই মহিলার সামনে খেজুরের বীজ ছিল, সে ওগুলোর ওপর সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ পড়ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে নিষেধ করেননি।

ফায়েদা : তাসবীহ গুণে গুণে যিকির করার দলিল এই হাদীস।

মাসনূন আমল

সম্ভব হলে শেষ রাতে তাহাজ্জুদ নামায পড়বেন। অন্যথায় ইশার নামাযের পর বিতরের পূর্বে তাহাজ্জুদের পরিবর্তে কয়েক রাকাত নফল পড়বেন। তদ্রূপ সময় থাকলে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পর অন্যথায় সকাল-সন্ধ্যা একশ বার সুবহানাল্লাহ, একশ বার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং একশ বার আল্লাহু আকবার পাঠ করবেন। ঘুমানোর সময় আসতাগফিরুল্লাহ একশবার পাঠ করবেন। সব সময় উঠতে-বসতে দরূদ শরীফ পাঠ করবেন; এতে ওজু অবস্থায় থাকা কিংবা গণনা করার বাধ্যবাধকতা নেই। ওজু অবস্থায় এবং ওজু ছাড়া সব সময় দরূদ শরীফ পাঠ করা যায়; তবে সব সময় হাতে তাসবীহ নিয়ে ঘুরবেন না। আর যদি কুরআন শরীফ পাঠ করতে পারেন, তাহলে প্রতিদিন কিছু অংশ তিলাওয়াত করবেন।[১৪৯]

তাসবীহে ফাতেমী

ফাতিমা রা.-এর ঘটনা

ফাতিমা রাযিয়াল্লাহু আনহা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট সবচেয়ে প্রিয়ভাজন ছিলেন। তার ভালোবাসায় নবীজী সোজা হয়ে

---

[১৪৯] *কসদুস সাবিল*, ১৫।

দাঁড়িয়ে যেতেন। তার ব্যাপারে ইরশাদ করেছেন, ফাতিমা হলো জান্নাতী নারীদের সর্দার। তার মর্যাদা এত উঁচু ছিল যে, আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন দ্বিতীয় বিয়ে করার ইচ্ছে করলেন, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ফাতিমাকে কষ্ট দেবে, সে আমাকেও কষ্ট দেবে।

এত প্রিয় কন্যা একবার যখন চাক্কি পিষার কারণে হাতে ফোসকা পড়ার অভিযোগ জানালেন, যে বিষয়টিকে আজকাল অনেক দোষণীয় মনে করা হয়। একবার আমি আমার বংশের নারীদের বললাম যে, নতুন মেয়েদের দিয়ে চাক্কি পিষান, তাহলে তাদের স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। কেননা অধিকাংশ ধনী নারীদের অসুস্থতা আবশ্যকীয় বিষয় হয়ে গেছে, যার মূল কারণ হলো আরামপ্রিয়তা। এ জন্য আমি যখন তাদেরকে এই কাজ করানোর কথা বললাম, তখন অনেকে বলল, আল্লাহ না করুক, আপনি এমন এমন কুলক্ষণ কেন বের করেন!

যা-হোক, চাক্কি পিষার কারণে ফাতিমা রাযিয়াল্লাহু আনহার হাতে ফোসকা পড়ে গিয়েছিল। আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, রাসূল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট থেকে একজন দাসী নিয়ে এসো, তাহলে সে তোমার সাহায্য করবে। তাই ফাতিমা নবীজীর কাছে গেলেন। তিনি যখন নবীজীর ঘরে পৌঁছলেন, তখন নবীজী ঘরে উপস্থিত ছিলেন না। তাই তিনি আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে এই কথা বলে চলে গেলেন।
নবীজী বাড়ি ফেরার পর আম্মাজান আয়েশা থেকে এ বিষয়টি জানতে পারলেন। তখনই তিনি ফাতিমার ঘরে তাশরিফ আনলেন। ফাতিমা তখন ঘরে বসে ছিলেন এবং নবীজীকে দেখে উঠে দাঁড়াতে চাইলেন। নবীজী বললেন, বসে থাকো। তখন তিনি আবার নবীজীর কাছে এই আবদার করলেন। নবীজী বললেন, তুমি চাইলে দাসী দিতে পারি আবার চাইলে এর চেয়ে উত্তম কিছুও দিতে পারি। এটা শুনে ফাতিমা এ কথা জিজ্ঞেস করেননি যে, ওই উত্তম জিনিস কী? বরং তিনি সাথে সাথে বললেন, উত্তম জিনিসই দিয়ে দিন।

রাসূল বললেন, ঘুমানোর সময় ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ এবং ৩৪ বার আল্লাহু আকবার পড়বে। এটা গোলাম

দাসীর চেয়েও উত্তম। আল্লাহ তাআলার ওই বান্দি আনন্দচিত্তে তা গ্রহণ করে নিলেন।[১৫০]

কুরআন তিলাওয়াতের গুরুত্ব

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমরা কুরআন মাজীদ পাঠ করবে। কেননা কেয়ামতের দিন সে সুপারিশ হয়ে উপস্থিত হবে।[১৫১] রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও ইরশাদ করেছেন, আমার উম্মতের সবচেয়ে উত্তম ইবাদত হলো কুরআন তিলাওয়াত করা। অন্য এক হাদীসে আছে, কুরআন তিলাওয়াতকারীরা আল্লাহওয়ালা এবং তাঁর বিশেষ বান্দা।[১৫২]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ওই ব্যক্তি, যে কুরআন শিখে এবং অন্যকে শেখায়।[১৫৩] রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেছেন, যার বুকে কুরআনের কিছু অংশও নেই, সে তো বিরান ঘরের মতো।[১৫৪]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে আল্লাহর কালামের একটি হরফ পাঠ করবে সে একটি সওয়াব লাভ করবে; এবং এক সওয়াব দশ সওয়াবের সমপর্যায়ের। আমি এটা বলছি না যে, আলিফ লাম মিম এক হরফ; বরং আলিফ এক হরফ, লাম এক হরফ এবং মিম এক হরফ।[১৫৫]

হে মুসলমানেরা, এই হাদীসগুলো নিয়ে চিন্তা করুন এবং নিজের কুরআন তিলাওয়াতকারী হওয়ার এবং সন্তানদের কুরআন পড়ানোর চেষ্টা করুন। যদি পূর্ণ কুরআন পড়ানোর সুযোগ না হয়, তাহলে যতটুকু সম্ভব ততটুকু পড়ানোর হিম্মত করুন।

---

[১৫০] *তাসহীলুল মাওয়ায়েয; জরুরতুল উলামা*, ২/৪০।
[১৫১] *সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং ৮০৪।
[১৫২] *মুসনাদে আহমাদ*, হাদীস নং ১২২৭৯।
[১৫৩] *সহীহ বুখারী*, হাদীস নং ৫০২৭।
[১৫৪] *তিরমিযী*, হাদীস নং ২৯১৩।
[১৫৫] *তিরমিযী*, হাদীস নং ২৯১০।

ছেলে হোক বা মেয়ে হোক, পূর্ণ কুরআন না পারলে অর্ধেক, তাও না পারলে শেষ মানজিলটুকুই পড়িয়ে দিন। এখানে ছোট ছোট সূরা রয়েছে, নামাযে এগুলো কাজে আসে। সকল নারী-পুরুষ কুরআন পাঠ করুন। যদি কেউ সিপারা পড়তে না পারেন, তাহলে মুখস্থ করেই কয়েক সূরা পড়ুন এবং সব সময় তা অল্প অল্প করে পড়তে থাকুন। তাহলে তা স্মরণ থাকবে। অন্যথায় পড়া না পড়া সব বরাবর হয়ে যাবে।

যদি কুরআন তিলাওয়াত করার এবং শেখার হিম্মত বা ফুরসত না হয়, তাহলে কোনো হাফেজের কাছে বসে কুরআন তিলাওয়াত শুনুন। হাদীসে এরও সওয়াবের কথা উল্লেখ আছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কুরআনের একটি আয়াত শোনার জন্য মনোযোগ দেয়, তার জন্য এমন সওয়াব লেখা হয় যা ক্রমশ বাড়তে থাকে। আর যে একটি আয়াত পাঠ করে, তা তার জন্য কেয়ামতের দিন একটি নূরে পরিণত হবে।

আল্লাহু আকবার! কুরআনের মর্যাদা কত সমুন্নত! যতদিন কুরআন তিলাওয়াত করতে পারবেন না, ততদিন কারও তিলাওয়াত শুনলেও সওয়াবের বিশাল ভান্ডার লাভ করে ফেলবেন। আল্লাহর বান্দা ও বান্দিগণ, এটা তো কঠিন কিছু নয়। কিন্তু আফসোসের বিষয় হলো, এই যুগে অধিকাংশ মানুষ কুরআন মাজীদ থেকে বিমুখ হয়ে গেছে। অনেকে তো আবার কুরআন পড়া ও পড়ানোকেও বেকার মনে করে। নাউজুবিল্লাহ। এদিকে যারা কুরআন পড়ে তারা তা মুখস্থ করার প্রতি মনোযোগ দেয় না; আর যে অংশ সব সময় পড়ে তা বিশুদ্ধভাবে পড়ার প্রতি গুরুত্ব দেয় না।[১৫৬]

বি. দ্র. সাধারণ মানুষ মনে করে, দুপুরবেলা কুরআন পড়া নিষেধ। এটা ভুল। তবে এই সময় নামায পড়া নিষেধ। তদ্রূপ অনেকে মনে করে, ওজু ছাড়া দরূদ শরীফ ও কুরআন তিলাওয়াত করা যায় না। এটাও ভুল। ওজু ছাড়াও কুরআন পড়া যায়; তবে ওজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা যায় না।[১৫৭]

---

[১৫৬] *হায়াতুল মুসলিমীন*।
[১৫৭] *আগলাতুল আওয়াম*, ৭২।

কুরআন তিলাওয়াতের গুরুত্বপূর্ণ আদব

কুরআন তিলাওয়াত করার সময় কিছু আদবের প্রতি লক্ষ রাখতে হবে। তন্মধ্যে কিছু প্রকাশ্য আর কিছু অভ্যন্তরীণ। সংক্ষেপে বললে প্রথমত কুরআন তিলাওয়াতের সময় ওজু অবস্থায় থাকতে হবে। কাপড় পাক হতে হবে। স্থান পাক হতে হবে। দুর্গন্ধমুক্ত স্থান হতে হবে। কিবলামুখী হয়ে বসলে অতি উত্তম। প্রত্যেকটি হরফ স্পষ্ট করে পড়বে। যখন একেবারেই পড়তে মন চাইবে না, তখন পড়া বন্ধ করে দেবে। তিলাওয়াতের সময় মনোযোগ তৈরি করার একটি সহজ পদ্ধতি হলো, তিলাওয়াত শুরু করার পূর্বে কল্পনা করবে, আল্লাহ তাআলা আমার কাছে আবদার করেছেন যে, আমাকে একটু কুরআন পড়ে শোনাও। আমি তাঁর আদেশ পালনে কুরআন পড়ছি এবং তাঁকে শোনাচ্ছি। এই কল্পনা করলে অন্যান্য আদব-কায়দাও অটোমেটিক বাস্তবায়ন হয়ে যাবে।[১৫৮]

কুরআন মাজীদকে অনেক বেশি সম্মান করতে হবে। তার দিকে পা ছড়ানো যাবে না। তার থেকে উঁচু স্থানে বসা যাবে না। তাকে মেঝে বা বিছানার ওপর রাখা যাবে না; বরং রেহাল বা অন্য কিছুর ওপর রাখবে। যদি কুরআন একদম পুরান হয়ে যায় বা ছিঁড়ে যায়, তাহলে পবিত্র কাপড় দ্বারা পেঁচিয়ে মানুষের পা পড়ে না এমন পবিত্র স্থানে দাফন করে দিতে হবে। উল্লেখ্য, কুরআন পাঠ করার সময় এ কথা স্মরণ রাখবেন যে, আমি আল্লাহ তাআলার সাথে কথা বলছি, তাহলে দেখবেন অন্তরে কেমন নূর ও প্রশান্তি অনুভূত হয়।[১৫৯]

দুআর গুরুত্ব ও আদব

আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের প্রত্যেকের নিজ রবের কাছে নিজের প্রয়োজনগুলো চাওয়া উচিত। এমনকি তাঁর কাছে লবণও চাইবে এবং জুতার ফিতা ছিঁড়ে গেলে তাও তাঁর কাছে চাইবে।[১৬০]

ফায়েদা : অর্থাৎ এই চিন্তা করা যাবে না যে, এত সাধারণ জিনিস অত বড় সত্তার কাছে কীভাবে চাইব! তাঁর নিকট বড় জিনিসও ছোট।

---

[১৫৮] *ফুরুউল ঈমান*, ৪৪।
[১৫৯] *হায়াতুল মুসলিমীন*, ৩৭।
[১৬০] *তিরমিযী*, হাদীস নং ৩৬০৪।

আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে আল্লাহর কাছে চায় না, আল্লাহ তার ওপর রাগান্বিত হন।[১৬১] আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, দুআ সকল ইবাদতের মূল।[১৬২] আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর নিকট দুআর চেয়ে অধিক মর্যাদার কিছু নেই।[১৬৩] ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, দুআ ওই মুসিবতেও উপকার করে যা অবতীর্ণ হয়েছে। আবার ওই মুসিবতেও উপকার করে যা এখনো অবতীর্ণ হয়নি। আল্লাহর বান্দারা, দুআকে নিজের জন্য আবশ্যক করে নাও।[১৬৪] জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে কেউ দুআ করলে আল্লাহ তাআলা তাকে তার কাঙ্ক্ষিত জিনিস দান করেন, অথবা তার থেকে কোনো অকল্যাণ দূর করে দেন, যতক্ষণ না সেই দুআ কোনো গুনাহ বা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার ব্যাপারে হয়।

ফায়েদা : উপর্যুক্ত হাদীসসমূহ থেকে কয়েকটি বিষয় জানা যায়—

১। দুআর ফযিলত ও প্রভাব। অনেক মানুষ পেরেশানি ও মুসিবতের সময় বিভিন্ন ধরনের চেষ্টা-তদবির করে, কিন্তু দুআর প্রতি গুরুত্ব দেয় না। অথচ দুআই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তদবির।

২। দুআ কখনো বেকার যায় না। হয়তো কাঙ্ক্ষিত জিনিসই পাওয়া যায় অথবা কোনো আগত বিপদ দূর হয়ে যায় কিংবা আখেরাতের জন্য সঞ্চিত হয়ে যায়। মোটকথা দুআ অবশ্যই কবুল হয়। কিন্তু তার ফলাফল হয় বিভিন্ন।

৩। দুআ কবুল হওয়ার জন্য শর্ত হলো, দুআটি শরীয়তের বিপরীত না হওয়া। দুআর সময় অন্তর উপস্থিত থাকতে হবে এবং দুআ কবুল হওয়ার বিশ্বাস রাখতে হবে। তদ্রূপ আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হলো, হারাম খাবার ও হারাম পোশাক থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

---

[১৬১] প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৩৩৭৩।
[১৬২] প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৩৩৭১।
[১৬৩] প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৩৩৭০।
[১৬৪] প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৩৫৪৮।

আজকাল এই শর্তগুলোর প্রতি অনেক অবহেলা লক্ষ করা যায়। তারপর মানুষজন অভিযোগ করে যে, দুআ কবুল হয় না![১৬৫]

দুআর প্রকৃতি

আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা এমন অবস্থায় আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করো যে, তোমাদের দুআ কবুল হওয়ার পূর্ণ বিশ্বাস থাকবে। মনে রাখবে, আল্লাহ তাআলা অমনোযোগী মনের দুআ কবুল করেন না।[১৬৬]

দু-চারটি শব্দ মুখস্থ করে নিয়ে নামাযের পর তোতা পাখির মতো মুখে উচ্চারণ করার নাম দুআ নয়। এটা দুআ নয়, বরং দুআর নকল। দুআর প্রকৃত রূপ হলো, আল্লাহর দরবারে দরখাস্ত-আবেদন পেশ করা। অতএব বিচারকের কাছে দরখাস্ত পেশ করার সময় আমাদের অবস্থা যেমন হয়, দুআর সময়ও কমপক্ষে তেমন অবস্থা হতে হবে। দরখাস্ত দেওয়ার সময় চোখ থাকবে বিনয়ী, শরীর ও মন একইসাথে উপস্থিত থাকবে, শরীরের ভাবেও থাকবে নম্রতা, আর মুখ দিয়ে কিছু বলতে হলে আদবের সাথে বলা এবং নিজের দরখাস্ত মঞ্জুর হওয়ার জন্য পুরোপুরি অনুনয় করা। এ কথা বিশ্বাস করানোর চেষ্টা করতে হবে যে, আমার পরিপূর্ণ আশা আছে যে, আপনি আমার দরখাস্তের প্রতি পূর্ণ মনোযোগ দেবেন।

হে মুসলমান! মন দিয়ে চিন্তা করুন। আপনারা কি দুআ করার সময় আল্লাহ তাআলার সাথে এমন আচরণ করেন? চিন্তা করুন এবং লজ্জিত হন। এই আচরণ না করে নিজের দুআকে দরখাস্তের মতো মনে করেন কীভাবে! মূলত ত্রুটি তো খোদ আপনাদের। যে কারণে এই দুআ আর দরখাস্তের পর্যায়ে থাকেনি। এখন যেহেতু দুআর প্রকৃতি বুঝতে পেরেছেন, তো এভাবে দুআ করুন এবং তারপর দেখুন কেমন বরকত লাভ হয়।[১৬৭]

---

[১৬৫] *ফুরূউল ঈমান; হায়াতুল মুসলিমীন।*
[১৬৬] *মুসতাদরাকে হাকীম*, হাদীস নং ১৮৪১।
[১৬৭] *হায়াতুল মুসলিমীন*, ৯৬।

দশম অধ্যায়

দুনিয়ায় নিবিষ্ট না হয়ে আখেরাতের প্রস্তুতি নেওয়া

১। হুযাইফা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেছি যে, দুনিয়ার ভালোবাসা সমস্ত গুনাহের মূল।[১৬৮]

২। সাহল বিন সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলার কাছে যদি দুনিয়া মাছির পাখার সমপরিমাণ মূল্য রাখত, তাহলে তিনি কোনো কাফেরকে এক ঢোক পানিও পান করতে দিতেন না।[১৬৯]

৩। জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি মৃত বকরির বাচ্চার পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। তখন তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কি এটা চাইবে যে, এই মৃত বাচ্চাটি এক দিরহামের বিনিময়ে তার হয়ে যাক? সাহাবীগণ বললেন, (দিরহাম তো দামি জিনিস) আমরা তো এটাকে পছন্দও করি না যে, আমরা তুচ্ছ জিনিসের বিনিময়েও চাইব না যে, তা আমাদের হয়ে যাক। রাসূল বললেন, আল্লাহর কসম, তোমাদের কাছে এই মৃত বাচ্চা যত তুচ্ছ, আল্লাহ তাআলার নিকট দুনিয়া এর চেয়েও নিকৃষ্ট।[১৭০]

৪। কাব বিন মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যদি দুটি ক্ষুধার্ত নেকড়েকে বকরির পালে ছেড়ে দেওয়া হয়, তাহলে তারা বকরিদের এতটা ধ্বংস করবে না, যতটা সম্পদ ও বড়াই মানুষের দ্বীনকে ধ্বংস করে। (অর্থাৎ দুনিয়ার প্রতি এত ভালোবাসা, যার সামনে দ্বীনের কোনো খবরই থাকে না।)

---

[১৬৮] হাদীসটি মুরসাল। *বায়হাকী*, হাদীস নং ১০৫০১; *আল জামিউস সগীর*, হাদীস নং ৩৬৪৬।
[১৬৯] *তিরমিযী*, হাদীস নং ২৩২০।
[১৭০] *সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং ২৯৫৭।

৫। আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা অধিকহারে সমস্ত স্বাদ বিনষ্টকারী তথা মৃত্যুর কথা স্মরণ করো।[১৭১]

৬। আবদুল্লাহ বিন উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মৃত্যু মুমিনের জন্য উপহার। (সুতরাং উপহার পেয়ে খুশি হওয়া উচিত। আর যদি কেউ আজাবকে ভয় পায়, তাহলে তা থেকে বাঁচার তদবির করতে হবে; আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিধিবিধান অনুযায়ী চলতে হবে।)

৭। ইবনে উমর বলতেন, সন্ধ্যা হলে সকালের অপেক্ষা করবে না, আবার সকাল হলে সন্ধার অপেক্ষা করবে না।[১৭২]

৮। ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার উভয় কাঁধ ধরে বলেছেন, দুনিয়াতে এমনভাবে থাকবে যেন তুমি পরদেশি; বরং এমনভাবে থাকবে যেন তুমি একজন পথিক।[১৭৩]

৯। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মৃত্যুর স্মরণে দ্বীনের প্রতি নিবিষ্টতা আর মনের মধ্যে শক্তি সৃষ্টি হয়। (এর পদ্ধতি হলো এই যে, সব সময় এই চিন্তা করবে যে, দুনিয়া একটি নিম্নমানের জিনিস এবং একদিন শেষ হয়ে যাবে। নিজের জীবন তো অনেক শীঘ্রই শেষ হয়ে যাবে, মৃত্যু খুব তাড়াতাড়ি উপস্থিত হবে। তারপর ধারাবাহিক এই ঘটনাগুলো শুরু হয়ে যাবে: কবরের আজাব, কেয়ামতের হিসাব-কিতাব, জান্নাত-জাহান্নামের প্রতিদান।[১৭৪]

গুনাহ থেকে তাওবা ও ইস্তেগফার

১। আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মুমিন বান্দা যখন গুনাহ করে তখন তার

---

[১৭১] *তিরমিযী*, হাদীস নং ২৩০৭।
[১৭২] *সহীহ বুখারী*, হাদীস নং ৬৪১৬।
[১৭৩] *সহীহ বুখারী*, হাদীস নং ৬৪১৬।
[১৭৪] *হায়াতুল মুসলিমীন*, ১৯৫।

অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে যায়। তারপর যদি তাওবা-ইস্তেগফার করে নেয়, তাহলে অন্তর পরিষ্কার হয়ে যায়। আর যদি গুনাহ করতেই থাকে, তাহলে অন্তরের কালো দাগ আরও বেড়ে যায়।[১৭৫]

২। মুয়াজ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, নিজেকে গুনাহ থেকে বাঁচাবে। কেননা গুনাহ করলে আল্লাহর গজব নাযিল হয়।

৩। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয় ব্যক্তি গুনাহের কারণে রিযিক থেকে বঞ্চিত হয়।

৪। আনাস বিন মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে তোমাদের রোগ ও ওষুধের কথা বলে দেবো না? শুনে রাখো, তোমাদের রোগ হলো গুনাহ আর তোমাদের ওষুধ হলো ইস্তেগফার।

৫। আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, গুনাহের কারণে অন্তরে এক ধরনের জং তৈরি হয়। ইস্তেগফারের মাধ্যমে তা পরিষ্কার হয়।

৬। আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর কসম, আমি প্রতিদিন সত্তর বারের অধিক আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করি।[১৭৬]

৭। আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তির ওপর তার কোনো ভাইয়ের সম্মান কিংবা অন্য জিনিসের দায় আছে, তার উচিত ওই দিনের পূর্বেই তার থেকে মাফ করিয়ে নেওয়া, যেদিন না দিনার থাকবে, না দিরহাম। অন্যথায় তার দায়ের পরিবর্তে নেক আমল নেওয়া হবে। যখন তার কাছে কোনো নেকি থাকবে না, তখন অন্যের গুনাহ তার ওপর চাপিয়ে দেওয়া হবে।[১৭৭]

---

[১৭৫] *তিরমিযী*, হাদীস নং ৩৩৩৪।
[১৭৬] *সহীহ বুখারী*, হাদীস নং ৬৩০৭।
[১৭৭] *সহীহ ইবনে হিব্বান*, হাদীস নং ৭৩৬১।

সবর ও শোকরের পরিচয়

মানুষ জীবনে যে সমস্ত পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়, তা দুই ধরনের হয়ে থাকে—

১। তার মেজাজ ও প্রকৃতির অনুকূলে। এ সমস্ত বিষয়কে আল্লাহ তাআলার নেয়ামত মনে করা, এগুলো নিয়ে আনন্দিত হওয়া, এগুলোকে নিজের যোগ্যতার চেয়ে বেশি মনে করা, মুখে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করা এবং এই নেয়ামতকে গুনাহের কাজে ব্যবহার না করার নামই হলো শোকর তথা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ।

২। মানুষ এমন কিছু পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় যা তার মেজাজ ও প্রকৃতির প্রতিকূলে হয়, তার প্রতি মানবমন অসন্তুষ্ট ও বিরূপ থাকে। এমন পরিস্থিতিতে এই বিশ্বাস লালন করা যে, আল্লাহ তাআলা এর মধ্যে আমার জন্য কল্যাণ নিহিত রেখেছেন এবং তা নিয়ে অভিযোগ-শেকায়েত না করা, বিষয়টি যদি শরঈ হুকুম হয় তাহলে তার ওপর দৃঢ়তার সাথে আমল করা, আর যদি কোনো মুসিবত হয় তাহলে তা সহ্য করা এবং তার জন্য পেরেশান না হওয়া—এটাই হলো সবর তথা ধৈর্য।

উদাহরণস্বরূপ, মানবমন দ্বীনের কাজকে ভয় করে এবং গুনাহের কাজের প্রতি আকৃষ্ট হয়। নামায-রোজা করতে মন চায় না। হারাম আয় পরিহার করতে এবং কারও অধিকার পূরণ করতে মন সায় দেয় না। এই পরিস্থিতিতে সাহস করে দ্বীনের কাজগুলো সম্পন্ন করবে। একটু কষ্ট হলেও গুনাহের কাজ থেকে বিরত থাকবে। তাহলে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই এর মজা ও আরাম অনুভব করবে। তদ্রূপ যদি কোনো বিপদ নেমে আসে, অভাব-অনটন দেখা দেয়, অসুস্থতা সৃষ্টি হয়, কেউ মারা যায়, শত্রুক্ষতি করে, কারও অত্যাচারের শিকার হয় কিংবা আর্থিক ক্ষতি হয়—এমন সময় বিপদাপদের কল্যাণের দিকগুলো স্মরণ করবে; সবচেয়ে বড় কল্যাণ হলো সওয়াব পাওয়া, হাদীসে বিপদের বিনিময়ে সওয়াবের ওয়াদা করা হয়েছে। পাশাপাশি এই বিপদ কারও সামনে প্রকাশ করবে না এবং মনে মনে সব সময় তা নিয়েই চিন্তায় ডুবে থাকবে না। তাহলে অন্তরে এক ধরনের বিশেষ প্রশান্তি অনুভব করবে। তবে এই বিপদ দূর করার যদি কোনো পন্থা থাকে তাহলে তা অবলম্বন করায়

কোনো সমস্যা নেই। যেমন : অভাব দূর করতে হালাল উপার্জন করা, অসুস্থতার জন্য চিকিৎসা নেওয়া, দুআ করা ইত্যাদি।

মোটকথা, প্রতিটি মুহূর্তে মানুষ কোনো না কোনো পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েই থাকে—নিজের অনুকূলে কিংবা প্রতিকূলে। শরীয়তের পক্ষ থেকে প্রথম অবস্থায় শুকরিয়া আদায় এবং দ্বিতীয় অবস্থায় ধৈর্যধারণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শোকর ও সবর এভাবে সার্বক্ষণিক আমলে পরিণত হয়েছে। প্রিয় মা ও বোনেরা! এই আমলটি ভুলে যাবেন না। আমলটি করেই দেখুন, কী পরিমাণ প্রশান্তি লাভ হয়![১৭৮]

---

[১৭৮] *হায়াতুল মুসলিমীন*, ২১০।



এগারোতম অধ্যায়

নারীদের আত্মিক রোগ ও তার চিকিৎসা

ধনসম্পদের ভালোবাসা

অত্যন্ত আফসোসের বিষয় হলো, আমরা এটাও জানি না যে, আমাদের মাঝে কিছু রোগ বিদ্যমান রয়েছে। চিন্তা করলে দেখা যায়, অধিকাংশ মানুষের মাঝে দুটি রোগ অনেক বেশি পাওয়া যায় :

- ✓ ১। সম্পদের ভালোবাসা।
- ✓ ২। প্রভাব-প্রতিপত্তির আকাঙ্ক্ষা।

নারী ও পুরুষ উভয়ের মাঝেই এই রোগ বিদ্যমান। তবে উভয়ের চাহিদার ধরন হয় ভিন্ন। পুরুষরা নিজেদেরকে বড় মনে করে, এভাবে তাদের মধ্যে প্রভাব-প্রতিপত্তির রোগ দেখা যায়। অন্যদিকে নারীরা নিজেদের বড় মনে না করলেও নিজেকে বড় করে প্রকাশ করতে চায়। এ জন্য এমন কথা ও কাজ করতে উদ্যত হয়, যা তাকে অন্যের চেয়ে বড় করে প্রকাশ করে।

তদ্রূপ সম্পদের ভালোবাসার ধরনও হয় বিচিত্র। পুরুষরা টাকা-পয়সাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে। তাই অন্য সব ছেড়ে টাকা-পয়সা উপার্জন ও জমা করার পেছনে পড়ে থাকে। পক্ষান্তরে নারীদের অলংকার কাপড়-চোপড় ও ঘরোয়া জিনিসের প্রতি বেশি ভালোবাসা থাকে। রংবেরঙের কাপড়, বিচিত্র থালাবাসন ও বিভিন্ন সাজসজ্জার অলংকারের প্রতি তাদের টান থাকে।

তবে এ ক্ষেত্রে নারীদের তুলনায় পুরুষদের চিন্তাধারা বেশি কার্যকরী হয়। কেননা টাকা-পয়সা এমন জিনিস যার দ্বারা সবকিছু অর্জন করা সম্ভব। যার কাছে টাকা-পয়সা আছে তার কাছে সবকিছু আছে। টাকা-পয়সা সবকিছুর

বিনিময় হতে পারে। কিন্তু থালাবাসন ইত্যাদি সবকিছুর বিনিময় হতে পারে না, এবং তা দ্বারা সবকিছু অর্জনও করা যায় না।

এখানে এই আপত্তি করা যথার্থ হবে না যে, পুরুষরাও তো অনেক জমিজিরাত ক্রয় করে রাখে এবং বিভিন্ন স্থাবর সম্পত্তি দামাদামি করে। এর দ্বারা বোঝা যায় যে তারাও টাকা-পয়সার চেয়ে আসবাবপত্রকে বেশি ভালোবাসে। এর উত্তর হলো, এখানেও আসবাবপত্র দ্বারা টাকা-পয়সা জমা করাই মূল উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। কেননা জমি থেকে আমদানি হতেই থাকবে আর মূল পুঁজি নিরাপদ থাকবে। সুতরাং এখানেও টাকা-পয়সার প্রতিই ভালোবাসা প্রকাশ পায়।

পক্ষান্তরে নারীদের প্রকৃতি ভিন্ন। তারা সব সময় সাজসজ্জা ও আসবাবপত্রের প্রতি আকৃষ্ট থাকে। এ জন্যই দুই হাতে টাকা ওড়ায়। প্রথমত এর কারণ হলো, টাকা-পয়সা দিয়ে সবকিছু অর্জন করা যায়, এ কথার মর্ম তাদের অন্তরে থাকেই না। আর দ্বিতীয়ত এই টাকা তো তাদের উপার্জিত নয়, তাই বেহিসাব খরচ করে বেড়ায়।[১৭৯]

যা-হোক, যে কারণেই হোক নারীদের টাকা-পয়সার তুলনায় আসবাবপত্রের প্রতি বেশি ঝোঁক থাকে। এমনকি অপ্রয়োজনীয় জিনিসের প্রতিও তাদের দৃষ্টি নিক্ষেপিত হয়। তারা শুধু জানতে পারলেই হয় যে, অমুক জিনিস বিক্রি হচ্ছে, সাথে সাথে তা কেনার ব্যবস্থা করে ফেলে। কেমন যেন আগে থেকেই এর অপেক্ষায় ছিল। আসবাবের প্রতি তাদের এত মহব্বত যে, কোনো জিনিসের জন্য তারা দশ-বিশটা পর্যন্ত প্রয়োজন দাঁড় করিয়ে দেয়। থালাবাসন বিক্রেতা এলে কোনো প্রয়োজন না থাকলেও তার থেকে কিনে রাখবে। এমনকি সচ্ছল পরিবারগুলোতে এত পরিমাণ জিনিসপত্র থাকে যে, কখনো তা ব্যবহার করারও সুযোগ হয় না। তবুও নারীরা আরও জিনিস কিনতে অস্বীকার করে না।

অবস্থা এই যে, অনেকে বড় বড় বিছানা ও বাক্স কিনে রেখেছে, তবুও এসব জিনিসের ক্রয় বন্ধ হওয়ার নাম নেই। আজকাল বিশেষত

---

[১৭৯] *খাইরুল আসাস*, ৩৩৮।

লৌকিকতাপূর্ণ সুন্দর সুন্দর জিনিস কেনার একটি ধুম পড়েছে, যা মূলত সাজসজ্জা ও সৌন্দর্য ব্যতীত অন্য কোনো কাজে ব্যবহৃত হয় না। উপরন্তু এ আসবাবপত্র এতটাই দুর্বল যে, একটু টোকা লাগলেই ভেঙে যায় এবং অন্য কোনো কাজে ব্যবহার করার যোগ্য থাকে না। তবুও নারীরা এই জিনিসের প্রতিই দিনরাত গুরুত্ব দিয়ে থাকে যে, ঘরে অনেক জিনিস থাকতে হবে, লৌকিকতা ও বিলাসিতার পণ্য থাকতে হবে। মোটকথা, তাদের মাঝে আসবাবপ্রেম এত প্রবল যে, তাদের কাছে যত আসবাবই থাকুক না কেন, তাদের আরও চাই। আসবাবের ব্যাপারে তাদের ক্ষুধা নিবারণ হয় না, ধৈর্যও কুলোয় না।[১৮০]

পুরুষরা জামায় তালি লাগিয়ে পরে থাকে। কিন্তু নারীদের বাক্সভরতি জামা থাকলেও যথেষ্ট হয় না, ঘরভরতি পোশাক কামনা করে। কখনো যদি অভাব-অনটন দেখা দেয়, তখন তো তালি লাগিয়ে নেয়, কিন্তু সচ্ছলতার সময় কখনো তা চিন্তা করে না। অনেক পুরুষ সাধারণ স্বল্প বেতনের চাকরি করে, কিন্তু তার স্ত্রীকে দেখবেন বেগম সেজে বসে আছে। পুরুষ নিজের জামায় তালি লাগানোকে দোষের কিছু মনে করে না, কিন্তু নারী গরিবের মেয়ে হলেও সে নিজেকে এমনভাবে প্রকাশ করতে চায়, যেন মহা বড়লোকের মেয়ে বা স্ত্রী। উপরন্তু এ সমস্ত সাজগোজ স্বামীকে খুশি করার জন্য করে না, বরং অন্যকে দেখানোর উদ্দেশ্যে করে থাকে। অথচ এটা একেবারেই বোকামি যে, অন্যদের দেখানোর জন্য সাজসজ্জা করবে। কেননা নিকটজনদের তো জানাই থাকে যে, কার কতটুকু সামর্থ্য ও টাকা-পয়সা আছে। তাহলে তাদের দেখিয়ে কী লাভ! আর অপরিচিতদের দেখানোর কথা তো নাই বললাম। নারীদের জন্য সাজসজ্জা যদিও পছন্দনীয়, কিন্তু তা মধ্যমপন্থার অধিক তো নয়![১৮১]

লোভ-লালসা

লোভ সকল আত্মিক রোগের মূল। এই রোগ নারীদের মাঝে বেশি থাকে। এটা এমন রোগ, যাকে উম্মুল আমরায তথা সকল রোগের উৎপত্তিস্থল

---

[১৮০] *খাইরুল আসাস*, ৩৪০।
[১৮১] প্রাগুক্ত।

বলা উচিত। কেননা এর কারণেই ঝগড়া-ফ্যাসাদ হয়, মামলা-মোকদ্দমা হয়। যদি মানুষের মধ্যে লোভ না থাকত, তাহলে কেউ অন্যের হক নষ্ট করত না এবং বিশৃঙ্খলারও পরিস্থিতিও তৈরি হতো না। দুর্নীতি ও চুরি-চামারিরও মূল কারণ এই লোভ। বুযুর্গানে কেরাম বলেন, সকল মন্দ কর্মের শেকড় হলো অহংকার। আর এই অহংকারের কারণও এক পর্যায়ে লোভ-লালসা। বরং এভাবে বলা উচিত যে, অহংকারও লোভের একটা শাখা।

অনৈক্যের কারণও লোভ। গর্ব করার কারণও লোভ। কেননা ধনসম্পদ দেখানো তা অর্জন করার পরই সম্ভব। আর ধনসম্পদ জমা করা হয় লোভের কারণে। এভাবেই লোভ উম্মুল আমরায হিসেবে প্রমাণিত হয়। হাদীসে এসেছে, দুনিয়ার ভালোবাসা সকল অন্যায়ের মূল। আর দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা লোভ থেকেই সৃষ্ট। নারীদের মাঝে এই রোগ পুরুষদের তুলনায় বেশি হয়ে থাকে।[১৮২]

দুনিয়াপ্রীতি

নারীদের মাঝে দুনিয়ার ভালোবাসা হয় প্রবল। কাপড়-চোপড় ও অলংকারের প্রতি তাদের লোভ সীমাহীন। অবস্থা এমন যে, চারজন নারী একত্রে বসলে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত শুধু দুনিয়ারই চর্চা হয়, দ্বীনের কথা উচ্চারণও হয় না। নারীরা নিজেও চিন্তা করে দেখতে পারেন যে, তাদের কয়টা বৈঠকে দ্বীনের আলোচনা হয়!

দুনিয়াবি আলোচনায় যদি গীবত ইত্যাদি গুনাহের মিশ্রণ না থাকে, তাহলে তো তা মুবাহ, ঠিক আছে। কিন্তু এই মুবাহের সীমানা যুক্ত হয়ে আছে গুনাহের সাথে; যে ব্যক্তি অধিকহারে দুনিয়ার আলোচনা করবে, সে অবশ্যই গুনাহে লিপ্ত হবে। বুযুর্গরাও এমনই বলেন এবং অভিজ্ঞতাও তাই বলে।

অতএব মুসলমানদের উচিত সব সময় আখেরাতের কাজে নিমগ্ন থাকা। দুনিয়াবি মুবাহ আলোচনায় বেশি যুক্ত না হওয়া। কোনো বৈঠকে

---

[১৮২] *ইলাজুল হিরস; তাবলীগ*, ৩/৩৪।

আদ্যোপান্ত দুনিয়াবি কথাবার্তা বলা হলে তা গুনাহের অপরিহার্য ভূমিকায় পরিণত হয়। এর উৎপত্তি সেই দুনিয়াপ্রীতি থেকেই হয়ে থাকে, সাধারণত নারীদের মাঝে যা প্রবল থাকে। এ জন্যই নারীরা অধিকাংশ কম দ্বীনদার হয়। যে সমস্ত স্থানে নারীরা অধিক দ্বীনদার, তার কারণও এই যে, তাদের মধ্যে দুনিয়াপ্রীতি কম।[১৮৩]

লালসা ও অপ্রয়োজনীয় চাহিদা

নারীদের মাঝে অকৃতজ্ঞতার পরিমাণ বেশি হওয়ায় তাদের মধ্যে অল্পেতুষ্টি পাওয়া দুষ্কর। দেখা যায়, অনেক নারীর সারা বছরের জামা-কাপড় ঘরের মধ্যে আছে, যা তারা বক্সে ভরে রেখে দিয়েছে, তথাপি কোনো কাপড়ের ফেরিওয়ালা তাদের ঘরের সামনে দিয়ে খালি হাতে চলে যাওয়ার জো নেই। ফেরিওয়ালার আওয়াজ শোনামাত্র তাকে বসিয়ে কাপড়-চোপড় নাড়াচাড়া করে দেখা শুরু করে দেয়। তদ্রূপ ঘরে প্রয়োজনাতিরিক্ত থালাবাসন থাকা সত্ত্বেও তাদের চাহিদার ধারা শেষ হয় না। মোটকথা, নারীদের মাঝে দুনিয়া-পূর্ণতার লালসা অনেক বেশি থাকে। সর্বাবস্থায় নিজের মনের চাহিদা পূরণের জন্য উদগ্রীব থাকে। অলংকারের চাহিদা এত ভয়াবহ যে, কিছু নারী আপাদমস্তক অলংকার পরিহিত থাকলেও নতুন অলংকারের আশা রাখে। নতুন অলংকার কিনতে না পারলে পুরান অলংকারগুলোর সংস্কারের পেছনেই টাকা-পয়সা নষ্ট করতে থাকে। আজ একটি অলংকার বানানোর পর আগামীকাল একই অলংকার অন্য নারীর কাছে ভিন্ন ডিজাইনের দেখতে পেলে তার মাথায় এই ভূত সওয়ার হয়ে যায় যে, আমাকেও এই ডিজাইন বানাতে হবে![১৮৪]

অল্পে তুষ্ট না হওয়া

নারীদের মধ্যে অল্পেতুষ্টির উপাদান নেই বললেই চলে। তাদের স্বভাবে অস্থিরতার পরিমাণ অনেক বেশি। অল্প জিনিসে তারা জীবন যাপন করতে পারে না, যদিও পুরো ঘর সামানায় ভরপুর মনে হয়! পুরুষদের

---

[১৮৩] *হাম্মুল আখিরা*, ৫২৭।
[১৮৪] *আল কামাল ফিদ দ্বীন*, ৭৭।

প্রয়োজনের স্তর হয় এমন যে, যতটুকু না হলে কষ্ট হয়, অধিকাংশ মধ্যবিত্তের বাড়িতে ওই পরিমাণ জিনিসপত্রই থাকে, আলহামদুলিল্লাহ। কারও যদি সামর্থ্য বেশি থাকে, তাহলে যে জিনিসে অধিক আরাম পাওয়া যায় তা সংগ্রহ করতে কোনো সমস্যা নেই । পুরুষরা এতটুকুর মাঝেই পরিপূর্ণতা খুঁজে পায়। পক্ষান্তরে নারীদের প্রয়োজনের কোনো সীমাই নেই। পুরুষ যতটুকুকে নিজের প্রয়োজন মনে করে, নারীরা তাকে স্বল্পতা ও সংকীর্ণতা মনে করে। তাদের নিকট প্রয়োজনের স্তর শুরু হয় সেখান থেকে, যেখানে গিয়ে পুরুষরা প্রয়োজনের পূর্ণতা লাভ করে । আর পরিপূর্ণতার স্তর হলো যাকে মূলত কামনা বা বিলাসিতা বলা যায়। এসবের পেছনে মূল কারণ হলো, নারীদের মাঝে অকৃতজ্ঞতার পরিমাণ বেশি।

অস্বস্তি ও বচসা

মহিলাদের অস্বস্তির একটি ধরন হলো, নতুন একটি জামা বানালে তার জন্য তারা একটি কমিটি গঠন করে ফেলে। খালাকে দেখিয়ে বলবে, দেখেন তো ফিতা ঠিক আছে কি না। আরেকজনকে বলবে, বলো তো কী লাগাব? নকশা করব নাকি এমনিতেই থাকবে?

এবার যদি তাদেরকে বলা হয়, একটি জামার জন্য সারা দুনিয়ার মানুষ জমা করে ফেলার কী দরকার? নিজের পছন্দমতো বানিয়ে পরে নিলেই তো হয়! তখন তারা বলবে, আরে মিয়াঁ, নিয়ম তো এটাই যে, খাওয়া নিজ পছন্দের পরিধান অন্যের পছন্দের। এমনকি মহিলারা এমনও বলে থাকে, পাথর খেয়ে পেট ভরলেও কোনো সমস্যা নেই, কিন্তু কাপড় হতে হবে শানদার।

শুনে রাখুন, এ সমস্ত মৌজ-মস্তি এবং বচসা ইত্যাদির পেছনে মূল কারণ হলো এই যে, আমরা এ কথা ভুলে গিয়েছি যে, একদিন আমরা এখানে থাকব না।[১৮৫]

---

[১৮৫] *আল-ফানী*, ২৮৪।

প্রয়োজনের অধিক আসবাব জমা করার বাসনা

ঘরের মধ্যে এমন অনেক জিনিস থাকে যা কখনো কাজে লাগে না। তবুও অন্তরে একটা কামনা থাকে যে, আমার ঘরে এতগুলো থালা-বাসন, এতগুলো খাট আর এতগুলো বিছানা থাকবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটা নিষেধ করেছেন। তবে হাঁ, প্রয়োজন পরিমাণ আসবাব রাখতে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। এই নিষেধাজ্ঞার পেছনে তাৎপর্য হলো, অপ্রয়োজনীয় জিনিসের কারণেই অন্তর অধিক পেরেশান থাকে। আর যে জিনিস প্রয়োজনমাফিক তার জন্য অন্তর অতটা চিন্তিত থাকে না।

আজকাল আমরা অধিকাংশ অপ্রয়োজনীয় জিনিস নিয়েই পড়ে থাকি। এগুলো জমা করার পেছনেই সময় নষ্ট করি। বিশেষত মহিলারা খুব বেশি অপ্রয়োজনীয় সামান সংগ্রহ করে। তাদের চোখের সামনে কোনো জিনিস এলেই তারা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এক মহিলা নিজেই বলেছে যে, আমরা তো জাহান্নামের মতো। জাহান্নামের যেমন পেট ভরবে না এবং আরও চাই আরও চাই বলতে থাকবে, তেমনই আমাদের পেটও দুনিয়াবি জিনিস দ্বারা ভরে না।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন কামনা থেকে নিষেধ করেছেন, যার জন্য অপ্রয়োজনীয় জিনিসের সাথে মন লেগে থাকে। আমাদের যে অবস্থা তাতে তো মৃত্যুর সময়ও এই জিনিসের সাথেই আমাদের প্রাণ আটকে থাকবে। বিশেষত মহিলাদের। কেননা তারাই এ কাজ বেশি করে। প্রতিটি জিনিসই তাদের কাছে মনোমুগ্ধকর।[১৮৬]

এই রোগ থেকে পরিত্রাণের উপায় হলো, প্রত্যেকে নিজের ঘরের প্রত্যেকটি আসবাবপত্র নিয়ে চিন্তা করবে যে, কোনগুলো তার নিত্যদিনের কাজে কতটুকু ব্যবহার হয়। তাহলেই দেখা যাবে পাঁচ-দশটি জিনিস বাদে বাকিগুলো মাসে কিংবা বছরেও কাজে লাগে না।[১৮৭]

---

[১৮৬] *গরিবুদ দুনিয়া*, ১৫০।
[১৮৭] প্রাগুক্ত, ১৫৪।

যতদূর সম্ভব প্রতিটি জিনিসের ক্ষেত্রে স্বল্পতা অবলম্বন করতে হবে। যেমন : কোনো মহিলা যদি পান খাওয়া ছাড়তে পারে, তাহলে তার উচিত পান খাওয়া পরিহার করা। আরেকজন চা পানে অভ্যস্ত। মন সব সময় চায়েই আটকে থাকে। অথচ চা পান কোনো প্রয়োজনীয় বিষয় নয়; বরং শুধু শখ ও আনন্দের জন্য পান করা হয়। তার জন্য উচিত হলো চা পান ছেড়ে দেওয়া। যে এক টাকা গজের কাপড় পরে অভ্যস্ত, সে চাইলেই বারো আনা দামের কাপড় পরিধান করতে পারে। মোটকথা, এভাবেই প্রতিটি জিনিসে স্বল্পব্যয়ের দিকে খেয়াল করুন। অর্থাৎ প্রয়োজন পরিমাণ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকুন।[১৮৮]

প্রয়োজন ও অপচয়ের সীমানা

বসবাসের জন্য কার কতটুকু জায়গার প্রয়োজন, এটা প্রত্যেকেই জানে। কেননা মানুষের স্তর যেমন ভিন্ন ভিন্ন, তদ্রূপ তাদের স্তর অনুযায়ী প্রয়োজনের পরিমাণও বিভিন্ন। কারও ছোট একটি কামরাই আরামসে থাকার জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়। আবার কারও বিশাল বাড়িতেও থাকতে কষ্ট হয়। কারও বেশি ঠান্ডা লাগে, সে লেপ গায়ে দেয়। আরেকজনের পাতলা কাঁথা দিয়েই দিন গুজরান হয়ে যায়। এই দুজনের ক্ষেত্রে অপচয়ের পরিমাণ হবে ভিন্ন ভিন্ন। কেননা প্রত্যেকেই তার প্রয়োজন সম্পর্কে নিজেই ভালো জানে।

প্রয়োজনের ওপর একটি স্তর রয়েছে। তা হলো সৌন্দর্য ও আরামের স্তর। এটাও এই শর্তে জায়েজ যে, এর দ্বারা অপচয় হবে না, শরীয়তের কোনো সীমা লঙ্ঘন হবে না এবং অহংকার গর্ব ও বড়াই করার ইচ্ছা থাকতে পারবে না। এই শর্ত না পাওয়া গেলে তা লৌকিকতার পর্যায়ে পৌঁছে যাবে এবং তা নাজায়েজ হয়ে যাবে।

অপচয়ের শরঈ মর্ম হলো, শরীয়ত কর্তৃক কোনো নিষেধ কাজ করা যাবে না এবং গুনাহের কাজে খরচ করা যাবে না। অনেক সময় একই জিনিস এক ব্যক্তি হিসেবে অপচয় হিসেবে গণ্য হয়, আবার আরেকজনের জন্য

---

[১৮৮] *গরিবুদ দুনিয়া*, ১৫৪।

তা অপচয় নয়। যেমন, এক ব্যক্তি দশ টাকা গজের কাপড় পরার সামর্থ্য রাখে, সে দশ টাকা দিয়ে কাপড় কিনল। অন্যদিকে আরেকজন এক টাকা গজের কাপড় কেনারও সামর্থ্য রাখে না, কিন্তু সেও দশ টাকা দিয়েই কাপড় কিনল। এখানে দুজনের হিসেবে হুকুমও হবে ভিন্ন ভিন্ন। প্রথম জনের সামর্থ্য থাকার কারণে দশ টাকা দিয়ে কাপড় কেনা তার জন্য না গুনাহের কাজ, না অপচয় হিসেবে গণ্য হবে। কিন্তু দ্বিতীয় জন যে কর্জ করে কাপড় কিনল এবং নিজেকে অপ্রয়োজনে ঋণের দায়ে ফেলল সে গুনাহগার এবং অপচয়কারী হিসেবে গণ্য হবে। কেননা প্রয়োজন ছাড়া ঋণগ্রস্ত হওয়াও গুনাহের কাজ।

লক্ষ করুন, দশ টাকা গজের কাপড় কেনা একটি বৈধ বিষয়। কিন্তু একজনের জন্য গুনাহের কাজ, অপরজনের জন্য নয়। প্রকৃতপক্ষে তা বৈধ কাজ হলেও একটি প্রসঙ্গের কারণে তা গুনাহের মাধ্যম হয়ে গেছে। তা হলো, অপ্রয়োজনে ঋণ নেওয়া। যদি এই ব্যক্তি এত দামি কাপড় না কিনত, তাহলে অপ্রয়োজনে কর্জ নেওয়ার গুনাহে লিপ্ত হতো না। এ জন্য তার জন্য এত দামি কাপড় পরিধান করা গুনাহের কাজ। গুনাহের মাধ্যমও গুনাহ বলে বিবেচিত হয়।

গৌরবপ্রীতি

নারীদের আরেকটি রোগ হলো গৌরবপ্রীতি। এই রোগ পুরুষদের মাঝেও বিদ্যমান, তবে তার ধরন ভিন্ন। পুরুষও নিজেকে বড় করে উপস্থাপন করে, কিন্তু তার ঢং হয় অন্যরকম। তা ছাড়া পুরুষদের মাঝে সাধারণত জ্ঞান-বিজ্ঞান ইত্যাদি অন্যান্য বৈশিষ্ট্য থাকে বিধায় তাদের ক্ষেত্রে গৌরবপ্রীতি তেমন অপ্রাসঙ্গিক নয়। কিন্তু নারীদের মধ্যে তেমন কোনো বৈশিষ্ট্য না থাকলেও তাদের মধ্যে গৌরবপ্রীতি পূর্ণ দমে বিদ্যমান থাকে।

অনেক নারী নিজেকে বড় মনে করে না। কিন্তু মনে মনে চায় যে, অন্যরা তাকে বড় মনে করুক। পুরুষরা নিজেকে সাধারণ মনে করে, তাই তাদের মধ্যে কিছুটা বিনয় থাকে। কিন্তু নারীরা সব সময় নিজেকে অন্যের চেয়ে অগ্রে দেখাতে চায়। তাদের মধ্যে কোনো বৈশিষ্ট্য না থাকলেও বেশি করে অলংকার সংগ্রহ করে অন্যদের থেকে অগ্রে থাকতে চায়। এ জন্য

কোথাও গেলে বেশি করে অলংকার পরিধান করে যায়, যদিও তা অন্যের থেকে চেয়ে নিয়েই হোক। এমনকি পরিস্থিতি এমনও হয় যে, অলংকার অন্যের থেকে ধার করে আনা হয়েছে এটা অন্যরা জেনে গেলেও তাকে অলংকার নিয়েই যেতে হবে, যেন তাকে অন্যরা নিজেদের চেয়ে নিম্নপর্যায়ের মনে না করে। তাদের মধ্যে সারা দিন এই চিন্তাই বিরাজমান থাকে যে, কাপড়ের ফিতা কেমন হবে, বোতাম কেমন হবে, ডিজাইন কেমন হবে, নকশা করতে হবে, কাটিং সুন্দর হতে হবে, ঝালরও লাগাতে হবে। যতদূর সম্ভব তারা লৌকিকতার আশ্রয় নিতে সচেষ্ট থাকে।

লৌকিকতা করতে গিয়ে মহিলারা নিজেদের মধ্যে কমিটিও তৈরি করে। এখানে অনেক বড় বড় বিষয়ের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই কুর্তার সাথে কোন পাজামা ভালো লাগবে, ওই জোড়ার সাথে কোন ওড়না মানাবে ইত্যাদি। এমনটাও দেখা যায় যে, একজন মহিলার কাছে অনেক অলংকার আছে। কিন্তু আরেকজনের কাছে অন্য ডিজাইনের একটা অলংকার দেখে ফেলেছে। ব্যস, সে তার জন্য পাগল হয়ে যাবে এবং তার কাছে গিয়ে আবেদন করবে যে, বোন, আমারও এমন ডিজাইন লাগবে, এটা আমার কাছে দিয়ে দাও। তারপর সে স্বামীর কাছে গিয়ে এই ডিজাইনের অলংকার বানানোর আবদার করতে থাকবে।

স্বামী বেচারা তাকে যতভাবেই বোঝাক, যতই বলুক যে, এত অলংকারে কী লাভ, অলংকার নষ্ট হয়ে যাবে, স্বর্ণকার দু-নম্বর স্বর্ণ দিয়ে দেবে, তোমার থেকে বেশি টাকা নিয়ে নেবে ইত্যাদি—স্ত্রী এসব কিছুই শুনবে না; বরং বলবে, যা হওয়ার হোক, আমাকে এই ডিজাইনই বানাতে হবে। স্ত্রীর জোরাজোরির সামনে বেচারা স্বামী এখন তার মন রক্ষায় বাধ্য হয়ে যায়। বুদ্ধিমান মানুষ কারও মন ভাঙতে পছন্দ করে না। তাই শেষমেশ সে বলে, আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি জিতেছ, আমি হেরেছি।

এখানেই শেষ নয়। সামনের মাসে যদি আরেকটি নতুন ডিজাইনের অলংকার কারও কাছে দেখে, তখন সেই ডিজাইন বানানোর জন্য উঠেপড়ে লেগে যায়। মোটকথা, যা দেখে তার প্রতিই তাদের আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়ে যায়। অন্যের কাছে যা আছে আমার কাছেও তাই থাকতে হবে—এটাই তাদের চাহিদা। তাদের সাজসজ্জা ও অলংকারের পেছনেই

স্বামীর সমস্ত আয় ব্যয় হয়ে যায়। এ সমস্ত খারাবির মূল উৎস হলো, গৌরবপ্রীতি ও সম্পদের লোভ। এটা পুরুষদের মাঝেও বিদ্যমান, নারীদেও মাঝেও বিদ্যমান। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, অধিকাংশ পুরুষ প্রয়োজনের কথা চিন্তা করে, কিন্তু অধিকাংশ নারী প্রয়োজনের কথা চিন্তা করে না।[১৮৯]

কৃত্রিমতা ও অহংকার

আসল রোগ হলো নিজেকে বড় মনে করা। আল্লাহকে বড় মনে না করা থেকেই এই রোগের উৎপত্তি। এই রোগের চিকিৎসা করতে হবে। এখান থেকে আরও একটি রোগ তৈরি হয়। তা হলো, সাজসজ্জার চিন্তা। মেয়েদের প্রতিপালন সাজসজ্জার মধ্যেই হয়ে থাকে। তাই তাদের মধ্যে সাজসজ্জার বিশেষ এক মর্যাদা স্থির হয়ে যায়। তাদের সকল বিবেক-বুদ্ধি এর পেছনেই ব্যয় হয়ে যায়। ফলে জ্ঞান-গরিমায় তারা বেশিদূর এগুতে পারে না।

লৌকিকতার ক্ষেত্রে মহিলাদের রুচি এমন যে, অধিক পরিমাণে লৌকিকতা থাকতে হবে। বাড়িতে কোনো মেহমান এলে বড় বড় আসবাব বের করে ফেলবে। এক খাসদান তার সামনে একবার গেলে পরেরবার অন্য খাসদান যাবে, প্রথমটা আর যাওয়া যাবে না। উদ্দেশ্য শুধু এটা দেখানো যে, আমাদের বাড়িতে আরও অনেক খাসদান রয়েছে। তাই একবার তামার খাসদান, আরেকবার স্টিলের খাসদান পাঠাতে হবে। অন্যান্য জিনিসের ক্ষেত্রেও এমনই করে থাকে।

প্রতিদিন ঘর ময়লায় ভরপুর থাকে। মেহমান আসার আগেই তা পরিষ্কার করা হয়। শুধু এটা বোঝানোর জন্য যে, আমরা এমন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকি। সবকিছুর মধ্যেই লৌকিকতা থাকবে। তাদের সব সময়ের চিন্তা থাকে, কেউ যেন এমন না বলে, কেউ যেন অমন না বলে। এই 'কেউ' দ্বারা উদ্দেশ্য মানুষজনই হয়ে থাকে। আফসোস, এই 'কেউ' দ্বারা যদি

---

[১৮৯] *খইরুল আসাস*, ৩৩৪।

আল্লাহকে উদ্দেশ্য নেওয়া হতো, তাহলে সব কাজে আল্লাহর খুশি-অখুশিরই চিন্তা করা হতো![১৯০]

তদ্রূপ কোথাও যাওয়ার সময় অপ্রয়োজনীয় সাজসজ্জা, চুল আঁচড়ানো ইত্যাদির কারণও শুধুই অহমিকা। প্রত্যেকেই নিজেকে বড় করে উপস্থাপন করতে চায়। এই অভ্যাস পরিবর্তন করুন। কেননা বড় হওয়ার ভান করার অভ্যাস অনেক নিকৃষ্ট। হাদীসে আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যার অন্তরে বিন্দু পরিমাণ অহংকার (হামবড়া ভাব) থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।[১৯১]

মহিলাদের আরও একটি রোগ হলো, তারা কোনো সমাবেশে বা অনুষ্ঠানে গেলে সকলের আপাদমস্তক পোশাক ও অলংকার মনোযোগ দিয়ে দেখে নেয়। কেউ আমার চেয়ে বেশি আর আমি কারও চেয়ে কম নই তো—এই চিন্তাই তখন তাদের মাথায় কাজ করে। এটাও অহংকার ও দাম্ভিকতার একটি পদ্ধতি। এই ব্যাধি পুরুষদের মধ্যে অনেক কম। দশজন পুরুষ একত্র হলে তাদের মধ্যে এই চিন্তাও আসে না যে, কার পোশাক কেমন। এ জন্য বৈঠক থেকে উঠে যাওয়ার পর কেউ কারও পোশাকের বিবরণ দিতে পারে না। পক্ষান্তরে মহিলাদের প্রত্যেকেরই স্মরণ থাকে যে, কে কোন অলংকার পরেছিল। ভালো করে মনে রাখুন, উপরোক্ত নিয়তে দামি পোশাক ইত্যাদি পরিধান করা জায়েজ নেই।[১৯২]

মহিলাদের দৃষ্টি এত প্রখর হয় যে, কোনো অনুষ্ঠানে গেলে খুবই অল্প সময়ে সকলের পোশাক ও অলংকারের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। সকলের পোশাক ও অলংকার দেখার পর এখন স্বামীকে পেরেশান করা শুরু করে যে, আমাকে অমন অলংকার বানিয়ে দিতে হবে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, অন্যের কাছে যে অলংকার দেখেছে সেটা তার কাছে থাকলেও সে বলবে, তারটার ডিজাইন সুন্দর, ওই ডিজাইন দিয়ে বানিয়ে দিতে হবে। এখন স্বামী তাকে হাজারবার ওই অলংকারের খারাবি বোঝালেও সে একবারও শুনবে না।

---

[১৯০] *খইরুল আসাস*, ৩৬৬।
[১৯১] *মুসনাদে আহমাদ*, হাদীস নং ৬৫২৬; *মালফুযাতে আশরাফিয়া*, ২৮৬।
[১৯২] *গরিবুদ দুনিয়া*, ১৫৬।

এই রোগ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার উত্তম পদ্ধতি হলো, প্রথমবার যখন অলংকার বানাবেন তখনই নিজের মনমতো সুন্দর করে বানিয়ে নেবেন এবং তারপর যেমন আছে তেমন নিয়েই সন্তুষ্ট থাকবেন। একই স্বর্ণ বারবার ভাঙাচোরা করলে তার গঠন নষ্ট হয়ে যায় এবং স্বর্ণও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। স্বর্ণকার প্রতিবারই তার মধ্যে কিছু কিছু খুত মিলিয়ে দেয়। যে কারণে তিন চারবারের পর স্বর্ণের মূল্যমান অর্ধেক হয়ে যায়।

নারীরা জানে, স্বামীর কাছে চাইলে 'না, না' করলেও ঠিকই তার ব্যবস্থা করে দেবে। তাই সে বারবার ফরমায়েশ করতে থাকে। এ জন্যই স্বামীকে বাধ্য হয়ে ঘুষ নিতে হয়। অধিকাংশ সময় ঘুষ নেওয়ার মূল কারণ থাকে স্ত্রী। অতএব এটা মনে করার কোনো কারণ নেই যে, উপার্জনের সমস্ত গুনাহ পুরুষেরই হয়; বরং স্ত্রীও তার সাথে এর আজাবের ভাগীদার হবে।[১৯৩]

আত্মঅহমিকার ব্যাধি

অহংকার নিন্দনীয় ও নিষিদ্ধ বিষয়। এই অভ্যাস মহিলাদের মধ্যে কেমন যেন স্বভাবজাত। উঠতে-বসতে চলতে-বলতে জেওর-অলংকারে এত বেশি অহংকার করে, যেন সবকিছুর ভিত্তিই অহংকার। বাজনা ছাড়া অলংকার তো পরতেই চায় না। বাজনাওয়ালা অলংকারের লাভ হলো, কোথাও গেলে সাথে সাথে পুরুষরা জেনে যায় যে, মহিলাদের আগমন ঘটেছে। কোথাও গেলে রিকশা থেকে নামলেই ঘরে খবর পৌঁছে যায় যে, মেম সাহেব এসেছে। মজলিসে গিয়ে এমন স্থানে বসবে, যেখানে সকলের দৃষ্টি তার ওপর পড়ে। হাত আর কান অবশ্যই খোলা রাখবে। কোনো কারণে হাত ঢাকা থাকলেও যে-কোনো বাহানায় তা খুলবেই। গরমের অজুহাত দেখিয়ে কান খুলে ফেলবে। মোটকথা যে-কোনো উপায়ে নিজের অলংকার দেখানোর চেষ্টা করবে।

একই ক্ষেত্রে যদি কোনো শিক্ষিত স্বল্প-দ্বীনদার নারী উপস্থিত হয় এবং অহংকারের নিন্দনীয় হওয়ার বিষয়টি তার স্মরণে থাকে, তাহলে তাদের

---

[১৯৩] *আসবাবুল গফলাহ*, ৩৮৪।

মধ্যে অনেকে পাতলা বোরকা পরে, অনেকে নেকাব উঠিয়ে কানের অলংকার দেখিয়ে দেয়। যেন এই ধারণা হয়ে যায় যে, তার কানে যদি এত অলংকার থেকে থাকে, তাহলে ঘরে না জানি কী পরিমাণ আছে! ঘরে কিছু থাকুক আর না থাকুক!

এই গুনাহগুলো তো নারীরা হাত-পায়ের অলংকার দেখিয়ে করে থাকে। তারপর একত্রে বসেই গীবতের মজমা জমিয়ে বসবে। এ ছাড়া অন্য কোনো কাজই নেই তাদের। মহিলাদের আত্মঅহমিকা প্রদর্শনের দুটি সুযোগ হয়ে থাকে। একবার কোনো আনন্দ অনুষ্ঠানে, আরেকবার কোনো শোক অনুষ্ঠানে। উভয় স্থানেই তারা সমবেত হয়ে এই গুনাহ করে থাকে।[১৯৪]

অহমিকা ও লৌকিকতার ক্ষেত্রে অনেক মহিলা এতই বাড়াবাড়ি করে যে, তাদের এই চাহিদা পূরণে স্বামীর মোটামুটি ভালো আমদানি যথেষ্ট হয় না। স্বামীর সমস্ত আয় নিজের কাছে নিয়ে স্ত্রীরা স্বামীকে বোকা বানাতে চায়। যে পুরুষ স্ত্রীর মনমতো চলে, তার থেকে খরচের হিসাব নেয় না এবং চোখ বন্ধ করে খরচ করতে দেয়, সেই পুরুষ তাদের কাছে অনেক পছন্দের। পরস্পরে গর্ব করে বলে, আমার স্বামী তো টাকা দিয়ে আর জিজ্ঞেসই করে না যে, কোথায় খরচ করেছ। যে পুরুষ আহমক ও বোকা হয়, সে তাদের কাছে অনেক ভালো। আর যে সুশৃঙ্খল এবং দেখেশুনে খরচ করে, তার ব্যাপারে তার স্ত্রী বলে, আমার স্বামী তো জল্লাদ, জালেম; তার বাড়িতে পেট ভরে খাওয়ারও কোনো সুযোগ নেই, তার বাড়িতে খাওয়া-দাওয়ার ক্ষেত্রেও আমি বিরক্ত হয়ে গেছি।

মহিলাদের যদি লৌকিকতা, অহমিকা ও গর্ব করার জন্য স্বাধীন ছেড়ে দেন, তাহলে তাদের কাছে ভালো থাকা যায়। অন্যথায় তাদের মুখ সোজা থাকা দায়। এ বিষয়টি যে অনেক কদর্যপূর্ণ, তা তো স্পষ্টই। দুনিয়াদার বুদ্ধিজীবীরাও এর নিন্দা করে। ন্যায়নীতির যে-কোনো বই হাতে নিলেই দেখবেন তাতে এই বিষয়গুলো থেকে বেঁচে থাকার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এগুলো মহিলাদের মাঝে এতটাই স্থির হয়ে গেছে যে,

---

[১৯৪] *আত-তাবলীগ*, ৪/৯০।

তাদের কোনো কাজই এসব থেকে খালি থাকে না। তাদের রাত-দিন এই অহমিকা প্রদর্শনের পেছনেই কেটে যায়। স্বামী নিয়ে, ঘরবাড়ি নিয়ে, জায়গা-জমি নিয়ে, বংশ নিয়ে অহংকার করে। সুশিক্ষিত ও দ্বীনদার নারীদের মাঝেও যখন এই রোগ বিস্তৃত হয়েছে, তখন দুনিয়াদারদের মাঝে কেন বিস্তৃত হবে না!

তদ্রূপ বারবার কাপড় বদলানো, দীর্ঘ সময় নিয়ে কাপড় পরিধান ইত্যাদির পেছনেও মহিলাদের উদ্দেশ্য থাকে অহংকার ও গর্ব করা। তাদের সকল কাজেই তা বিদ্যমান। এই রোগ নারীদের মধ্যে বেশি, পুরুষদের মাঝে তাদের তুলনায় কম।[১৯৫]

আমি অহংকার থেকে বেঁচে থাকার একটি তদবির পুরুষদের শিখিয়েছি। অনেক মহিলা এতে অসন্তুষ্ট হলেও এটা অহংকারের প্রতিকার। অভিভাবক পর্যায়ের এবং বুঝমান মহিলাদের উচিত এই পদ্ধতি অবলম্বন করা। তা হলো, মহিলাদেরকে অন্য মহিলাদের সাথে দেখাসাক্ষাৎ করতে নিষেধ করবেন—এটা অসম্ভব। কেননা প্রত্যেকেই তার সমলিঙ্গের সাথে দেখাসাক্ষাৎ করতে আগ্রহী হয়ে থাকে। তাই তাদেরকে অন্যের সাথে সাক্ষাৎ করা থেকে নিষেধ করা যাবে না। বরং তারা যখন অন্য মহিলার সাথে সাক্ষাৎ করতে যাবে কিংবা কোনো কোনো অনুষ্ঠানে যাওয়ার প্রস্তুতি নেবে, তখন তাদের সাথে একটি শক্ত আচরণ করুন। তাদেরকে জামা পরিবর্তন করতে দেবেন না। পুরুষালি আদেশ জারি করুন। কোথাও যেতে চাইলে যে জামা পরে আছে, তা নিয়েই যেতে বাধ্য করুন। যেন জামা পরিবর্তন করতে না পারে।

নারীদের অত্যন্ত আশ্চর্যজনক একটি বিষয় হলো, তারা ঘরের মধ্যে বুয়া ও দাসীদের মতো অপরিষ্কার ও সাদাসিধে থাকে। কিন্তু কোনো অনুষ্ঠানের নাম শুনতেই তাৎক্ষণিক সাজগোজ করে বেগম সাহেবা হয়ে যায়। প্রতিটি জিনিসেরই নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকে। কেউ নারীদের জিজ্ঞেস করুন, ভালো কাপড় পরার উদ্দেশ্য কি শুধু অন্যদের দেখানো? বড় বিস্ময়ের বিষয় এই যে, যার জন্য এই কাপড় বানানো হলো এবং যার পয়সায়

---

[১৯৫] *দাওয়াউল উয়ুব*, ৪/৯৬।

বানানো হলো, তার সামনে তা পরা যাবে না, অন্যদের সামনেই তা পরা হবে! স্বামীর সাথে কখনো নরম ভাষায় কথা বলা হবে না, ভালো জামা পরা হবে না, আর অন্যের সামনে গেলে মুখ থেকে মধু টপকাতে থাকবে আর কাপড়ও সবচেয়ে সুন্দর পরা হবে! কাজে আসবে অন্যদের আর খরচ যাবে স্বামীর! এটা কি ন্যায়!? এই কথাগুলো কিছু লজ্জার, তবুও সংশোধনের জন্য বলতে হয়।

যা-হোক, আমি পুরুষদের বলি, নারীদের থেকে অহংকারের রোগ দূর করতে হলে বাহিরে যাওয়ার সময় তাদেরকে জামা পরিবর্তন করতে দেবেন না। আর নারীদের বলি, যদি কাপড় একেবারেই ময়লা হয়ে যায়, তাহলে বাহিরে যাওয়ার সময় পরিবর্তন করে নিন; তবে সাধারণ পোশাক পরুন। সাদাসিধে কাপড় পরে অন্যের সাথে সাক্ষাৎ করুন। সাক্ষাতের যে উদ্দেশ্য তা এভাবেও অর্জন হয়ে যাবে। নিজেকে সংশোধন করার উদ্দেশ্যে একবার করেই দেখুন, তাহলে এর উপকারিতা বুঝতে পারবেন। এই পদ্ধতি অবলম্বন করলে যদি নিজেকে তুচ্ছ মনে হয় তাহলে আমি বলব, নিজেকে সব সময় তুচ্ছ মনে করাই শ্রেয়। তা ছাড়া কোনো মহল্লায় যদি প্রচলন হয়ে যায় যে, সবাই সাদাসিধে কাপড় নিয়েই সাক্ষাৎ করে, তাহলে তখন আর এটা তাচ্ছিল্যের বিষয় থাকবে না। আর এটা নিয়ে এত গর্ব করার কী আছে তা আমার বুঝে আসে না। একজন গরিব মজদুরের স্ত্রী অনেক সেজেগুজে কোথাও গেলেও অন্য মহিলাদের তার ঘরের অবস্থা জানাই থাকে। তারা তো মনে মনে এই ভাবে যে, এই কাপড় আর অলংকার চেয়ে এনেছে! তাহলে এই সাজসজ্জার মূল্য কোথায়![১৯৬]

অহংকার ও দুনিয়াপ্রীতি থেকে বাঁচার উপায়

১। মহিলাদের উচিত সুন্দর জামা পরে কোথাও না যাওয়া। কোথাও যেতে হলে পূর্বে থেকে যা গায়ে আছে তা নিয়েই চলে যাবেন। এভাবে অহংকার নিঃশেষ হয়ে যায়। পক্ষান্তরে সাজসজ্জা ও দামি কাপড় পরে কোথাও গেলে নিজের বড়ত্ব প্রকাশ পায়, অহংকার সৃষ্টি হয়।

---

[১৯৬] *দাওয়াউল উয়ুব*, ৪/৯১-৯৩।

২। মহিলাদের মধ্যে দুনিয়াপ্রীতি, বিশেষত অলংকার ও জামাকাপড়ের প্রীতি, অনেক বেশি। এ জন্য তাদের উচিত স্বামী যখন ঘরে থাকবে তার সামনে এসব অলংকার ও সুন্দর জামা পরিধান করা। কিন্তু তাদের অবস্থা একদম বিপরীত। বাপের বাড়ি কিংবা অন্য কোথাও গেলে খুব সাজসজ্জা নিয়ে যায় আর ফিরে আসার সাথে সাথে তা খুলে ফেলে, যেন যাওয়ার আগে স্বামী যেমন দেখেছিল এখনো তেমনই দেখতে পায়। এই রোগ থেকে বাঁচতে স্বামীর সামনেই এসব পরুন, কোথাও গেলে পরবেন না।[১৯৭]

লোভ-লালসার একটি প্রতিকার

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোভ-লালসার উপযুক্ত একটি প্রতিকার বলে দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ

> অন্যায় করার পর যে কেউ তাওবা করবে এবং (নিজেকে) সংশোধন করবে, তবে নিশ্চয় আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন। (সূরা মায়িদা, ৫ : ৩৯)

এই আয়াতে তাওবা তথা আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনকে লোভ-লালসার ওষুধ আখ্যায়িত করা হয়েছে। মানবাত্মা একই সময়ে দুই জিনিসের দিকে মনোযোগী হতে পারে না। আর লোভ-লালসা প্রকৃতপক্ষে দুনিয়ার প্রতি ঝোঁক ও মনোযোগের কারণেই হয়ে থাকে। এই মনোযোগকে যখন অন্য কোনো দিকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে, তখন আর দুনিয়ার মনোযোগ বাকি থাকবে না। ফলে লোভ-লালসাও বিলীন হয়ে যাবে।

লোভ থেকে পরিত্রাণের উপায় তো জানা হলো। এখন আসুন জেনে নিই তাওবা তথা আল্লাহর দিকে মনোযোগী হওয়ার অর্থ কী। অনেকে মনে করেন নামায পড়া, রোযা রাখা এবং শরীয়তের বিধান পালন করার নামই হলো আল্লাহর দিকে মনোযোগী হওয়া। তারা শুধু বাহ্যিক আমলের

---

[১৯৭] *আল-হায়াত*, ৫৬৩।

ওপরই সীমাবদ্ধ। তারা অন্তর দিয়ে আত্মিকভাবে আল্লাহর দিকে মনোযোগী হওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে পারেন না।

পক্ষান্তরে অনেকে বলে, আল্লাহর দিকে মনোযোগী হওয়ার অর্থ শুধু এই যে, অন্তর দিয়ে আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করা। তারা কেবল যিকির-আযকার ও মুরাকাবা নিয়েই পড়ে থাকে; নামায রোযা কুরআন তিলাওয়াত ও নজরের হেফাজত ইত্যাদি নিয়ে চিন্তা করে না। তাদেরও আল্লাহপ্রীতির বরকত ও নূর লাভ হয় না।

তাহলে কোন পদ্ধতিতে আল্লাহর দিকে মনোযোগী হলে প্রকৃতপক্ষেই দুনিয়াবিমুখ হওয়া যাবে? এর উত্তর হলো, অন্তর দিয়েই আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করতে হবে। তবে বাহ্যিকভাবেও শরীয়তের বিধান অনুসরণ করতে হবে। এই দুইয়ের মাঝে সমন্বয় করতে হবে; অন্তর আল্লাহর সাথে যুক্ত থাকবে আর বাহ্য শরীয়তের অনুকূলে থাকবে। ইবাদত করুন, গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করুন। চোখের হেফাজত করুন। না-মাহরাম মহিলার কথাও শুনবেন না। এভাবে বাহ্যিক ও আত্মিক আমলের সমন্বয় ঘটাতে পারলেই ইনশাআল্লাহ সফলতা অর্জন করা যাবে।[১৯৮]

দুনিয়াপ্রীতি থেকে বাঁচার একটি সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি বলে দিচ্ছি, যা অনুসরণ করলে আপনার উপকার হবে এবং বারবার পদস্খলন হওয়া থেকে বেঁচে যাবেন। তা হলো এই—

১। প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট সময় করে মৃত্যুর কথা স্মরণ করুন।

২। তারপর কবর ও হাশরের দিনের কথা স্মরণ করুন।

৩। এবং তারপর কেয়ামত দিবসের ভয়াবহতা এবং সেখানকার দুর্যোগের কথা চিন্তা করুন। কল্পনা করুন, আমাদেরকে আল্লাহর তাআলার সম্মুখে দাঁড় করানো হবে, জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। প্রতিটি বিষয়ে খুঁটিনাটি হিসাব দিতে হবে। এবং তারপর আজাবের সম্মুখীন হতে হবে।

---

[১৯৮] *ইলাজুল হিরস*, ৩/৫৪।

এভাবে প্রতিদিন ঘুমানোর সময় কল্পনা করুন। দুই সপ্তাহের মধ্যে ইনশাআল্লাহ অবস্থা পরিবর্তন হয়ে যাবে এবং দুনিয়ার সাথে অন্তরের যোগসূত্র দূর হয়ে যাবে।[১৯৯]

সবচেয়ে বড় চিকিৎসা এটাই, ভাবা শুরু করে দিন। পরকালের সব বিষয় নিয়ে চিন্তা করুন। আমি মরে কবরে যাব। সেখানে প্রশ্ন করা হবে। যদি ঠিকঠাক জবাব দিতে পারি, তাহলে শান্তিতে থাকতে পারব। যদি জবাব দিতে না পারি, তাহলে শাস্তি শুরু হয়ে যাবে। তারপর পুনরায় জীবিত করা হবে। কেয়ামতের ভয়াবহ দিবস নিয়ে চিন্তা করুন। আল্লাহর তাআলার সামনে হিসাব দেওয়ার জন্য দাঁড়াব। তারপর পুলসিরাতে চলব। তারপর হয়তো জান্নাতে যাব কিংবা জাহান্নামে যাব। জাহান্নামের অবস্থা বর্ণনা করার মতো নয়। এ সমস্ত বিষয় চিন্তা করতে থাকুন এবং কষ্ট হলেও নিজের ওপর আল্লাহর বিধানমাফিক চলাকে আবশ্যক করে নিন। আল্লাহর বিধান পালন করলে এই লাভ হয় যে, অন্তরে চিন্তা তৈরি হয়। এই চিন্তা তৈরি হলেই সমস্ত কাজ ঠিক হয়ে যাবে।

আরও একটি বিষয় নিজের জন্য আবশ্যক করে নিন, যে-কোনো কাজ করতে মন চাইলে তাৎক্ষণিক না করে বরং উলামায়ে কেরামের সাথে আলোচনা করে করুন। যদি তারা নাজায়েজ বলে দেন, তাহলে কিছুতেই তা করবেন না। এভাবে আমলের ধারা ঠিক রাখতে পারলে আপনার অন্তর দুনিয়ার প্রতি কিছুতেই প্রশান্ত হতে পারবে না।[২০০]

মহিলাদের পরস্পর সাক্ষাতে সতর্কতা

কুরআনে কারীমে আল্লাহ তাআলা নারীদের নির্দেশ দিয়ে বলেছেন,

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ

তোমরা ঘরে অবস্থান করবে। (সূরা আহযাব, ৩৩ : ৩৩)

এই আয়াত থেকে বুঝে আসে যে, মহিলাদের জন্য মূল হুকুম হলো, তারা নিজ নিজ ঘরে অবস্থান করবে, বাহিরে বের হবে না; না অন্য মহিলাদের

---

[১৯৯] *আর-রেযা বিদ-দুনিয়া*, ১৯২।
[২০০] *আত-তাবলীগ*, ২১৮।

সাথে সাক্ষাতের জন্য, না পুরুষের সাথে। আল্লাহ তাআলা নিশ্চয় কোনো বিশেষ তাৎপর্যে মহিলাদের ঘরে অবস্থান করার নির্দেশ দিয়েছেন। বলা যায়, ঘর থেকে বের হওয়া তাদের জন্য ক্ষতির কারণ। তবে প্রয়োজনের ক্ষেত্রগুলো এই হুকুমের আওতামুক্ত।

অতএব কোনো মহিলার যদি অন্য মহিলার সাথে সাক্ষাৎ করলে ক্ষতির আশঙ্কা থাকে, তাহলে তার জন্য বিধান এই যে, সে তার সাথে সাক্ষাৎ করা থেকে বিরত থাকবে, নিজের ঘরেই থাকবে। আর যার ক্ষতির আশঙ্কা নেই, সে নিজ স্বামীর অনুমতিক্রমে অন্য মহিলাদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করতে পারে।

আল্লাহর প্রিয় বান্দিরা! আপনারা চুলকানির রোগীর সাথে বসতে চান না। পাছে আমার শরীরেও চুলকানি শুরু হয়ে যায়! এই রোগ তো চুলকানির চেয়েও ক্ষতিকর। চুলকানির ক্ষতি তো শুধু শরীরে সীমাবদ্ধ। কিন্তু অন্যের সাথে সাক্ষাতের ক্ষতি ব্যাপক; শারীরিক ও আত্মিক। শারীরিক ক্ষতি তো এই যে, যখন আপনি অন্য মহিলাকে নিজের চেয়ে ভালো অবস্থাসম্পন্ন দেখবেন এবং তার মতো হতে চাইবেন, কিন্তু আপনার তেমন সামর্থ্য থাকবে না, তখন আপনি অকারণে পেরেশানি ও অস্থিরতায় পড়ে যাবেন। দিবারাত্রি এই চিন্তাতেই মগ্ন থাকবেন যে, হায়, তার মতো আমার কাছেও যদি অমুক জিনিস তমুক জিনিস থাকত! ক্ষেত্রবিশেষ স্বামীর কাছে এমন জিনিসের আবদার করে বসবেন, যা এনে দেওয়ার সামর্থ্য তার নেই। ফলে মনোমালিন্য হবে এবং বিষয়টি অকারণে অনেক দূর পর্যন্ত গড়াবে। আত্মিক ক্ষতির দিকটা এমন যে, এর কারণে আপনার মাঝে অকৃতজ্ঞতার রোগ বৃদ্ধি পাবে। যখন অন্যকে নিজের চেয়ে ভালো অবস্থায় দেখবেন, তখন নিজের কাছে থাকা আল্লাহপ্রদত্ত নেয়ামতগুলোর যথার্থ মূল্যায়ন করতে পারবেন না। সব সময় এই চিন্তাই করবেন যে, আমার কাছে কী আছে, কিছুই তো নেই!

অতএব অন্যের সাথে দেখাসাক্ষাৎ করলে যার মাঝে এমন কুপ্রভাব পড়ে, তাকে এই নির্দেশই দেওয়া হবে যে, সে যেন কারও সাথে সাক্ষাৎ না করে। যদি সাক্ষাৎ করতেই হয়, তাহলে যেন গরিব অসহায় মহিলাদের সাথে করে। কেননা গরিবদের সাথে সাক্ষাৎ করলে আপনার মন

আনন্দিত হয়ে যাবে এবং মনের মাঝে কৃতজ্ঞতা সৃষ্টি হবে যে, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তাআলা আমাকে অনেক মহিলার চেয়ে ভালো রেখেছেন। এ জন্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, হে আয়েশা, অসহায় মানুষদের সাথে বসবে এবং তাদের কাছাকাছি থাকবে। গরিব মিসকিনদের সাথে বসলে আল্লাহর নেয়ামতের কদর করা যায় এবং অন্তর খুশি থাকে।[২০১]

লোভ ও অধৈর্য কীভাবে জন্মায়

মহিলাদের মাঝে অলংকার ও পোশাকের লোভ তো স্বভাবজাত থাকেই। কিন্তু তাদের পরস্পর সাক্ষাতে এই লোভ আরও বেড়ে যায়। এ জন্য তাদের পারস্পরিক সাক্ষাৎ অনেক ক্ষতিকর। একজন আরেকজনকে দেখে রং পাল্টায়। আল্লাহ তাআলা কাউকে তার নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী অলংকার ও কাপড় দিয়েছেন, সে ওই সময় পর্যন্ত এতে সন্তুষ্ট থাকবে, যতক্ষণ অন্যদের সাথে সাক্ষাৎ না করবে। যখনই তাদের সাথে সাক্ষাৎ হবে, তখনই তার কাছে নিজের অলংকার ও কাপড় তুচ্ছ মনে হওয়া শুরু করবে। অন্যের অলংকার দেখে তার মন বলতে থাকে, আমার কাছেও এমন অলংকার থাকা উচিত। তখন কিন্তু নিজের সামর্থ্যের দিকে তার খেয়াল থাকে না যে, যার কাছে আমার চেয়ে বেশি অলংকার আছে, তার সামর্থ্যও তো আমার চেয়ে বেশি। যার স্বামীর উপার্জন মাসে পঞ্চাশ টাকা, সেও এক হাজার টাকা মাসিক উপার্জনকারীর স্ত্রীর সাথে নিজেকে মেলাতে চায়। এ জন্য মহিলাদের মাঝে পারস্পরিক সাক্ষাৎ অনেক বেশি নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

আমি এটা বলছি না যে, মহিলাদের পরস্পর সাক্ষাৎ একেবারে বন্ধ করে দেওয়া হোক। বরং আমি বলতে চাচ্ছি, তাদের এই রোগের চিকিৎসা করা দরকার। কারও অন্তর যদি অন্যের অলংকার ও কাপড় দেখে লালায়িত না হয়, তাহলে তার জন্য অন্যের সাক্ষাতে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু যার ওপর খারাপ প্রভাব বিস্তার হয়, তাকে তো অবশ্যই বিরত থাকতে হবে।[২০২]

---

[২০১] *আল-কামাল ফিদ দ্বীন*, ৮৬।
[২০২] *আল-কামাল ফিদ দ্বীন*, ৮৫।

একটি ঘটনা

সাহারানপুরে একজন ইন্সপেক্টর ছিলেন। মাসে চার-পাঁচশ রুপি ইনকাম করতেন। তার অভ্যাস ছিল, সমস্ত ইনকাম নিজের গরিব আত্মীয়দের মাঝে খরচ করতেন, নিজের ঘরের জন্য খুব কমই অবশিষ্ট রাখতেন। ফলে তার স্ত্রীর কাছে এক টুকরো অলংকারও ছিল না, ঘরে কোনো বুয়াও ছিল না। বেচারি নিজ হাতে আটা পিষত এবং নিজেই রান্না করত। তবে সে এই অবস্থায় সন্তুষ্ট ছিল।

আমার এক আত্মীয়ও সাহারানপুরে চাকরি করতেন। ইন্সপেক্টর সাহেবের পাশের বাড়িতেই থাকতেন। ইন্সপেক্টর সাহেব স্ত্রীকে কারও বাসায় যেতে দিতেন না। কিন্তু আমার নিকটাত্মীয়ের জোরাজোরিতে একদিন সাক্ষাৎ করার অনুমতি দিলেন। সে এই বাসায় এসে এখানকার বুয়াদেরকেও নিজের চেয়ে উন্নত অবস্থায় দেখতে পেল। এই বাসার মালকিনের কাছে কিছু অলংকারও ছিল। কিন্তু ইন্সপেক্টরের স্ত্রীর কাছে কোনো অলংকার ছিল না।

এই বাসা থেকে গিয়েই ইন্সপেক্টরের স্ত্রী স্বামীর কাছে অনেক অভিযোগ উত্থাপন করল। ওই বাসাওয়ালার বেতন আপনার চেয়ে কম, তবুও তাদের ঘর অলংকারে ভরপুর। আর আমার কোনো অলংকরণ নেই। তার স্ত্রী নিজ হাতে একটি কাজও করে না, ঘরে কয়েকজন বুয়া আছে, তারাই সব কাজ করে। আর আমি সমস্ত কাজ নিজ হাতে করি। এখন আর আমি এভাবে থাকতে পারব না। আমাকে অলংকার বানিয়ে দিন, দামি কাপড় লাগবে এবং বুয়ারও ব্যবস্থা করে দিন।

আমার সাথে ইন্সপেক্টর সাহেবের সাক্ষাৎ হয়েছিল ইলাহবাদে। বেচারা বলেছিল, একজন মহিলার সাথে এক মিনিট সাক্ষাতের প্রভাব এত তীব্র হয়ে গেছে যে, আমার সারা জীবনের প্রভাব বিলীন হয়ে গেছে। এখন আমার ঘরে রাতদিন অলংকারের আবদার আসতে থাকে। আমার স্ত্রী নিজ হাতে কোনো কাজ করে না। অলংকার বানাতে বানাতে ক্লান্ত হয়ে গেছে, তবুও তার অলংকার বানানো শেষ হয় না। এখন আমার দানসদকাও বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

এ জন্যই আমি বলি, মহিলাদের পরস্পর সাক্ষাৎ অনেক বেশি নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।[২০৩]

নিজের চেয়ে নিম্নমানের কাউকে দেখুন

নারীদের উচিত দুনিয়াবি বিষয়ে নিজের চেয়ে নিম্নমানের লোকদের দিকে তাকানো। যেমন : আপনার বাড়ি যদি কোনো কোটিপতির মেয়ের বাড়ির চেয়ে নিম্নমানের হয়, তাহলে আপনি ওই লোকদের দিকে তাকান, যারা আপনার চেয়েও নিম্নমানের বাড়িতে থাকে। অত্যন্ত ছোট ও সংকীর্ণ ঘরে থাকে, যাতে খাটিয়া বিছানোর পর হাঁটাচলার রাস্তাও থাকে না। সেখানে বাতাস তো দূর কি বাত, সাধারণ জীবন চলার সামানও নেই। আর আপনি বাতাসময় স্থানে এত আরামে ঘুমান যে, ফজরের নামাযও কাযা হয়ে যায়। এ রকম লোকদের বাড়ি দেখলে তখন আপনার মাঝে নিজ বাড়ির প্রতি কদর তৈরি হবে। ঝাড় ফানুস ইত্যাদি না থাকলে কী হয়েছে, বৃষ্টি থেকে তো নিরাপদে থাকা যায়, বাতাসের ব্যবস্থা তো আছে! শেখ সাদি রাহিমাহুল্লাহ লিখেছেন, একবার আমার কাছে জুতা ছিল না। তাই আমি দুঃখিত ছিলাম। হঠাৎ আমি এমন একজন মানুষ দেখলাম, যার পা-ও নেই। তখন আমি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলাম যে, আমার তো পা আছে, জুতা নেই তো কী হয়েছে!

দুনিয়াবি বিষয়ে নিজের চেয়ে নিম্নামানের লোকদের দিকে তাকালে অন্তরে অনেক প্রশান্তি অনুভূত হয়। কিন্তু আজকাল মানুষের রুচি এতই পরিবর্তন হয়েছে যে, দুনিয়াবি বিষয়ে কোথাও কোনো কমতি দেখা দিলে অস্থিরতা শুরু হয়ে যায়। এ কথা বেমালুম ভুলে যায় যে, আল্লাহ তাআলার অনেক মাখলুক আমার চেয়েও খারাপ অবস্থায় দিন গুজরান করছে। আমি তো তাদের চেয়ে ভালো অবস্থায় আছি। পক্ষান্তরে দ্বীনের বিষয়ে এত অবহেলা করে যে, শুধু পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়েই ক্ষান্ত থাকে। কেউ যদি তাকে তাহাজ্জুদ বা ইশরাকের নামায পড়তে বলে, তখন উত্তরে বলে, আমি কি মরে যাব! আমি তো অনেক আমল করি, পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ি![২০৪]

---

[২০৩] *আল-কামাল ফিদ দ্বীন*, ৮৫।
[২০৪] *আল-কামাল ফিদ দ্বীন*, ৮৮।

এক বুযুর্গ বলেন, ধনীদের সাথে ওঠাবসা করার ফলে দিনদিন আমার মাঝে অস্থিরতা বাড়তে থাকল আর আমি মনে করতে থাকলাম যে, আল্লাহ তাআলা আমাকে কোনো নেয়ামতই দেননি। তারপর আমি গরিবদের সাথে ওঠবস শুরু করলাম। তখন আমার এমন মনে হতে লাগল যে, আমি নিজেই একজন বাদশা। আমার সমস্ত অস্থিরতা দূর হয়ে গেল এবং মনে প্রশান্তি এলো। এ জন্যই হাদীসে বলা হয়েছে, দ্বীন-ধর্মের বিষয়ে নিজের চেয়ে উঁচু স্তরের মানুষদের দিকে তাকানো আর দুনিয়ার বিষয়ে নিম্নমানের লোকদের দিকে তাকানো উচিত।[২০৫]

কিন্তু আজকাল বিষয়টি একদম উল্টে গেছে। দ্বীনের ব্যাপারে লোকজন এমন ব্যক্তির দিকে তাকায়, যে খুব একটা ইবাদত করে না। তারপর নিজের মনকে এই বলে প্রবোধ দেয় যে, আমি রাতে উঠি না তো কী হয়েছে, অমুক মাওলানা সাহেবও তো রাতে ওঠে না। আমি দামি পোশাক পরি তো কী হয়েছে, অমুক মুফতি সাহেবও তো দামি পোশাক পরে। কিন্তু এমন বুযুর্গদের দিকে তাকায় না, যাদের রাতের তাহাজ্জুদও হাতছাড়া হয় না। পক্ষান্তরে নিজে যেনতেন অবস্থায় থাকে আর দুনিয়াবি বিষয়ে সব সময় ওপরের দিকে দৃষ্টি রাখে। আফসোস করে বলতে থাকে, হায়, অমুকে তো ধনী হয়ে গেল, অমুক তো বড় ব্যবসায়ী হয়ে গেল। অথচ এর দ্বারা তার অস্থিরতা ও দুশ্চিন্তা ছাড়া কোনো লাভ হয় না।[২০৬]

জবানের হেফাজত

সাহল বিন সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার সন্তুষ্টির জন্য তার দু-চোয়ালের মধ্যবর্তী বস্তু (জিহ্বা) এবং দু-রানের মধ্যবর্তী বস্তু (লজ্জাস্থান) এর হেফাজত করবে, আমি তার জান্নাতের দায়িত্ব গ্রহণ করলাম।[২০৭]

উকবা বিন আমির রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, নাজাতের

---

[২০৫] *সহীহ বুখারী*, হাদীস নং ৬৪৯০।
[২০৬] *আল-কামাল ফিদ দ্বীন*, ৮৭।
[২০৭] *সহীহ বুখারী*, হাদীস নং ৬৪৭৪।

উপায় কী? তিনি বললেন, নিজের জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণে রাখবে, বিনা প্রয়োজনে ঘর থেকে বের হবে না এবং নিজের গুনাহের জন্য কান্না করবে।[২০৮]

ফায়েদা : জিহ্বার ফেতনা অন্যতম বড় ফেতনা। বাহ্যিকভাবে দেখতে হালকা মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তা অনেক ভারি। এ জন্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিহ্বা নিয়ন্ত্রণ করার অনেক বেশি তাগিদ দিয়েছেন। কেননা এই জিহ্বার মাধ্যমেই অধিকাংশ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। জিহ্বা না চললে না কারও সাথে লড়াই হয়, না আদালতে গিয়ে মামলা করতে হয়। কিন্তু জিহ্বা চললেই এসব অনুষঙ্গ সামনে আসতে থাকে।

জবান হেফাজতের পদ্ধতি হলো এই, যখনই কোনো কথা বলার ইচ্ছা হবে কোনো ধরনের চিন্তাভাবনা ছাড়াই বলে ফেলবেন না। দুই-তিন সেকেন্ড কমপক্ষে ভেবে দেখবেন যে, আমি যে কথা বলতে চাচ্ছি তাতে আমার প্রকৃত মালিককে অসন্তুষ্ট করছি না তো! যদি অন্তরে আস্থা পাওয়া যায় তাহলে বলবেন এবং প্রয়োজন পরিমাণ বলবেন। যদি সামান্য সন্দেহের সৃষ্টি হয়, তাহলে চুপ থাকবেন। এই পদ্ধতি অবলম্বন করলে অনেক সহজে অনেক বিশৃঙ্খলা থেকে নিরাপদে থাকবেন ইনশা-আল্লাহ।[২০৯]

মিথ্যা

জিহ্বা দ্বারা অনেক গুনাহ সংঘটিত হয়। সবগুলো থেকে বাঁচা অত্যন্ত জরুরি। মিথ্যা এমনই একটি গুনাহ। মানুষজন এটাকে দুধভাতের মতো সহজ বানিয়ে ফেলেছে। কেউ তা থেকে বেঁচে থাকার চিন্তা করে না। মিথ্যা এমন এক গুনাহ, যা সকল আলেমের মতে নাজায়েজ। তাহলে মুসলমানরা এটাকে এত মজাদার মনে করে কীভাবে! অথচ মিথ্যার সামান্য আঁচ লাগলেও গুনাহ হয়ে যায়।

একজন নারী সাহাবী শিশুকে বুঝ দেওয়ার জন্য বললেন, এদিকে এসো, কিছু দেবো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, সে

---

[২০৮] *তিরমিযী*, হাদীস নং ২৪০৬।
[২০৯] *ফুরুউল ঈমান*, ২৫।

যদি এসে যায়, তাহলে কী দেবে? সে দেখাল যে, আমার হাতে খেজুর আছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যদি তোমার অন্তরে কিছু না দেওয়ার নিয়ত থাকত, তাহলে গুনাহ লেখা হতো।[২১০] চিন্তা করে দেখুন, মিথ্যা কত ভয়াবহ বিষয়![২১১]

গীবত বা পরনিন্দা

কারও অনুপস্থিতিতে তার ব্যাপারে এমন কথা বলা যা তার সামনে বললে সে কষ্ট পেত, এটাই গীবত। সাধারণত মহিলারা এমন বলে থাকে যে, আমি তার মুখের ওপর বলে দেবো! কথা হলো, যদি মুখের ওপর কারও দোষের কথা বলেন, তাহলে কোন ধরনের ভালো কাজ হবে? এতটুকু হবে যে, যার সামনে তার মন্দ বলবেন, বিনিময়ে সেও সাথে সাথে আপনার মন্দ বলে দেবে।

গীবত করা ধোঁকা দিয়ে মারার মতো। মনে রাখবেন, অন্যের ধনসম্পদ যেমন সম্মানিত ও মূল্যবান, তেমনই বরং তার চেয়েও বেশি মূল্যবান হলো তার সম্মান। এ জন্যই দেখা যায়, যখন সম্মানে আঘাত আসে তখন ধনসম্পদ তো দূরে থাক, জীবনেরও পরোয়া করা হয় না। অতএব অন্যের ধনসম্পদে হাত দেওয়া যখন নাজায়েজ, তখন তার ইজ্জত-সম্মানে হাত দেওয়া কীভাবে জায়েজ হতে পারে!

কিন্তু গীবত এমনভাবে ছড়িয়ে পড়েছে যে, কথার মধ্যে গীবত হয়েছে কি না তাও জানা যায় না। গীবত থেকে বাঁচার একমাত্র পদ্ধতি হলো, কারও ভালো-মন্দ কোনো কিছু নিয়েই আলোচনা করবেন না। কেননা কারও ভালো গুণ নিয়ে আলোচনা করলে শয়তান এর মাধ্যমে অন্যের মন্দ পর্যন্ত নিয়ে যায়। আর তখন নিজের কাছে মনে হয় যে, আমি তো ভালো গুণের আলোচনা করছি, অথচ খারাপ গুণ মিলেমিশে তো সমান সমান হয়ে গেছে।

---

[২১০] *মুসনাদে আহমাদ*, হাদীস নং ৯৮৩৪।
[২১১] *তাসহীলুল মাওয়ায়েজ*, ৭৫।

প্রিয় মা ও বোনেরা! আপনাদের নিজেদের কাজই তো অনেক। প্রথমে সেগুলো পূরণ করুন। অন্যকে নিয়ে আপনার কী দরকার। গীবতে গুনাহও হয় কিন্তু কোনো স্বাদ পাওয়া যায় না। আর পার্থিব ক্ষতি তো আছেই। যার মন্দ গাইবেন সে যখন জানতে পারবে, তখন তো উভয়ের মাঝে শত্রুতা সৃষ্টি হয়ে যাবে। এখন আপনিই বুঝে নিন এর ফলাফল কেমন হবে!

মহিলাদের মধ্যে গীবত-রোগ অনেক বেশি। এমনকি যে গীবত করে না সে যেন মহিলাই না! গীবত রমাযান ছাড়া অন্যান্য মাসেও হারাম। রমাযানে তো জঘন্যতম গুনাহ। আমি জানি না, মানুষজন গীবত করে কী মজা পায়। অল্পক্ষণের জন্য নিজের মনকে একটু আনন্দ দেয়। তারপর যখন গীবতকৃত ব্যক্তি জেনে যায় এবং শত্রুতা সৃষ্টি হয়, তখন সারা জীবন এর কুফল ভোগ করতে থাকে। কারও মধ্যে যদি অল্প পরিমাণও অনুভূতি থাকে, তার তো গীবত করার সাথে সাথে মনের মধ্যে অস্থিরতা তৈরি হয়ে যাওয়ার কথা। কেমন যেন কেউ গলা টিপে ধরেছে। এ জন্য আমি মহিলাদের বলে থাকি, আপনারা বিশেষ করে এই গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করুন। কেননা আপনাদের মাঝেই গীবতের বাজার গরম। মহিলাদের রোযা রাখার শখ যত বেশি, ততই তাদের রোযা অসম্পূর্ণ হয়ে থাকে। এবং তা শুধু এই অভিশপ্ত গীবতের কারণেই। কেননা মহিলারা তো সুদ ঘুষ জুলুম ইত্যাদি গুনাহ থেকে নিরাপদেই থাকে। কিন্তু গীবত থেকে বাঁচতে পারে না। এ জন্য আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলছি, রমাযান মাসে নিজের জবানের হেফাজত করুন।[২১২]

গীবতের অভ্যাস

মহিলারা অনেক বেশি গীবত করে। নিজেরাও অন্যের গীবত-শেকায়েত করে। অন্যদের থেকেও শোনে। অনেকে তো এই ধান্দাতেই থাকে যে, কোনো মহিলা বাহির থেকে এসেছে কি না। এলেই তাকে জিজ্ঞেস করে, অমুক আমার ব্যাপারে কী কী বলেছে। আগন্তুক যদি কিছু বলে দেয়,

---

[২১২] *আন-নিসওয়ান ফী রমাযান*, ২৪৪।

তাহলে সাথে সাথে হাঙ্গামা শুরু হয়ে যায়। ভালো করে মনে রাখুন। গীবতের কারণে অশান্তি সৃষ্টি হয়। পরস্পরে শত্রুতা ও বিদ্বেষ তৈরি হয়। তা ছাড়া গীবত করা এবং শোনা উভয়টাই গুনাহের কাজ। কুরআনে কারীমে এর অনেক নিন্দা করা হয়েছে।[২১৩] হাদীস শরীফে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, গীবত জিনা থেকেও মারাত্মক।[২১৪]

হাজী সাহেব রহ. এর কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, জিনার গুনাহ মানুষের কামনার সাথে সম্পৃক্ত আর গীবতের গুনাহ অহংকারের সাথে সম্পৃক্ত। আর অহংকার কামনার চেয়েও ভয়াবহ।[২১৫]

গীবতের বিধিবিধান

১। কারও অনুপস্থিতিতে তার এমন মন্দ বিষয় নিয়ে আলোচনা করা, যা তার উপস্থিতিতে করলে সে কষ্ট পেত—এটাই গীবত। কথা যদি সত্য হয় তাহলে তাকে গীবত বলে, কিন্তু যদি মিথ্যা হয়, তাহলে তাকে বলে বুহতান বা অপবাদ। অনুপস্থিতির শর্ত থেকে এ কথা বোঝা সঠিক নয় যে, কারও সামনে তার মন্দ আলোচনা করা জায়েজ। কেননা এটা কটাক্ষ ও নিন্দার অন্তর্ভুক্ত। আর তাও নিষিদ্ধ।

২। গীবত একটি কবিরা গুনাহ, এটা সুনিশ্চিত। তবে যে গীবতে কষ্টের পরিমাণ কম তা সগীরায় রূপান্তর হতে পারে। যেমন : কারও ঘর ও বাহনের মন্দ চর্চা করা।

৩। যে শ্রোতা গীবত প্রতিহত করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও প্রতিহত না করে, তার শ্রবণও গীবতের অন্তর্ভুক্ত।

৪। গীবতের মধ্যে আল্লাহ ও বান্দা উভয়ের হক নষ্ট হয়। তাই এ ক্ষেত্রে তাওবাও আবশ্যক হয় এবং মাফ করিয়ে নেওয়াও অপরিহার্য হয়ে যায়। তবে কতক আলেম বলেছেন, যার গীবত করা হয় যতক্ষণ পর্যন্ত সে এ

---

[২১৩] *হুকুকুল যাওজাইন*, ৩৪৩।
[২১৪] *বায়হাকী*, হাদীস নং ৫/২২৯৭।
[২১৫] *হুসনুল আযীয*, ২/৩৪৭।

ব্যাপারে অবগত না হয়, ততক্ষণ তা বান্দার হক নষ্টের পর্যায়ে পৌঁছে না। কিন্তু যার সামনে গীবত করেছে, তার সামনে নিজের ভুলের কথা স্বীকার করা আবশ্যক থেকে যায়। আর যদি তাও সম্ভব না হয়, তাহলে তো এটা অপারগতার পর্যায়ে পৌঁছে যাবে।

৫। যার গীবত করা হয়েছে তার মৃত্যুর পর তার ওয়ারিশদের থেকে মাফ চেয়ে নেওয়া যথেষ্ট নয়। বরং মৃতের জন্য এবং নিজের জন্যও আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে।

৬। ছোট বাচ্চা, পাগল এবং মুসলিম দেশের কাফেরদেরও গীবত হারাম। কেননা এদেরকে কষ্ট দেওয়া হারাম। তবে অমুসলিম দেশের কাফেরের গীবত অযথা সময় নষ্ট হওয়ার কারণে মাকরুহ।
৭। গীবত কখনো কর্মের মাধ্যমেও হয়ে থাকে। যেমন : কোনো লেঙরার নকল করে তার মতো করে চলা, যাতে তার তাচ্ছিল্য হয়।

৮। যার কাছে গীবতের জন্য মাফ চাওয়া হবে, তার উচিত ক্ষমা করে দেওয়া। এটা মুস্তাহাব।

৯। কোনো অপারগতা ব্যতীত গীবত শোনাও গীবত করার মতো কদর্য।

১০। শরীয়ত অনুমোদিত কোনো প্রয়োজন কিংবা স্বার্থে যদি কারও মন্দ কথা বলতে হয়, তাহলে তা হারাম গীবতের আওতাভুক্ত হবে না। যেমন : এমন ব্যক্তির কাছে অত্যাচারীর ব্যাপারে অভিযোগ করা যে অত্যাচার প্রতিহত করতে সক্ষম। মুসলমানদেরকে পার্থিব ও পরকালীন ক্ষতি থেকে বাঁচানোর জন্য কারও খারাপ অবস্থা জানিয়ে দেওয়া। কারও পরামর্শ নেওয়ার সময় তার খারাপ অবস্থা প্রকাশ করা ইত্যাদি।[২১৬]

গীবত থেকে নিষ্কৃতির উপায়

যদি কারও গীবত করা হয় তাহলে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়ার পাশাপাশি ওই ব্যক্তি থেকেও মাফ চাওয়া জরুরি। তবে গীবতের পূর্ণাঙ্গ

---

[২১৬] *বয়ানুল কুরআন*, সূরা হুজুরাত।

বিশ্লেষণ করলে, তথা আমি তোমার এই এই গীবত করেছি তা বললে সে আরও অধিক কষ্ট পাবে, তাই সংক্ষেপে তার কাছে এভাবে বলবে যে, যা কিছু বলেছি ক্ষমা করে দাও। যুগপৎ যাদের সামনে গীবত করা হয়েছে, তাদের সামনে তার প্রশংসা করা এবং পূর্বের কথা ভুল হওয়ার স্বীকার করাও অপরিহার্য। আর যদি ওই কথা ভুল না হয়, বরং সত্য হয়, বাস্তবেই তার মধ্যে এই দোষ বিদ্যমান থাকে, তাহলে এভাবে বলবে যে, আমার কথার ওপর ভরসা করে তুমি তার প্রতি মন্দ ধারণা করো না, কেননা আমার নিজেরই নিজের ওপর ভরসা নেই। যদি সে মারা যায়, তাহলে মাফ করানোর পদ্ধতি হলো, তার জন্য বারবার ক্ষমার দুআ করতে থাকা, যতক্ষণ না মন থেকে সাক্ষ্য আসে যে, এখন সে তোমার ওপর সন্তুষ্ট হয়ে গেছে।[২১৭]

যার গীবত করা হয়েছে সে যদি মারা যায় কিংবা নিখোঁজ হয়ে যায়, তাহলে তার থেকে মাফ করানোর উপায় হলো, তার জন্য দুআ করা, নামায ও কুরআন পড়ে তার জন্য ঈসালে সওয়াব করা এবং সারা জীবন তার জন্য দুআ করতে থাকা। তাহলে আল্লাহ তাআলা তাকে আপনার প্রতি সন্তুষ্ট করে দেবেন। কাজী সানাউল্লাহ পানিপতি রাহিমাহুল্লাহ লিখেছেন, কেয়ামতের দিন অনেক মুসলমানকে বিশাল বিশাল মনোরম অট্টালিকা দেখানো হবে এবং আল্লাহ তাআলা বলবেন, এই অট্টালিকাগুলো কে কিনবে? আল্লাহ বলবেন, এগুলোর মূল্য হলো এই যে, যার ওপর কারও কোনো হক রয়েছে সে তা মাফ করে দেবে। তখন অধিকারী লোকজন বিপুলভাবে নিজের হকগুলো ক্ষমা করে দেবেন।[২১৮]

হক্কুল ইবাদ তথা বান্দার হকের গুরুত্ব

হাদীস শরীফে আছে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা বান্দাকে দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞেস করবেন, যৌবন কোথায় ব্যয় করেছ? সম্পদ কোত্থেকে উপার্জন করেছ এবং কোথায় খরচ করেছ?[২১৯] অন্য এক হাদীসে আছে,

---

[২১৭] *আনফাসে ঈসা*, ১/১৭৮।
[২১৮] *খাইরুল ইরশাদ*, ৩৩০৮।
[২১৯] *আত তাবলীগ*, ১৫/১৩৭।

ওই দিন আসার পূর্বেই মানুষের পাওনাগুলো দুনিয়াতেই মাফ করিয়ে নাও, যেদিন কোনো টাকা-পয়সা থাকবে না।[২২০]

জুলুম কোনো সাধারণ বিষয় নয়। জুলুম থেকে মুক্ত না হলে সমস্ত ইবাদতও অসম্পূর্ণ থাকবে। দুররে মুখতার নামক কিতাবে লেখা হয়েছে, তিন পয়সা পরিমাণ বস্তুর বিপরীতে হকদারকে সাতশ মাকবুল নামাযের সওয়াব দিয়ে দিতে হবে।

কত ভয়াবহ অবস্থা হবে! আমাদের নামাযগুলোই-বা কতটুকু কবুল হচ্ছে। সেগুলোও চলে যাবে মাত্র তিন পয়সার অধিকারের জন্য। ভেবে দেখুন, কেয়ামতের দিন কতটা বীভৎস অবস্থা হবে। হাদীসে আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে গরিব কে? তারা বলল, আমাদের মধ্যে গরিব সে, যার কাছে টাকা-পয়সা নেই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তার চেয়েও বড় গরিব সে, যে অনেক বেশি নামায পড়ে, রোযা রাখে, যাকাত দেয় ও সদকাও করে। কিন্তু তার পাশাপাশি সে কাউকে গালি দেয়, কাউকে আঘাত করে, কারও সম্পদ লুণ্ঠন করে। যার ফলে কেয়ামতের দিন একজন এসে তার নামাযগুলো নিয়ে যাবে, আরেকজন এসে তার রোযা নিয়ে যাবে। তৃতীয়জন এসে তার হজ নিয়ে যাবে। চতুর্থজন এসে তার যাকাত সদকাও নিয়ে যাবে। এরপরও কিছু হকদার বাকি থাকবে, কিন্তু তাদেরকে দেওয়ার মতো কোনো সওয়াব অবশিষ্ট থাকবে না। তখন তাদের গুনাহ তার কাঁধে চাপিয়ে দেওয়া হবে এবং সে সওয়াবশূন্য হয়ে গুনাহের বোঝা মাথায় নিয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। এই ব্যক্তিই সবচেয়ে বড় গরিব।[২২১]

এটা কি সাধারণ বিষয় যে, ছোট ছোট বান্দার হকের বিপরীতে সমস্ত ইবাদত ও মেহনতের ফল অন্যরা নিয়ে যাবে। এখান থেকে নিশ্চয় আপনি বুঝতে পারছেন, ক্ষেত্রবিশেষ হক্কুল ইবাদ নামায-রোজা থেকেও

---

[২২০] *সহীহ ইবনে হিব্বান*, হাদীস নং ৭৩৬১।
[২২১] *সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং ২৫৮১।

গুরুত্বপূর্ণ। তাই এদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। কিন্তু আফসোস, মানুষজনের এদিকে কোনো ভ্রুক্ষেপই নেই।[২২২]

বান্দার হক থেকে নিষ্কৃতির পদ্ধতি

যাদের হক নষ্ট করা হয়েছে তাদের থেকে খালাস পাওয়ার উপায় হলো, আল্লাহ তাআলার বিধান অনুযায়ী জীবনযাপন শুরু করে দিন এবং দৃঢ় সংকল্প করে নিন যে, সকলের হক তাদের কাছে পৌঁছে দেবেন। প্রথমে তার কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। যদি সে সন্তুষ্টচিত্তে ক্ষমা করে দেয়, তাহলে তো মামলা সহজ হয়ে গেল। আর যদি সে মাফ না করে, তাহলে পুরো হক আদায় করতে হবে। যদি একবারে আদায় সম্ভব না হয়, তাহলে আস্তে আস্তে আদায় করতে হবে। অল্প অল্প সামর্থ্য অনুযায়ী আদায় করতে থাকুন।

যদি হকদার মারা গিয়ে থাকে, তাহলে তার ওয়ারিশদের হাতে পৌঁছে দিন। যদি তার ওয়ারিশ সম্পর্কেও কিছু জানা না থাকে, তাহলে তার নামে দান-সদকা করতে থাকুন। তাহলে আশা করা যায়, দুনিয়াতেই সমস্ত হক আদায় হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। আর যদি কিছু বাকিও থাকে, তাহলে আল্লাহ তাআলা তা আদায় করে দেবেন। কেননা আল্লাহ তাআলার দরবারে নিয়ত অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যে পাকাপোক্ত নিয়ত করবে যে, আমি হক আদায় করব এবং সে অনুযায়ী চেষ্টাও শুরু করে দেবে, আল্লাহ তাআলা তাকে সেই হক থেকে খালাস হওয়া সহজ করে দেবেন।[২২৩]

---

[২২২] *খাইরুল ইরশাদ*, ৪/৩০৬।
[২২৩] *খাইরুল ইরশাদ*, ৩০৯।

বারোতম অধ্যায়

স্বামীদের ব্যাপারে স্ত্রীদের অবহেলা

স্বামীকে নামাযী বানানোর চেষ্টা না করা

ধর্মীয় দায়িত্বের ক্ষেত্রে নারীদের একটি ত্রুটি হলো, তারা নিজ স্বামীদের জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করে না। স্বামী আমার জন্য হালাল-হারামে জড়িয়ে যাচ্ছে, উপার্জনে সুদ ঘুষ ইত্যাদি থেকে বেঁচে থাকছে না, তাই তাকে বোঝাতে হবে যে, হারাম উপার্জন করবেন না, আমরা হালাল দিয়েই জীবন চালিয়ে নেব—এমন গরজ তাদের মধ্যে পাওয়া যায় না।

তদ্রূপ স্বামী যদি নামায না পড়ে তাহলে তাকে একেবারেই নামাযের কথা বলে না। অথচ নিজের সব প্রয়োজনীয় কাজ তাকে দিয়ে করিয়ে নিতে পারে। স্ত্রীর পক্ষে স্বামীকে দ্বীনদার বানানো কোনো কঠিন কাজ নয়। কিন্তু এর জন্য প্রথমে নিজের দ্বীনদার হওয়া অতীব জরুরি। প্রথমে নিজে নামায ও রোযা আদায় করা শুরু করুন। তারপর স্বামীকে উপদেশ দিন। তখন ইনশাআল্লাহ তা প্রভাব ফেলবে।

কিন্তু কিছু মহিলা আবার দ্বীনদারি গ্রহণ করলে শুধু জায়নামায আর তাসবীহ নিয়েই বসে থাকে। ঘরের কাজ ও স্বামীর খেদমতকে বেমালুম ভুলে যায়। এই পদ্ধতি ঠিক নয়। কেননা ঘরের দেখভাল করা এবং স্বামীর সম্পদ হেফাজত করা এবং তার খেদমত করা স্ত্রীর ওপর ফরয। এখন যদি ফরজের মধ্যে ত্রুটি দেখা দেয়, তাহলে নফল নামায আর তাসবীহ কোন কাজে আসবে! এ জন্য দ্বীনদারির ক্ষেত্রে এতটা বাড়াবাড়িও করবেন না যে, ঘরের কথা একেবারেই ভুলে যাবেন। বরং নামায-রোযার পড়বেন। পাশাপাশি ঘর ও স্বামীর হকও পূরণ করবেন।[২২৪]

---

[২২৪] *হুকুকুল বাইত*, ৫৩।

স্ত্রী চাইলে স্বামী পাক্কা দ্বীনদার হয়ে যেত

স্ত্রীরা হিম্মত করলে অনেক খারাবি এমনিতেই দূর হয়ে যাবে। পরিপূর্ণ দূর না হলেও অনেক কমে যাবে অবশ্যই। কেননা অধিকাংশ সময় স্বামী সুদ ঘুষ ইত্যাদি গুনাহে লিপ্ত হয় স্ত্রীর কারণেই। যদি স্ত্রীরা একটু ত্যাগ স্বীকার করে অলংকার আর পোশাকের আবদার কমিয়ে দেয় এবং স্বামীদের বলে যে, আমার জন্য হারাম কামাইয়ে হাত দেবেন না, তাহলে অনেক কিছুই সংস্কার হয়ে যাবে।

আমি সত্য বলছি, অনেক স্ত্রী স্বামী থেকেও শক্তিশালী হয়। এ জন্য যে স্ত্রীরা বলে যে, আমরা তো অপারগ, স্বামী যা আনে তাই খেতে হয়—এটা তাদের বাহানা মাত্র। তারা যদি অলংকার ও কাপড়ের অযথা ফরমায়েশ না করে, তাহলে অনেক স্বামী নিজে থেকেই সুদ ঘুষ ছেড়ে তাওবা করে নেবে। এরপরও যদি স্বামী সুদ ঘুষ নেয়, তাহলে স্ত্রী সাহস করে তাকে বলবে যে, আমার কাছে ঘুষের টাকা আনবেন না। শুধু হালাল কামাইয়ের টাকা আনবেন। অন্যথায় আখেরাতে আমি আপনার আঁচল টেনে বিপদে ফেলে দেবো। তখন দেখবেন স্বামীরা কত দ্রুত সংশোধন হয়ে যায়।[২২৫]

আল্লাহর কিছু বান্দির অবস্থা

১। মাওলানা গাঙ্গুহী রাহিমাহুল্লাহর মেয়ের যখন বিয়ে হয়, তখন তার স্বামী মৌলভী ইবরাহীম সাহেবের কামাই-উপার্জনের ব্যাপারে তেমন একটা সতর্কতা ছিল না। স্ত্রী প্রথম দিনই স্বামীকে এ কথা স্পষ্ট করে বলে দিলেন যে, যতদিন আপনি কামাই-উপার্জনে সতর্কতা অবলম্বন না করবেন, ততদিন আমি আপনার বাড়িতে খানা খাব না।

আল্লাহর এই বান্দি স্বামীর বাড়িতে গিয়েই তাকে তাওবা করিয়েছেন এবং এই শপথ করিয়েছেন যে, সামনে থেকে কখনো ঘুষ খাবে না। তিনি

---

[২২৫] *আসবাবুল গাফলাহ*, ৩৯৫।

অনেক পরহেজগার ছিলেন। প্রথম দিনই স্বামীকে ঘুষ থেকে তাওবা করানো তো তার পরহেজগারিরই ঝলক। অথচ এখন তো মহিলাদের টাকা-পয়সার লোভ থাকে। বিশেষত যাকে বাবার পক্ষ থেকে রাজকীয় অলংকার-কাপড় দেওয়া হয়নি তাদের আরও বেশি থাকে। কিন্তু আল্লাহর এই বান্দির দুনিয়ার প্রতি একেবারেই লোভ তৈরি হয়নি। বরং তিনি দ্বীনদারিকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

২। কান্ধলায় একজন স্ত্রী ছিলেন। তার স্বামী ছিল তহশিলদার। তার ব্যাপারে ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ ছিল। স্ত্রী তার স্বামীর উপার্জনে হাত লাগাননি। না অলংকার বানিয়েছেন, না কাপড়। এবং সবচেয়ে বিস্ময়কর যা করেছেন তা হলো, চাকরির স্থানে থাকার সময় বাজার-সদাই, লবণ ইত্যাদি সবকিছুই বাবার বাড়ি থেকে এনেছেন। আর তার আত্মমর্যাদাও ছিল এত প্রখর যে, স্বামীকে কোনোভাবেই তা টের পেতে দেননি, যেন সে কষ্ট না পায়।

৩। কান্ধলায় আরেকজন স্ত্রী ছিলেন, যার স্বামীর কাছে কিছু বন্ধকি জমি ছিল। সে তার আমদানি থেকে নিজের খরচ চালাত। কিন্তু স্ত্রী বন্ধকির আমদানি থেকে এক দানাও মুখে ওঠাননি।

৪। আমি আমার বংশের মুরব্বিদের থেকে শুনেছি, আমার মারহুমা মা তার সমস্ত অলংকার খুলে আমার বাবার সামনে নিক্ষেপ করেছিলেন এবং বলেছিলেন, হয়তো এগুলোর যাকাত দিন অন্যথায় নিজের কাছে রাখুন, আমি এগুলো পরব না। অবশেষে আব্বা বাধ্য হয়ে সেগুলোর যাকাত আদায় করেছেন। তারপর মা সেগুলো পরিধান করেছেন।

স্ত্রীরা সাহস করে এ রকম উদ্যোগ নিলেই হয়। স্বামীরা আপনাআপনি ঠিক হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। কেননা স্বামীর দ্বারা যেমন স্ত্রীর পরিশোধন হয়, তেমনই স্ত্রীর মাধ্যমেও স্বামীর পরিশুদ্ধি হয়। পুণ্যবান স্ত্রী তো সে, যে স্বামীকে দ্বীনের ব্যাপারে সতর্ক বানিয়ে দেয়। এমন নয় যে, আগের থেকে আরও বেশি অবচেতন বানিয়ে দেয়।[২২৬]

---

[২২৬] *আসবাবুল গাফলাহ*, ৩৯৫।

স্বামীর সম্মান ও সেবায় ত্রুটি

অনেক নারী স্বামীর যথাযথ সম্মান করে না। এটা অত্যন্ত লজ্জাজনক কথা। অনেকে স্বামীর সেবায় ত্রুটি করে। অনেকে আবার স্বামীর সেবাকে চাকরানির ওপর ছেড়ে দেয়, নিজে তার সেবার প্রতি মনোযোগ দেয় না। আর কিছু স্ত্রী স্বামীর কাছে অতিরিক্ত খরচের দাবি করে।

অনেক স্ত্রী স্বামীর সাথে এমন ব্যবহার করে যেন সে তার সমপর্যায়ের কেউ। এটা তো একটা পর্যায়ে আছে, অনেক স্থানে তো স্ত্রীরাই স্বামীদের ওপর হুকুমত চালায়; অথচ শরীয়তে স্বামীর সম্মানের প্রতি বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। হাদীসে স্পষ্ট এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমি যদি আল্লাহ তাআলা ব্যতীত কাউকে সাজদা করার অনুমতি দিতাম, তাহলে স্ত্রীদের আদেশ দিতাম, তারা যেন নিজ নিজ স্বামীকে সাজদা করে।[২২৭] কিন্তু সাজদা তো কেবল আল্লাহকেই করা জায়েজ। এই হাদীস থেকে স্বামীর প্রতি কোন পর্যায়ের সম্মান প্রদর্শন করতে হবে তা বোঝে আসে।

অনেক স্ত্রী স্বামীকে তাচ্ছিল্যও করে। স্বামীও অনেক সময় জালেম হয়, স্ত্রীকে তুচ্ছ করে রাখে। ক্ষেত্রবিশেষ দুজনই জালেম হয়। কেয়ামতের দিন উভয়ের থেকেই এর হিসাব নেওয়া হবে এবং যে যার হক নষ্ট করেছে, তার থেকে প্রতিশোধ নেওয়া হবে। অতএব স্বামীদের উচিত নিজ স্ত্রীর অধিকারগুলোর প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখা। আর স্ত্রীদের উচিত স্বামীকে সম্মান করা এবং তার আনুগত্য ও অধিকারের প্রতি মনোযোগী হওয়া।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীগণ কখনো তাঁর আদেশের বিপরীত করতেন না। তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এই পরিমাণ সম্মান করতেন যে, তাদের অন্তরে রাসূলের চেয়ে সম্মানীয় অন্য কেউ ছিল না।[২২৮]

---

[২২৭] *মাজমাউয যাওয়ায়েদ*, ৪/৩১৩।
[২২৮] *হুকুকুল বাইত*, ২৩।

স্বামীকে তুচ্ছ মনে করবেন না

যদি স্বামী বেনামাযীও হয় তবুও তাকে তুচ্ছ মনে করবেন না। মহিলাদের মধ্যে একটি রোগ এমনও আছে যে, তারা নিজেরা যদি নামায-রোজা পালন করে আর স্বামী এমন মিলে যায় যে স্বাধীন, তাহলে তারা তাকে অনেক তুচ্ছ মনে করে। আর যদি স্বামী ইংরেজি শিক্ষিত হয় তাহলে তো তারা তাকে কাফের আর নিজেদেরকে রাবেয়া বসরী মনে করতে থাকে। আমি মানছি যে, স্বামী নামায-রোজা পালন না করার কারণে গুনাহগার, কিন্তু এ ব্যাপারে আলেমদের কাছে কমপক্ষে জিজ্ঞেস করে দেখুন, তারা কী বলে!

মনে রাখবেন, ব্যক্তি হিসেবে স্বামী যেমনই হোক, আপনার ওপর তার আনুগত্য আবশ্যক। কেননা সে আপনার শাসক ও পরিচালক। আর শাসক যদিও ফাসেক হয় তবুও তার আনুগত্য অত্যাবশ্যকীয় হয়। যদি ইয়াজিদের মতোও কোনো শাসক আসে এবং শরীয়তের নিয়ম অনুযায়ী তার শাসনক্ষমতা কার্যকর হয়, তাহলে তার আনুগত্যও আবশ্যক হয়ে যাবে।

অতএব আপনার স্বামী ইয়াজিদের চেয়ে বেশি তো খারাপ না। তাহলে যদি ইয়াজিদের আনুগত্য আবশ্যক হয়, আপনার স্বামীর আনুগত্য আবশ্যক হবে না কেন! কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা স্বামীর আনুগত্য আবশ্যক হওয়া প্রমাণিত। তা ছাড়া সে যে আপনার স্বামী, এ ব্যাপারেও কোনো সন্দেহ নেই। বিয়ের সাক্ষী আছে, কাগজপত্র আছে। তাহলে কোন কারণে আপনি তার আনুগত্য করবেন না!

মোটকথা, স্ত্রীর ওপর স্বামীর আনুগত্য ওয়াজিব। সে ইয়াজিদ হলেও আপনার জন্য তো সে বায়জিদ! তাই আপনি তার অবাধ্যতা করতে পারবেন না। তবে সে যদি নামায-রোজা পালন করতে নিষেধ করে, তাহলে এ ক্ষেত্রে তার আনুগত্য করা যাবে না। নামায-রোজা দ্বারা উদ্দেশ্য ফরয নামায-রোজা। নফল নামায-রোযার ক্ষেত্রেও তার আদেশই অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত। এমনকি ফরয আমলের ব্যাপারেও যদি সে বলে একটু

পরে পড়ো, আর সময়ও থাকে, তাহলে ফরয নামাযও বিলম্বে পড়া উচিত। হাঁ, যদি মাকরুহ সময় চলে আসে, তাহলে তার কথা মানবেন না। স্বামী যদি প্রকাশ্য স্পষ্ট কোনো কুফর শিরকে জড়িয়ে যায়, তাহলে গ্রহণযোগ্য কোনো আলেম থেকে ফতোয়া নিয়ে তার থেকে পৃথক হয়ে যাবেন। সে যদি নিজে পাপাচারী হয়, কিন্তু আপনাকে পাপের নির্দেশ না করে, তাহলে তার কথা মেনে চলবেন। এমনকি স্বামী যদি বলে নফল তাসবীহ ছেড়ে আমার খেদমত করো, তাহলে নফল তাসবীহ ছেড়ে দেবেন। কিন্তু অনেক স্ত্রী মনে করে, এতে তার বুযুর্গি কমে যাবে।

হে স্ত্রীগণ! আপনারা তো বুযুর্গও হতে পারছেন না। শরীয়তের অনুসরণের নাম হলো বুযুর্গি। নিজের মনের অনুসরণকে বুযুর্গি বলে না। তাই শরীয়ত যখন আপনাকে স্বামীর আনুগত্যের নির্দেশ দিয়েছে, তখন আপনার জন্য বুযুর্গি হলো এই যে, আপনি তার আনুগত্য করবেন।[২২৯]

স্বামীর সাথে কথা কাটাকাটি ও বেয়াদবি

অনেক স্ত্রী স্বামীর সাথে কথা কাটাকাটি করে। তার সামনে চুপ থাকতেই পারে না। এমনকি অনেক সময় স্বামী প্রহার করা শুরু করলেও তাদের মুখ বন্ধ হয় না। ক্ষেত্রবিশেষ স্ত্রী স্বামীকে অপমান করে। চেষ্টা করে যে, পারস্পরিক কথাবার্তায় আমিই যেন বিজয়ী থাকি। স্বামী যে কথা বলে তার উত্তর তাদের কাছে তৈরি থাকে। কোনো কথাই উত্তরহীন ছেড়ে দেয় না, চাই তা ভালো হোক বা অপছন্দের, যৌক্তিক হোক বা অযৌক্তিক।

মোটকথা, স্ত্রীদের মাঝে প্রগলভতার রোগ অনেক প্রকট। এটা অহংকার থেকে উদ্ভূত। তারা চায় যে, আমরা হারব না, যেন অপমান না হতে হয়। এ জন্য স্বামীকে ঝগড়ায় হারিয়ে সখীদের সাথে গিয়ে গর্ব করে বলে, দেখছ, কীভাবে স্বামীকে চুপ করিয়ে দিয়েছি।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমি যদি আল্লাহ ব্যতীত কাউকে সাজদা করার অনুমতি দিতাম, তাহলে স্ত্রীদের নির্দেশ

---

[২২৯] *ওয়া'জুল খুজু*, ৩১৬।

করতাম, তারা যেন নিজ নিজ স্বামীকে সাজদা করে।[২৩০] স্বামীর সম্মান কত উচ্চ পর্যায়ের যে, যদি আল্লাহর পর কাউকে সাজদা করা জায়েজ হতো, তাহলে স্বামীকে সাজদা করতে হতো। কিন্তু এখন স্ত্রীরা স্বামীর এতটুকু সম্মান করে যে, তাদের সাথে উচ্চ ভাষায় ঝগড়া এবং মুখোমুখি পর্যায়ে চলে যায়।

হে স্ত্রীগণ! আল্লাহ তাআলা আপনাদের যেমন বানিয়েছেন, তেমনই নিজেদেরকে স্বামী থেকে ছোট মনে করুন। তার গোসার সময় বেশি কথা বলবেন না, বরং এই সময় চুপ থাকুন। যখন গোসা ঠান্ডা হয়ে যাবে, তখন বলবেন যে, আমি তো ওই সময় কিছুই বলিনি, এখন বলছি, আপনার ওই কথা যথার্থ ছিল না। এভাবে বললে ঝগড়াও আগে বাড়বে না এবং স্বামীর মনেও আপনার একটি অবস্থান তৈরি হবে।[২৩১]

স্বামীর সাথে চাটুকারিতা ও তামাশা করা

নারীদের একটি বিষয় বড় আশ্চর্যজনক। তারা হজের নিয়ত করে নিজেদেরকে স্বামীর চেয়ে বড় মনে করতে থাকে। আজকাল সাধারণভাবেও নারীদের মধ্যে বড়াই করার উপাদান বেশি দেখা যায়। অনেক সময় তো তারা স্বামীদের দিয়ে চাটুকারিতা করায়। তাদের এতটুকু লজ্জা ও আত্মসম্মানে লাগে না যে, স্বামী দিনরাত কষ্ট করে তার জন্য কামাই করে নিয়ে আসে, তাদের কষ্ট ও পরিশ্রমের ফল কি এই যে, স্ত্রীরা তাদের মাথায় চরে থাকবে?

আমি জোর দিয়ে বলি যে, স্ত্রীরা যদি একটু ধৈর্য ও সহনশীলতা অবলম্বন করে, তাহলে তারা স্বামীদের চেয়েও বেশি সওয়াব লাভ করবে। কেননা তারা স্বামী অপেক্ষা দুর্বল ও কমজোর। দুর্বলের অল্প আমলও ক্ষেত্রবিশেষে শক্তিশালীর অনেক আমলের চেয়ে অগ্রগামী হয়ে যায়। কিন্তু মহিলাদের মাঝে যে পরিমাণ দুর্বলতা আছে, তারা ওই পরিমাণই পুরুষের ওপর শক্তিশালী হয়ে যায়। এটা পুরুষদের ধৈর্যের ফল যে, তারা স্ত্রীদের মাথায় উঠিয়ে নেয়। অন্যথায় প্রকৃতপক্ষে তাদের অবস্থান কোথায়!

---

[২৩০] *মাজমাউয যাওয়ায়েদ*, ৪/৩১৩।
[২৩১] *হুকুকুল বাইত*, ৫১।

স্বামী যদি একবার রেগে যায় তাহলে একদিনের মধ্যেই স্ত্রীকে ঠিক করে ফেলতে পারে। শক্ত মেজাজের স্বামীরা এমন করেও থাকে। বুযুর্গরা বলেন, শিক্ষিত পুরুষের ওপর নারী কর্তৃত্ব চালাতে পারে, কিন্তু অশিক্ষিত পুরুষ নারীর ওপর কর্তৃত্ব চালায়। এর কারণ এই যে, বুদ্ধিমান শিক্ষিত মানুষ ধৈর্য ও সহনশীলতা অবলম্বন করে আর মূর্খ অশিক্ষিত মানুষ তা করে না। যাই হোক, স্ত্রীদের অহংকার করা বড়ই বেমানান বিষয়।[২৩২]

স্বামীকে অসন্তুষ্ট করা

১। স্বামীকে সন্তুষ্ট করার ব্যাপারে অনেক স্ত্রী অবহেলা করে। স্বামীর অসন্তুষ্টি এমন বিষয় যে, এর কারণে ফেরেশতাগণ অভিশাপ দেয়। স্ত্রীরা স্বামীদের সামনে বকবক করতে অভ্যস্ত। স্বামীকে এভাবে কষ্ট দেওয়া কি ঠিক? অতএব সব সময় তার মেজাজ মেপে কথা বলুন। এমন কোনো কথা বলবেন না, যা তার অপছন্দের।

২। বিশেষত স্বামী যখন বাহির থেকে আসবে তখন অবশ্যই তার মেজাজটা দেখে নিন। সে কোনো কারণে রেগে আছে কি না, কারও সাথে ঝগড়া করে এসেছে কি না। কিন্তু স্ত্রীদের এ ক্ষেত্রে একটুও ধৈর্য থাকে না। স্বামী ঘরে আসার সাথে সাথেই তার সাথে চিল্লাচিল্লি শুরু করে দেয়।

৩। যদি কখনো স্বামীর সাথে বেয়াদবি হয়ে যায় তাহলে তাওবা করে নিন এবং তার কাছে মাফ চেয়ে নিন। যদি স্বামীকে সমপর্যায়ের বন্ধু মনে করেন এবং তার সাথে তেমন ব্যবহার করেন, তাহলে সে আপনার বন্ধু হওয়ার পাশাপাশি আপনার রাজাও বটে। বন্ধু তো সে এ জন্য যে, যেন ভালোবাসার মাধ্যমে তার হকগুলো আদায় করা যায়। ভালোবাসা ছাড়া হক আদায় হয় না। আর রাজা এ জন্য যে, তার আদেশ মানা আপনার জন্য অপরিহার্য। তাই তার সাথে বেয়াদবি করবেন না।

---

[২৩২] *আদ দিহায়া*, ১৭/১৩৭।

স্বামীর ভুল ও অযথা রাগের সময় স্ত্রীর করণীয়

এক মহিলা হাকীমুল উম্মত থানভী রাহিমাহুল্লাহকে পত্রমারফত জিজ্ঞেস করলেন যে, আমার স্বামী কোনো কারণে আমার ওপর রেগে গেলে আমি বুঝিয়ে-সুঝিয়ে মিনতি করে মানিয়ে নিই। তখন মনে শান্তি লাগে। কিন্তু অনেক সময় দোষটা যখন তার হয়, তাহলে মাফ চাইতে মন সায় দেয় না। এমন সময় কী করব?

থানভী রাহিমাহুল্লাহ উত্তরে লিখলেন, ভুল বুঝে আসুক আর না আসুক সর্বাবস্থায় নিজের ভুল স্বীকার করে মাফ চেয়ে নেবেন এবং স্বামীকে জিজ্ঞেস করবেন যে, ভুল হয়েছে কি না। যদি সে কোনো ভুলের কথা বলে, তাহলে অপারগতা প্রকাশ করবেন। স্বামীর গোসার সময় যেভাবে পারা যায় তাকে মানিয়ে নেবেন। দোষ চাই আপনার হোক বা স্বামীর, হাত জোড় করে ক্ষমা চাওয়াকে নিজের জন্য গর্ব ও সম্মানের বিষয় মনে করবেন। স্বামীর যথার্থ গোসা এবং অন্যায্য গোসা উভয় অবস্থাতেই নিজের জবানকে চলতে দেবেন না। এ সময় চুপ থাকবেন। যখন তার গোসা ঠান্ডা হয়ে যাবে, তখন তাকে বলবেন, ওই সময় তো আমি বলিনি, এখন বলছি, আপনার ওই কথা অন্যায্য ছিল। এভাবে বললে ঝগড়া আর সামনে বাড়বে না এবং স্বামীর মনে আপনার সম্মান তৈরি হবে।

রাগের মাথায় স্বামী যদি ভালো-মন্দ কিছু বলে, তাহলে তা সহ্য করে নেবেন। কোনো উত্তর দেবেন না, সে যাই বলুক আপনি চুপটি মেরে বসে থাকবেন। রাগ সেরে গেলে দেখবেন নিজেই লজ্জিত হচ্ছে। এভাবে চলতে পারলে পরবর্তীতে আপনার সাথে আর গোসা করবে না ইনশাআল্লাহ। আর যদি আপনি কথা বলা শুরু করে দেন, তাহলে এই ঘটনা কতদূর পর্যন্ত গড়াবে তার কোনো ইয়ত্তা নেই।[২৩৩]

স্বামী অন্য নারীর চক্করে পড়লে স্ত্রী কী করবে?

এক মহিলা থানভী রাহিমাহুল্লাহর নিকট লিখে পাঠাল যে, আমার স্বামী অমুক পদে আছে। সে আমার ব্যাপারে একদম বেপরোয়া। বিবাহিত

---

[২৩৩] *বেহেশতী জেওর*, ৪১।

স্বামী-স্ত্রীর মাঝে যেমন আচার-ব্যবহার হয়, আমাদের মাঝে তা হয় না। আমার বাসা থেকে বিশ ফিট দূরে একজন মহিলা থাকে। আমার স্বামী তাকে রক্ষিতার মতো রেখেছে। রাতে তার সাথে শোয়। আমি এদিকে একাই শুয়ে থাকি এবং সীমাহীন কষ্টে আছি। সেই মহিলা আমাকে বের করে দিতে চায়। আমার চেহারা-সুরত অনন্য। কিন্তু জানি না, আমার ব্যাপারে আমার রবের ফয়সালা কী!

এখন আমার আবদার হলো, আমার স্বামী যেন এমন হয়ে যায় যে, আমার কথামতো কাজ করবে এবং রক্ষিতা মহিলাকে ছেড়ে দেয়—এমন কোনো তদবির দেন। আপনি তো আল্লাহর খাস বান্দা। যদি অধমের অবস্থার দিকে মনোযোগ না দেন, তাহলে কেয়ামতের দিন আপনার আঁচল টেনে ধরব এবং জবাবদিহির মুখোমুখি করব।

উত্তর : আপনার চিঠি পেয়েছি। মূলত তদবির দুটি। একটি হলো, সেবা, আনুগত্য ও তোষামোদি। আরেকটি হলো দুআ। আমিও দুআ করছি। আসল তদবির এই দুটিই। আপনি যদি অন্য কোনো আমল চেয়ে থাকেন তাহলে আমি বলব, আমি কোনো কবিরাজ নই। বুযুর্গদের থেকে যা শুনেছি তা-ই লিখে দিচ্ছি। প্রতিদিন ইশা নামাযের পর ১১শ বার 'ইয়া লাতিফ' 'ইয়া ওয়াদুদ' পড়বেন। শুরুতে ও শেষে ১১ বার করে দরূদ শরীফ পাঠ করবেন এবং তারপর দুআ করবেন। এখন কয়েকটি উপদেশ লিখে দিচ্ছি—

১। আপনার উচিত ছিল, ঘরের কোনো পুরুষ দিয়ে চিঠি লেখানো। মহিলাদের নিজ হাতের লেখায় চিঠি লেখা মুনাসিব নয়।

২। চিঠিতে নিজের চেহারা-সুরতের ধরন লেখা ভদ্রতার খেলাফ।

৩। যার প্রতি ভক্তি আছে তাকে এমন কথা লেখা যে, কেয়ামতের দিন আপনাকে আটকে দেবো, অনেক অসংলগ্ন ব্যাপার। তা ছাড়া আটকে দেওয়ার ক্ষমতা আপনার হাতে নেই। আর যে কথার জন্য ধমকি দিয়েছেন, তা ঠিক করার ক্ষমতাও আমার হাতে নেই।

৪। উত্তর পাঠানোর জন্য টিকিটও পাঠাননি![২৩৪]

---

[২৩৪] *কামালাতে আশরাফিয়া*, ১৯২।

মন্দ ভাষা ও প্রগলভতা

মহিলাদের মধ্যে বর্ণনাশক্তি ও প্রমাণ উপস্থাপন-দক্ষতা কম হয়ে থাকে। পুরুষের সাথে কথা কাটাকাটি হলে বেচারা পুরুষ তো তাকে সহ্য করে বিতর্কের যথার্থ নিয়মানুসারে কথা বলে, কিন্তু সে উল্টাপাল্টা কথা বলতে থাকে। শুধু মুখ চালিয়ে যাবে, চাই একটি কথাও যথাস্থানের না হোক। নিরীহ পুরুষ তার চাপার জোর দেখে চুপ হয়ে যায়। কিন্তু মহিলা কখনো চুপ হয় না। পরিশেষে বিতর্কে সে পুরুষের ওপর বিজয় লাভ করে। যদি শুধু বলা আর বকবক করার নামই বিতর্ক হতো, তাহলে গাধা হতো সবচেয়ে বড় বিতার্কিক।

আমাদের নারীদের মধ্যে একটি ছোট ত্রুটি আছে। এটা সংশোধন হয়ে গেলে তারা প্রকৃত অর্থেই হুর হয়ে যেত। আর তা হলো, তাদের ভাষা অত্যন্ত খারাপ। তাদের কথা বিচ্ছুর বিষাক্ত ছোবলের ন্যায় প্রভাব সৃষ্টি করে। অল্পতেই পুরুষের মাঝে বেদনা শুরু হয়ে যায়।

জনৈক বুযুর্গ এই রোগের চমৎকার একটি প্রতিকার বলে দিয়েছেন। এক মহিলা তার কাছে এসে অভিযোগ জানাল যে, প্রতিদিন স্বামীর সাথে তার ঝগড়া হয়। এমন কোনো তাবিজ দিন, যাতে আর ঝগড়া না হয়। তিনি বললেন, এক বোতল পানি নিয়ে আসো, আমি পড়ে দেবো। সে এক বোতল পানি নিয়ে এলো। বুযুর্গ এমনি এমনি ঠোঁট নাড়িয়ে তার ওপর ফুঁ দিয়ে বললেন, স্বামী ঘরে এলে এক চুমুক পানি মুখে নিয়ে বসে যাবে, তাহলে আর ঝগড়া হবে না।

ওই মহিলা এমনটাই করল। ফলে বাস্তবেই ঝগড়া খতম হয়ে গেল। পানির ওপর ফুঁ তো মিছেমিছি দেওয়া হয়েছিল, প্রকৃত তদবির ছিল এই যে, যখন মুখে পানি নিয়ে বসে যাবে, তখন জবান আর কেঁচির মতো চলবে না। ঝগড়া তো হতোই এই কর্কশ জবানের জন্য। এই মুখ বন্ধ করার জন্যই ওই বুযুর্গ এমন কৌশলী তদবির অবলম্বন করেছেন। এখনো যদি মহিলারা তাদের মুখ বন্ধ রাখা শিখতে পারে, তাহলে বাস্তবেই কখনো ঝগড়া হবে না।

লোকজন আজকাল এই রোগ থেকে বাঁচার জন্য বিভিন্ন তাবিজ-কবজ চায়, যা পরিপূর্ণ অহেতুক জিনিস। তবে কেউ যদি ওই বুযুর্গের মতো আমল করতে চায়, তাহলে আমিও পানির ওপর মিছেমিছি ফুঁ দিয়ে দিতে পারব। তখন স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ঝগড়া লাগলে স্ত্রী এক ঢোক পানি মুখে নিয়ে বসে থাকবে। ওই বুযুর্গের ফুঁয়ের মধ্যেও প্রভাব ছিল। আমার ফুঁয়ে প্রভাব নাও থাকতে পারে, কিন্তু আমি ওয়াদা করছি যে, ঝগড়া বন্ধ হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা জানেন, এই প্রতিকার একটি অসাধারণ প্রতিকার; বাস্তবিক কৌশল।

মোটকথা হলো এই যে, মহিলাদের বদজবানি ও মন্দ ভাষাই ঝগড়ার মূল কারণ। এই দোষ মহিলাদের থেকে দূর হয়ে গেলে প্রকৃত অর্থেই তারা জান্নাতী হুরে পরিণত হতে পারবে।[২৩৫]

মহিলাদের অনর্থক চাহিদা

আজকাল স্ত্রীদের অবস্থা হলো এমন যে, তারা চায় স্বামী তাদের গোলাম হয়ে থাকুক। রাত-দিন শুধু আমারই উপাসনা করুক। অথচ আল্লাহ তাআলা বলেছেন, আমি মানুষ ও জিন জাতি সৃষ্টি করেছি কেবল আমার উপাসনা করার জন্য।[২৩৬] কিন্তু স্ত্রীদের মনের চাহিদা হলো এমন যে, স্বামীদের সৃষ্টি করা হয়েছে কেবল স্ত্রীদের কথা শোনার জন্য।

মহিলাদের কর্তব্য হলো, স্বামীর আনুগত্য করা এবং তার মনে কষ্ট না দেওয়া। আজকাল স্ত্রীদের এই বিষয়ের প্রতি তেমন কোনো গুরুত্ব নেই। স্বামী সারা দিন বাহিরে থেকে কষ্ট পরিশ্রম করে ঘরে আসে আরাম করার জন্য, আর এখানে একজন পরিশ্রমী বেগম তাকে কষ্ট দেওয়ার জন্য বসে থাকে। স্বামী যদি উপদেশমূলক কোনো কথা বলে, তাহলে বেচারার ওপর একটি ভয়াবহ খোঁচা দেওয়া কথা ঝেড়ে দেয়। আর স্বামী যদি একটু ক্ষেপে যায় তাহলে বলে, আমি কি কারও বান্দি নাকি যে, আমাকে এমন কথা বলবে!

---

[২৩৫] *আত তাবলীগ*, ৭/৮৬।
[২৩৬] সূরা জারিয়াত, ৪৫ : ৫৬।

আল্লাহর শপথ করে বলছি, স্বামীর মনে কষ্ট দেবেন না। তার কাছে বড় ধরনের কোনো আবদার করবেন না। তার কোনো কথার প্রতিউত্তর দেবেন না। তার কথা অমান্য করবেন না। যদি কোনো আবদার করতেই হয়, তাহলে সময়ের দিকে লক্ষ করুন। পুরুষের মন সব সময় একরকম থাকে না। যখন দেখবেন স্বামী খোশমেজাজে আছে, তখন সম্মানের সাথে তার কাছে আবদার পেশ করুন।[২৩৭]

নিজেকে পুরুষের সমান মনে করা এবং রাগ করা

পুরুষ এবং নারীর মাঝে বৈচিত্র্য সৃষ্টিগত। নারীরা কখনো পুরুষদের সমান সমান হতে পারে না। তাদের বুঝশক্তি অল্প, তাদের শরীরও কম শক্তিশালী। এ জন্য তারা দ্রুতই দুর্বল হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা যখন আপনাকে সকল বিষয়ে পুরুষের চেয়ে কম দিয়েছেন, তাহলে আপনি কোন বিষয়ে পুরুষের সমান হতে চান। আজকাল অনেকে নারী-পুরুষ সমানাধিকারের কথা বলে। তারা নারীদেরকে পুরুষের সমান বানাতে চায়। কিন্তু কেউ বাস্তবে করে দেখাক। সৃষ্টিগত পার্থক্যকে কেউ চাইলেই কি মেটাতে পারবে? সৃষ্টিগতভাবেই নারীরা পুরুষের বরাবর হতে পারবে না। তাহলে তারা কোন সমানাধিকারের দাবি করে বুঝে আসে না।

নারীরা পুরুষদের তুলনায় মর্যাদার দিক থেকে কোন স্তরের, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা বলে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, আমি যদি আল্লাহর পর কাউকে সাজদা করার অনুমতি দিতাম, তাহলে স্ত্রীদের বলতাম, তারা যেন নিজ নিজ স্বামীকে সাজদা করে।[২৩৮] এখান থেকে পুরুষের সম্মানের স্তর অনুমান করা যায়, আল্লাহর পর কাউকে সাজদা করতে হলে পুরুষকেই করতে হতো। কিন্তু এখন নারীরা স্বামীদের এমন সম্মান করে যে, তাদের সাথে কর্কশ ভাষায় কথা বলে এবং ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হয়।

---

[২৩৭] *আল খুজু*, ৩১৪।
[২৩৮] *মাজমাউয যাওয়ায়েদ*, ৪/৩১৩।

যদি কোনো স্ত্রী বলে যে, স্বামীর রাগ থেকে আমারও রাগ ওঠে, তাহলে আমি বলব, রাগ তো সর্বদা নিজের চেয়ে ছোট কিংবা সমপর্যায়ের কারও ওপর হয়ে থাকে, মানুষ যাকে বড় মনে করে, তার সামনে রাগ প্রকাশ করে না। চাকর মালিকের ওপর রাগ প্রকাশ করে না। প্রজারা রাজার বিরুদ্ধে রাগ প্রকাশ করে না। সন্তান বাবার ওপর রাগ প্রকাশ করে না। যতই রাগ উঠুক তা সহ্য করে নেয়, কেননা তারা তাদেরকে বড় মনে করে। সুতরাং রাগ ওঠার ব্যাপারে এই আপত্তিও এক ধরনের অপরাধ। অপরাধের ওজর অপরাধ থেকেও ভয়ংকর এটাকেই বলে।

হে নারীরা! স্বামীর রাগের বিপরীতে রাগ ওঠা এ কথার প্রমাণ বহন করে যে, আপনারা নিজেদেরকে স্বামীর চেয়ে বড় কিংবা সমপর্যায়ের মনে করেন। এই চিন্তাটাই তো গোঁড়া থেকে গলদ। যদি আপনারা নিজেদেরকে স্বামীর চেয়ে ছোট মনে করতেন, তাহলে সে যতই রাগ দেখাক, তার সামনে নিজের রাগকে প্রকাশ করতেন না। সুতরাং নিজেদের মন থেকে এই বাজে চিন্তাধারা দূরে ফেলে দিন এবং আল্লাহ তাআলা আপনাদের যেমন বানিয়েছেন, নিজেদের তেমনই মনে করুন। নিজেদেরকে স্বামীর চেয়ে ছোট মনে করুন।

স্বামী ঘরে ফেরার পর স্ত্রীর অবহেলা

স্বামী সফর থেকে ঘরে ফিরলে স্ত্রীর দায়িত্ব হলো প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র তার জন্য তৈরি করা কিংবা তার সামনে পেশ করা এবং খরচের জন্য যে টাকা নিয়ে গিয়েছিল তার হিসাব না নেওয়া। কোনো স্বামী যদি স্ত্রীর কাছে খরচের হিসাব চায় তাহলে তার ব্যাপারে ছড়ানো হয় যে, এই পুরুষ অনেক খারাপ। ছোট ছোট বিষয়েরও হিসাব নেয়। স্ত্রীদের কাছে সবচেয়ে উত্তম স্বামী হলো সে, যে স্ত্রীর মুরিদ হয়। স্ত্রী যা বলে সাথে সাথে তা করে। টাকা-পয়সা দিয়ে তাকে আর জিজ্ঞেস না করে যে, কোথায় কোথায় খরচ করেছ। এসব খারাবির মূল হলো ধন-সম্পদের লোভ, যা মহিলাদের ভেতরে কানায় কানায় ভরপুর।[২৩৯]

---

[২৩৯] *আসবাবুল গাফলা*, ৩৮৪।

স্বামীর সম্পদে হস্তক্ষেপ

স্ত্রীরা অনেক সময় স্বামীর টাকা খরচ করার সময় মনে করে যে, স্বামী তা মেনে নেবে। অনেক সময় স্বামী মেনেও নেয়। কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে রাগ করলে তখন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্য দেখা দেয়। কানপুরে একবার এক স্ত্রী স্বামীর অনুমতি ব্যতীত মাদরাসায় কিছু দান করেছিল, এ জন্য তার স্বামী তার সাথে অনেক কঠোর আচরণ করেছিল।[২৪০]

এ জন্য স্পষ্ট কিংবা শক্তিশালী বিশ্বাস ছাড়া স্ত্রীদের কোথাও দান করা উচিত নয়। আমি দেখেছি, মহিলারা দানের ব্যাপারে অনেক বেশি উদার হয়। কোথাও মাহফিলে দান-সদকার ফযিলত শুনলে সাথে সাথে অলংকার বের করা শুরু করে দেয়। এ ক্ষেত্রে স্মরণ রাখতে হবে, যে অলংকার শুধু আপনার মালিকানার, তা দান করাতে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু যে অলংকার স্বামী শুধু পরিধান করার জন্য দিয়েছে, তা স্বামীর অনুমতি ব্যতীত দান করা জায়েজ নেই। স্বামীর সম্পদ থেকে দান করলে তার অনুমতি লাগবে। কিন্তু স্ত্রীর নিজের সম্পদ হলে তা দান করতে স্বামীর অনুমতির প্রয়োজন নেই। তবে তার সাথে পরামর্শ করে নেওয়া উত্তম। কিন্তু যদি এমন কোনো সাধারণ জিনিস হয় যার ব্যাপারে অনুমতি দেওয়ার প্রবল বিশ্বাস থাকে, তাহলে তা দান করতে কোনো অসুবিধা নেই।[২৪১]

---

[২৪০] *দ্বীন ওয়া দুনিয়া*, ৩৮৭।
[২৪১] *আসবাবুল গাফলা*, ৩৮৭।

তেরোতম অধ্যায়

মহিলাদের বিভিন্ন আত্মিক রোগ

অকৃতজ্ঞতা

অকৃতজ্ঞতার উপাদান মহিলাদের মধ্যে অনেক বেশি। হাদীসের মধ্যেও তাদের এই গুণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার মহিলাদের উদ্দেশ্য করে বলেছেন, তোমরা অনেক বেশি অভিসম্পাত করো এবং স্বামীর প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।[২৪২] অন্য এক হাদীসে আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তুমি যদি সারা জীবন স্ত্রীর প্রতি সদয় আচরণ করো এবং তারপর কোনো বিষয় তার মেজাজের বিপরীত হয়, তাহলে সে স্পষ্ট এ কথা বলে দেবে যে, আমি কখনো তোমার কাছে ভালো কিছু পাইনি।[২৪৩] সারা জীবনের অনুগ্রহ এক মিনিটেই ভুলে যায়।[২৪৪]

মহিলাদের মধ্যে না-শুকরির প্রবণতা অনেক বেশি। আল্লাহ তাআলা যদি তাদেরকে প্রয়োজন পরিমাণ আসবাব দান করেন, তারা তাকে নিজের জন্য কল্যাণকর মনে করে না এবং এর জন্য আল্লাহর শুকরিয়াও আদায় করে না। বরং না-শুকরি করে বলে, আমার কাছে কী আছে? উপরোক্ত হাদীস থেকেও তাদের এই গুণের প্রমাণ পাওয়া যায়। সাধারণ কোনো বিষয়ের জন্য তারা সারা জীবনের অনুগ্রহ ভুলে যায়। কোনো দিন যদি স্বামীর ঘরে খানাপিনার কমতি দেখা দেয়, তখনই তাদের মুখে অভিযোগ আসা শুরু হয়ে যায় যে, এই দুর্ভাগার ঘরে এসে আমি সব সময় অভাবই দেখেছি। মা-বাবা জেনেশুনে আমাকে কুয়ায় ফেলে দিয়েছে। আমি এই হতভাগার ঘরে কোনো শান্তি দেখিনি। মোটকথা যা কিছু মুখে আসে বলা শুরু করে দেয় এবং এ কথার খেয়াল করে না যে, এই ঘরেই তার সারা জীবনের থাকার ব্যবস্থা হচ্ছে।[২৪৫]

---

[২৪২] *সহীহ বুখারী*, হাদীস নং ৩০৪; *সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং ৮০।
[২৪৩] *সহীহ বুখারী*, হাদীস নং ২৯; *সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং ৯০৭।
[২৪৪] *হুকুকুল বাইত*, ৪৯।
[২৪৫] *আল কামাল ফিদ দ্বীন*, ৭৬।

কেনাকাটায় অপচয়

অকৃতজ্ঞতার শাখাগত একটি রোগ মহিলাদের মধ্যে আছে। তা হলো, যে-কোনো জিনিস, কাজের হোক বা না হোক, পছন্দ হলেই তা কিনতে হবে। তারা বলে, কেনা জিনিস কোনো না কোনো কাজে লেগেই যায়। এটা অকৃতজ্ঞতার শাখা এ কারণে যে, এর দ্বারা স্বামীর সম্পদ নষ্ট হয়। নিজের সম্পদ নষ্ট করাও তো অকৃতজ্ঞতার অন্তর্ভুক্ত। যেমন : আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٢٧﴾

নিশ্চয় অপচয়কারীরা শয়তানের ভাই। আর শয়তান স্বীয় রবের প্রতি অনেক বেশি অকৃতজ্ঞ। (সূরা বনি ইসরাঈল, ১৭ : ২৭)

এখানে যেহেতু সম্পদও অন্যের, তাই আল্লাহর অকৃতজ্ঞতার পাশাপাশি স্বামীরও অকৃতজ্ঞতা প্রকাশিত হচ্ছে। মুমিনের অন্তর তো অতিরিক্ত খরচ করতেও ভীত থাকা উচিত, যেন অপচয় না হয়ে যায়। আর প্রয়োজন ছাড়া কোনো জিনিস কেনা তো স্পষ্ট অপচয়ের অন্তর্ভুক্ত। তাহলে মুমিনদের তো এ কাজ থেকে অনেক বেশি দূরে থাকা দরকার। হাদীসে আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পদ নষ্ট করতে নিষেধ করেছেন।[২৪৬]

আজকাল অনেক পরিবারে বিশেষত ধনীদের পরিবারে অনেক বেশি অপব্যয় হয়। এমন হাঁড়িপাতিল কেনা হয়, যার দাম তো অনেক, কিন্তু মাটির চেয়েও দুর্বল। একটু খোঁচা লাগলেই চার টুকরো হয়ে যায় এবং এগুলো প্রয়োজনের চেয়ে অতিরিক্তই হয়ে থাকে। অনেক ঘরে তো এত বেশি পরিমাণ কাঁচ ও সিসার পাত্র থাকে, সারা জীবনেও যা ব্যবহার করার সুযোগ হয় না। তদ্রূপ জামা-কাপড়ের মধ্যেও এমন অপব্যয় হয়ে থাকে।

স্ত্রীদের মধ্যে একটা ত্রুটি এমন আছে যে, তারা অত্যন্ত নির্দয়ভাবে স্বামীর সম্পদ উড়িয়ে বেড়ায়। বিশেষত বিয়ে-শাদির ফালতু অনুষ্ঠান এবং গর্ব করার উপলক্ষ্যগুলোতে। অনেক জায়গায় তো স্বামী-স্ত্রী দুজনে মিলে খরচ

---

[২৪৬] *সহীহ বুখারী*, হাদীস নং ১৪৭৭।

করে। কিছু ক্ষেত্রে শুধু স্ত্রীই খরচ করার মালিক হয়। এসব কিছুর ফলাফল এই দাঁড়ায় যে, স্বামী ঘুষ নেওয়া শুরু করে, ঋণে ডুবে যায়। অধিকাংশ পুরুষ স্ত্রীদের অপব্যয়ের কারণেই হারাম উপার্জনে লিপ্ত হয়।[২৪৭]

মোটকথা, স্ত্রীদের একটি বদ অভ্যাস হলো অপব্যয় করা। তারা মনে করে, আমাদের তো কামাই করতে হয় না, তাই আমরা যেভাবে ইচ্ছা খরচ করি, স্বামীরা নিজেদের মতো করে কামাই করে নিয়ে আসবে। অনেক জায়গায় চাকরানিরা সুযোগে সুযোগে ঘরের অনেক কিছু লুট করে নিয়ে যায়, কিন্তু মালকিনদের কোনো খবর থাকে না। স্মরণ রাখবেন, স্বামীর সম্পদের হেফাজতের দায়িত্ব স্ত্রীদের ওপর। এটা ওয়াজিব। এভাবে-সেভাবে ফেলে রাখা জায়েজ নয়। কেয়ামতের দিন স্ত্রীদের এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদের সম্মুখীন হতে হবে।[২৪৮]

বিয়ে-শাদিতে অপচয়

মহিলারা বিশেষ করে বিয়ে-শাদির অনুষ্ঠানে অনেক বেশি অপব্যয় করে। এ ক্ষেত্রে তারাই হয় প্রধানমন্ত্রী। সকল কাজ তাদের থেকে জিজ্ঞেস করেই করতে হয়। পুরুষরা যেন জানেই না, বিয়ে-শাদিতে কোথায় খরচ করার প্রয়োজন আছে, কোথায় নেই। মহিলারা যেখানে খরচ করার আদেশ দেয়, সেখানে বিনাবাক্যে খরচ করা হয়। আর মহিলারা এমন বেখাপ্পা খরচ বের করে রেখেছে, যেখানে অযথা টাকা-পয়সা বরবাদ হয়।

এ জাতীয় বিয়ে-শাদির কারণে অনেক পরিবার ধ্বংস হয়ে গেছে। তবুও মানুষের মনে এখনো বুঝ আসেনি। এখনো তারা এসব আচার-অনুষ্ঠানে মহিলাদের অনুসরণ পরিহার করেনি। এখনো তাদের চোখ খুলেনি। যখন সকল জমিজিরাত নিলামে উঠবে, তখন গিয়ে শরীয়ত অনুযায়ী বিয়ের পন্থা খুঁজবে। প্রিয় পাঠক! বিয়ে-শাদিতে সংক্ষিপ্ততা অবলম্বন করা উচিত। যেন পরবর্তীতে এই আফসোস না হয় যে, এটা আমি কী করলাম! যদি

---

[২৪৭] *হুকুকুল বাইত*, ৫২।
[২৪৮] *আল কামাল ফিদ দ্বীন*, ১১২।

কারও কাছে অনেক বেশি সম্পদ থাকে, তাহলে তা এই পদ্ধতিতে বরবাদ করা সংগত নয়। বরং দুনিয়ায় কিছু টাকা জমাও রাখতে হয়। এর দ্বারা অন্তর নিশ্চিন্তে থাকতে পারে।[২৪৯]

শোকসভায় অপব্যয়

মহিলারা শোকসভাগুলোতেও অনেক অপচয় করে। সেখানে খরচ করার জায়গাই-বা কোথায়! সেটা তো আর গর্ব করার স্থান নয়; বরং শিক্ষাগ্রহণের স্থান। কিন্তু এই শোকের স্থানেও মহিলাদের বিশেষ অনুষ্ঠান করতে হয়। আরও উদ্বিগ্ন হই তাদের চিন্তা করে, যারা কারও ঘরে কেউ মারা গেলে দলবেঁধে গাড়ি নিয়ে তাদের ঘরে গিয়ে ওঠে। এই বেচারার ওপর একদিক থেকে তো মৃত্যুর শোক ছিলই, এখন নতুন করে তার মাথায় এই বিপদ এসে পড়েছে যে, আগন্তুকদের খানা খাওয়াতে হবে। চা-পানের ব্যবস্থা করতে হবে। উপরন্তু যদি কোথাও কোনো ত্রুটি হয়, তাহলে আগন্তুকরা নিন্দার ঝড় বইয়ে দেবে যে, আমরা গেলাম আর আমাদের ভাগে পান পর্যন্ত জুটল না।

দয়া করে কেউ তাদের জিজ্ঞেস করুন, এটা কি তোমাদের কৌতুক প্রদর্শনের সময় ছিল, না ওই বাড়ির মানুষের মুসিবতের সময় ছিল! কিন্তু তাদের মুসিবতেও আগন্তুকদের কৌতুক আর আবদারে কোনো কমতি হয় না। অথচ এ সময় উচিত ছিল এই যে, আগন্তুকরা নিজেদের বাড়ি থেকে ডাল রুটি পাকিয়ে তাদের জন্য নিয়ে আসবে এবং মৃতের পরিবারকে বলবে যে, এখন তোমরা আমাদের নিয়ে চিন্তা করবে না, তোমরা নিজেরা এখন বিপদে আছ। পরবর্তীতে যখন খুশির উপলক্ষ্য আসবে, তখন আমাদের মেহমানদারি করবে। এখন আমরা আমাদের ব্যবস্থা নিজেরাই করব। তা ছাড়া এটা অনেক লজ্জার বিষয় যে, সেখানে গিয়েও নিজের সকল সাধারণ চাহিদা পূরণ করতে হবে, না পান ছাড়া হবে, না চা বাদ যাবে।[২৫০]

---

[২৪৯] *আল কামাল ফিদ দ্বীন*, ১১২।
[২৫০] *আল কামাল ফিদ দ্বীন*, ১১২।

প্রয়োজনের সীমানা

জনৈকা নারী হাকীমুল উম্মত থানভী রাহিমাহুল্লাহ সমীপে চিঠি লিখল যে, হযরত, আমার ঘরে অতিরিক্ত খানাপিনা থাকে। কয়েকজন মহিলা আমাকে বলেছে, তুমি অপচয় করো। আপনি একটু জানাবেন যে, কোন সীমানা অতিক্রম করলে তাকে অপচয় বলা হয়, যে কারণে মানুষকে অপচয়কারী আখ্যায়িত করা যাবে!

তিনি উত্তরে লিখেছেন, শাখাগত বিষয় তো পরিস্থিতির শিকার ব্যক্তিই ভালো বুঝবে। তবে এ ক্ষেত্রে মূলনীতিস্বরূপ এতটুকু বলা যায় যে, প্রথম দিকে প্রয়োজনীয় খরচের ওপর সীমাবদ্ধ থাকার অভ্যাস বানানো উচিত। এ জন্য প্রথমে প্রয়োজন কাকে বলে তা বুঝতে হবে। প্রয়োজন হলো, যে স্থানে খরচ না করলে ক্ষতি হয়। যেমন : ঠান্ডায় কাপড়স্বল্পতার কারণে কষ্ট হয় কিংবা গরমে মোটা কাপড় পরলে কষ্ট হয় অথবা এখন হচ্ছে না কিন্তু সামনে হবে। এমন সময় খরচ করার নাম হলো প্রয়োজন। এটা হলো প্রয়োজনের প্রথম স্তর। এরই অভ্যাস বানানো উচিত। সমস্ত ব্যয় ও আসবাবপত্রে সংক্ষিপ্ততা অবলম্বন করুন। অর্থাৎ প্রয়োজন পরিমাণের ওপর সীমাবদ্ধ থাকুন। প্রয়োজনের কিছু স্তর রয়েছে :

১। যা ব্যতীত জীবন চলা সম্ভব নয়। এটা মুবাহ, বরং ওয়াজিব।

২। কোনো জিনিস ব্যতীত জীবন চলে যাবে কিন্তু তা থাকলে আরাম পাওয়া যাবে, না থাকলে কষ্ট হবে, জীবন চলে যাবে কিন্তু কষ্ট হবে। এমন আসবাব রাখারও অনুমতি আছে।

৩। যে জিনিসের ওপর কোনো কাজ আটকে থাকে না, না তা ব্যতীত চলতে কষ্ট হয়। বরং তা থাকলে নিজের মন আনন্দিত থাকে। তাহলে নিজের মনকে আনন্দিত করার জন্য কোনো জিনিস সংগ্রহ করার অনুমতি আছে। তবে শর্ত হলো তার সামর্থ্য থাকতে হবে। এটাও জায়েজ।

৪। অন্যদের দেখানো এবং তাদের দৃষ্টিতে বড় হওয়ার জন্য কিছু জিনিস সংগ্রহ করা। এটা হারাম। প্রয়োজন ও অপ্রয়োজনের এই স্তর সকল জিনিসের মধ্যেই আছে। ঘরবাড়ির মধ্যেও। আসবাবপত্রের মধ্যেও।

প্রতিটি জিনিসের প্রয়োজনের মূলনীতি হলো এই যে, যা ব্যতীত চলতে কষ্ট হয়, তা প্রয়োজন। আর যা ব্যতীত চলতে কষ্ট হয় না, তা নিষ্প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে যদি নিজের মনকে আনন্দিত করার নিয়ত থাকে, তাহলে তা অনুমোদিত। আর যদি অন্যের দৃষ্টিতে বড় হওয়ার নিয়ত থাকে, তাহলে তা হবে হারাম। এই মূলনীতির ওপর আমল করতে হবে।[২৫১]

অপচয়ের সীমানা

অপচয় বলা হয় এমন কাজকে যাতে কোনো উপকার ও কল্যাণ থাকে না। শরীয়তের সীমালঙ্ঘন ব্যতীত অধিক খানাপিনা করা অপচয়ের অন্তর্ভুক্ত নয়। জিনিসপত্র কেনার ব্যাপারে আমি বলে থাকি, কোনো জিনিস কিনতে চাইলে প্রথমে চিন্তা করে নেবেন যে, এর প্রয়োজন আছে কি না। যদি সাথে সাথে প্রয়োজন মনে হয়, তাহলে কিনে ফেলুন। আর যদি সাথে সাথে প্রয়োজন মনে না হয়, তাহলে এখন কিনবেন না। কেননা যে জিনিসকে আধা ঘণ্টা চিন্তা করে প্রয়োজন বানানো হয়, সেটা মূলত প্রয়োজন নয়। আর যদি অন্তরে এই জিনিস কেনার অনেক বেশি তাগাদা থাকে, তাহলে কিনে ফেলবেন। এবং শান্ত মনে বসে চিন্তা করতে থাকবেন যে, অপচয় হলো কি না। যদি অপচয় হয়ে থাকে তাহলে দান করে দেবেন। অন্যথায় ব্যবহারে লাগিয়ে দেবেন।

অন্যের জামা দেখে তার মতো জামা বানানো

এক মহিলা থানভী রাহিমাহুল্লাহর কাছে পত্রমারফত জানালেন যে, হযরত, আমার মন সব সময় ভালো ও পরিচ্ছন্ন কাপড় পরতে চায়। আল্লাহ তাআলা দিয়েছেনও অনেক এবং আমার নিয়তও এমন থাকে যে, তা দেখে আমার স্বামী খুশি থাকবে। আমার স্বামীও তাই চায়। কিন্তু সমস্যা হলো, যখন কোনো মহিলাকে ভালো কোনো কাপড় পরে থাকতে দেখি, তখনই মন সে ধরনের কাপড় বানাতে চায়। এমতাবস্থায় অধিকাংশ সময় চুপ থাকি। কিন্তু মাঝে মাঝে তার কাছে আবদার করে বসি এবং তা

---

[২৫১] *আত তাবলীগ*, ৪/১৬৭।

পেয়েও যাই। এটা যদি কোনো রোগ হয়ে থাকে, তাহলে দয়া করে প্রতিকার বলে দিন।

হযরত লিখলেন, সাজসজ্জা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে শিথিলতা ও বাড়াবাড়ি উভয়টাই নিন্দনীয় এবং মধ্যপন্থা অবলম্বন করা প্রশংসনীয়। উল্লিখিত সুরতে মধ্যপন্থা হলো, কাউকে দেখলে সাথে সাথে বানাবেন না। কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ার পর যদি তা মাথা থেকে বেরিয়ে যায়, তাহলে তো হলোই। অন্যথায় যখন নতুন কাপড় বানানোর প্রয়োজন পড়বে, তখন বানিয়ে নেবেন। আর যদি তখন না পাওয়া যায়, তাহলে এর চিন্তা বাদ দেবেন। আর যদি দেখেন যে, এত দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করলে মন উদ্বিগ্ন থাকে, তাহলে পছন্দের সময় কাপড়টি কিনে রাখবেন, কিন্তু বানাবেন না। বানাবেন তখন যখন নতুন জামা বানানোর প্রয়োজন হবে। তাহলে এই সময়ের কাপড়টা বেঁচে যাবে। আর যদি আপনার স্বামী আপনাকে হাতখরচ দিয়ে থাকে, তাহলে এই কাপড় নিজের হাতখরচ থেকে কিনবেন, যেন অন্তর নিজ সীমানায় সীমাবদ্ধ থাকে।[২৫২]

অহংকার

অহংকার মানুষকে সব ধরনের কল্যাণ ও বরকত থেকে বঞ্চিত করে। এই রোগের কারণেই শয়তান জান্নাত থেকে বিতাড়িত হয়েছে। আমাদের মাঝে অহংকার ভরপুর। এ জন্য আমরা পূর্ণাঙ্গ দ্বীন থেকে মাহরুম। মহিলাদের মধ্যেও এই রোগ অনেক বেশি। প্রথমত তাদের মধ্যে দ্বীনদারের সংখ্যা অনেক কম। আর যারা দ্বীনদার তারাও না জানি নিজেদের কী মনে করে। মহিলারা যেহেতু স্বল্প হিম্মতের অধিকারী হয়, তাই অল্পতেই তাদের মধ্যে অহংকার ও বড়াই চলে আসে, যা মূলত স্বল্প হিম্মতের লোকদেরই কাজ।

এক মহিলা অনেক নামাযী ছিল। ঘটনাক্রমে তার বিয়ে হলো দাড়ি মুণ্ডানো বেনামাযী এক ব্যক্তির সাথে। সে বলতে লাগল, হায় আল্লাহ, এটা কি আপনার শান হলো যে, একজন পবিত্র মহিলাকে বেদ্বীন মানুষের সাথে

---

[২৫২] *কামালাতে আশরাফিয়া*, ৯৭।

বিয়ে দিয়ে দিলেন! কেমন যেন আল্লাহ তাআলার ওপরও তার আপত্তি যে, আল্লাহ তাআলার কোনো নিয়মনীতি নেই। জোড়ার সাথে জোড়ার মিল নেই। আস্তাগফিরুল্লাহ।

আরে মিয়াঁ, কার পরিসমাপ্তি ভালো হবে তা কি আপনার জানা আছে! আল্লাহ তাআলা কাকে ক্ষমা করেন আর কাকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দেন তার কোনো নিশ্চয়তা আছে! এটা কোনো আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, আল্লাহ তাআলা এই বেনামাযীকে কোনো একটি আমলের কারণে ক্ষমা করে দেবেন আর আপনাকে এই অহংকারের কারণে দোযখে পাঠিয়ে দেবেন!

কারও পরিসমাপ্তি কেমন হবে কেউ তা জানে না। তা ছাড়া আপনি যে আমল নিয়ে অহংকার করছেন, তা কবুল হয়েছে কি না তাও জানা নেই। আশা তো এমনই রাখা উচিত যে, কবুল হবে। কিন্তু নিশ্চিত না হওয়ার কারণে তা নিয়ে শঙ্কিতও থাকা উচিত এবং কখনো নিজের আমল নিয়ে গর্ব না করা উচিত এবং অন্যকে তুচ্ছ মনে না করা উচিত। এর কারণে আমল বরবাদ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়।[২৫৩]

আজকাল একটি ব্যাপক রোগ হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, কেউ অল্প একটু আমল করলেই নিজেকে অনেক কিছু মনে করা শুরু করে দেয়। মহিলাদের মধ্যে এই রোগ বেশি। কোনো মহিলা একটু নামাযে ধারাবাহিক হয়ে গেলেই নিজেকে রাবেয়া বসরী এবং অন্য সকলকে তুচ্ছ মনে করতে থাকে। এর কারণ হলো, মহিলাদেরকে কেউ হাতে ধরে শিক্ষা দেয় না। বইপত্র পড়ে দ্বীনদার হয়ে যায়। তার দৃষ্টান্ত হলো ওই ব্যক্তির মতো, যে চিকিৎসা বিজ্ঞানের কোনো বই পড়ে ওষুধ খেতে কিংবা বানাতে শুরা করে। এতে উপকারের পরিবর্তে ক্ষতি হয়। ডাক্তারের পরামর্শে ওষুধ না খেলে কোনো উপকার হয় না। ঠিক তেমনই মহিলাদের আমল ও আখলাক-চরিত্র কোনো মুরব্বির মাধ্যমে যেহেতু ঠিক করা হয় না এবং যা মনে চায় তাই করে, তাই অল্পতেই নিজেকে অনেক কিছু মনে করতে থাকে।

---

[২৫৩] *আল কামাল ফিদ দ্বীন*, ৯১।

এক মেয়ের বিয়ে হয়েছে। সে নামায-রোজায় ধারাবাহিক ছিল। কিন্তু তার স্বামী অতটা ধারাবাহিক নয় এবং কিছুটা স্বাধীনচেতা। তো ওই মেয়ে বলতে লাগল, আফসোস, আমি এত পরহেজগার আর এমন ব্যক্তির জালে ফেঁসে গেলাম, আমার কপালই মন্দ। অথচ এই বোকা এটা বোঝে না যে, যদি আমি নামায পড়ি, রোযা রাখি, তিলাওয়াত করি, তাহলে তো নিজের কাজ করলাম, অন্যের ওপর তো কোনো অনুগ্রহ করলাম না। কেউ কি ওষুধ খেয়ে গর্ব করে বলে যে, আমি অনেক বড় বুযুর্গ হয়ে গেছি!

ওষুধ পানের মতোই এ সমস্ত ইবাদতে শুধু নিজেরই উপকার হয়। যদি আল্লাহর নেয়ামতের দিকে তাকানো হয়, তাহলে বাস্তবে আমাদের এই নামায-রোজা কিছুই না। হাজার হাজার নবী-রাসূল ও ফেরেশতাদের পাহাড়সম ইবাদতের সামনে আমাদের ইবাদতের উদাহরণ তো হিরা-জহরতের সামনে মাটির টুকরার মতো। এটা তো প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ যে, তিনি আমাদের এমন ইবাদত কবুল করে নেন। এটা শুধুই আল্লাহ তাআলার রহমত যে, তিনি আমাদের অসম্পূর্ণ ইবাদতকেও ইবাদত গণ্য করেছেন। এটা একমাত্র তাঁরই অনুগ্রহ। অতএব এই ইবাদত নিয়ে গর্ব করা কিংবা অতি আনন্দিত হওয়া মূর্খতার পরিচায়ক। এসব নিয়ে গর্ব ও অহংকার করার উৎসও এই অজ্ঞতা। বিবেক-বুদ্ধি যে পরিমাণে কম হয়, অহংকারের রোগ ততই বৃদ্ধি পায়। এ জন্যই পুরুষদের তুলনায় নারীদের মাঝে এই রোগের প্রবণতা বেশি হয়ে থাকে।

অহংকার ও আত্মম্ভরিতার চিকিৎসা

জনৈক মহিলা হাকীমুল উম্মত থানভী রাহিমাহুল্লাহর নিকট পত্রমারফত লিখলেন যে, বাবার বাড়িতে গিয়ে দেখি অধিকাংশ নারী-পুরুষ নামায পড়ে না। আমি সব সময় নিয়মতান্ত্রিক নামায পড়ি। অনেক সময় অন্তরে এমন খেয়াল আসে যে, আমি এই বেনামাযী নারী-পুরুষদের চেয়ে উত্তম। এরা অযথা সময় নষ্ট করে আর আমি ইবাদত করে কাটিয়ে দিই। হযরত, আমাকে এমন কিছু বলে দিন, যাতে আমার অন্তর থেকে অন্যদের ছোট করে দেখার রোগ দূর হয়ে যায়।

হাকীমুল উম্মত রহ. উত্তরে লিখলেন, নিজের নামাযী হওয়া এবং অন্যদের বেনামাযী হওয়ার খেয়াল আসার ক্ষেত্রে মানুষের কোনো এখতিয়ার নেই। তবে এভাবে চিন্তা করার ক্ষমতা তার আছে যে, আমি নামাযী আর তারা বেনামাযী। কিন্তু প্রত্যেক নামাযী বেনামাযীর চেয়ে ভালো হবে তা তো আবশ্যক নয়। হতে পারে বেনামাযীর এমন কোনো ভালো আমল আছে আর নামাযীর এমন কোনো মন্দ আমল আছে, যার কারণে সামষ্টিক বিচারে ওই বেনামাযী এই নামাযীর চেয়ে উত্তম। আবার এমনও হওয়ার সম্ভাবনা আছে যে, ভবিষ্যতে এই নামাযী বেনামাযী হয়ে যাবে আর ওই বেনামাযী নামাযী হয়ে যাবে। সুতরাং বেনামাযীও আল্লাহর কাছে উত্তম হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তাহলে নামাযী নিজেকে উত্তম মনে করবে কেন?

তবে হাঁ, নামায একটি নেয়ামত। আল্লাহ তাআলা নিজ করুণায় আমাকে তা আদায় করার তাওফিক দিয়েছেন। আর বেনামাযী হওয়া একটি রোগ। বেনামাযী তাতে আক্রান্ত হয়েছে। অতএব সুস্থ মানুষের যেভাবে নিজের সুস্থতার জন্য শুকরিয়া আদায় করা ওয়াজিব এবং কোনো অসুস্থকে তাচ্ছিল্য করা জায়েজ নেই; বরং তার প্রতি দয়ার্দ্র হতে হয় এবং তার সুস্থতার জন্য দুআ করতে হয়, ঠিক তদ্রূপ আমাকেও আল্লাহর ইবাদত করার ব্যাপারে শুকরিয়া আদায় করা উচিত এবং বেনামাযীর ওপর দয়ার্দ্র হয়ে তার হেদায়েতের জন্য দুআ ও চেষ্টা করা উচিত।

এভাবে বারবার চিন্তা করলে এক সময় এই রোগ দূর হয়ে যাবে। এভাবে চিন্তা করার ক্ষমতা মানুষের আছে। তাই এই ইচ্ছাশক্তিকে কাজে লাগাতে হবে।[২৫৪]

বিনয়: প্রয়োজনীয়তা ও অর্জন করার পদ্ধতি

হে নারীরা! আপনারা এটা তো মানবেন যে, মারইয়াম আলাইহাস সালাম আপনাদের চেয়ে অধিক দ্বীনদার ছিলেন। এত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তাকে এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, হে মারইয়াম, নিজের রবের

---

[২৫৪] *মাকতুবাতে আশরাফিয়া*।

সামনে বিনয়ী হয়ে যাও এবং তাকে সাজদা করো। অর্থাৎ আল্লাহর ইবাদতে অন্তরকেও মাশগুল রাখো এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গকেও। নামায পড়ো; যেহেতু নামাযের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে সাজদা, এ জন্য তাকে বিশেষ করে সাজদার আদেশ দেওয়া হয়েছে।

রুকুর কথা বলা হয়েছে; রুকুর দুটি অর্থ : একটি হলো রুকু করা, আরেকটি হলো ঝুঁকে যাওয়া। আমি দ্বিতীয় অর্থই গ্রহণ করি। অতএব উদ্দেশ্য হবে, ঝুঁকে যাও, বিনয়ী হয়ে যাও। সবকিছুই করো, কিন্তু নিজেকে বিনম্র বানাও। আল্লাহর সামনে নিজেকে দুর্বল মনে করো।

এই বিনয় অর্জন করার পদ্ধতি হলো, বিনয়ী লোকদের সাথে থাকা। ভালো মানুষদের সাহচর্য অর্জন করা আখলাক-চরিত্র সংশোধনের সর্বোত্তম মাধ্যম। সৎসঙ্গ ব্যতীত আখলাক-চরিত্রের সংশোধন হয় না। আর যেহেতু মহিলাদের এই সুযোগটা কম থাকে, তাই সাধারণত তাদের আখলাক পরিশুদ্ধ হয় না। তাই তাদেরও সৎসঙ্গের অনেক বেশি প্রয়োজন।

পুরুষদের জন্য সৎ মানুষের সাহচর্য গ্রহণের সবচেয়ে উত্তম পদ্ধতি হলো, বুযুর্গদের খেদমতে গিয়ে অবস্থান করা। এই পদ্ধতি মহিলাদের জন্য উপযোগী নয়। কেননা প্রথমত তাদের ঘরের কাজে এত ব্যস্ততা যে, এর জন্য তেমন অবকাশ পাবে না। দ্বিতীয়ত এটা তাদের প্রকৃতিরও বিপরীত। তবে যদি কোনো আল্লাহওয়ালা মহিলা নিকটে থাকে, তাহলে তার সাহচর্যে থাকবে। তথাপি এমন সুযোগ মহিলাদের খুব কম মিলে থাকে। তাই এই সুযোগ থাকলে তাদের কাছাকাছি থাকার চেষ্টা করুন। এটাও যদি না হয়, তাহলে পরবর্তী উত্তম পদ্ধতি হলো, বুযুর্গদের ঘটনা ও উপদেশমালা পাঠ করবে। নমুনাস্বরূপ নিম্নে বিনয়ী বুযুর্গদের কিছু ঘটনা উল্লেখ করছি।[২৫৫]

---

[২৫৫] *আল খুজু*, ৩২০।

বুযুর্গদের বিনয়

১। হযরত ইসমাইল শহীদ রাহিমাহুল্লাহ অনেক তীক্ষ্ণ মেজাজের অধিকারী হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। এক ব্যক্তি তাকে পরীক্ষা করার জন্য এলো। তখন তিনি একটি সাধারণ মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। সে চিৎকার দিয়ে বলল, মাওলানা, আমি শুনেছি যে, আপনার জন্ম হালাল নয়; আপনি জারজ। এ কথা শুনে মাওলানার মাঝে সামান্যতম পরিবর্তন এলো না এবং তিনি রাগান্বিত হলেন না; বরং হেসে দিয়ে বললেন, আপনার কাছে কেউ ভুল বর্ণনা দিয়েছে। আমার বাবা-মার বিয়ের সাক্ষীরা এখনো বেঁচে আছেন।

২। সাহারানপুরের মুহাদ্দিস আহমাদ আলী সাহেব হাদীসের ক্লাসে বসে হাদীস পড়াচ্ছিলেন। এক ব্যক্তি এসে ভালোমন্দ বলা ও গালাগালি করা শুরু করল। ছাত্ররা রেগে গিয়ে তার ওপর চড়াও হতে চাইল। কিন্তু মাওলানা সাহেব সবাইকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, সে যা কিছু বলছে সব তো ভুল নয়, কিছু তো সত্যও আছে।

৩। হযরত গাঙ্গুহী রাহিমাহুল্লাহ একবার মাদরাসার প্রাঙ্গণে বসে হাদীস পড়াচ্ছিলেন। হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হলো। ছাত্ররা সবাই কিতাব নিয়ে ঘরের দিকে ছুটে গেল। আর এদিকে মাওলানা সাহেব সকল ছাত্রের জুতাগুলো জমা করে উঠিয়ে নিয়ে আসলেন। লোকজন এই অবস্থা দেখে লজ্জায় সংকুচিত হয়ে গেল। সুবহানাল্লাহ। তাদের মধ্যে আত্মম্ভরিতার কোনো গন্ধও ছিল না।[২৫৬]

৪। এক ব্যক্তি এক বুযুর্গের সামনে দিয়ে দম্ভ ভরে হেঁটে যেতে লাগল। বুযুর্গ তাকে বললেন, এভাবে বুক উঁচিয়ে চলো না, আল্লাহ তাআলা এই চাল পছন্দ করেন না। ওই ব্যক্তি উত্তপ্ত হয়ে বলল, আমি কে জানেন না? বুযুর্গ বললেন, জানি; তোমার সূচনা হয়েছে এক ফোঁটা নাপাক পানি থেকে আর তোমার পরিসমাপ্তি হলো মরে মাটিতে মিশে যাওয়া। আর এর মাঝখানে তুমি নিজের পেটে পায়খানার বোঝা বহন করছ।

---

[২৫৬] *হুসনুল আযীয*, ৪/২৩৭।

বাস্তবেই আমাদের অবস্থা এটাই। এখন আমরা মজলিসে সকলেই ভদ্র সেজে বসে আছি। এখনই যদি পেট ফেটে যায় অথবা পেটে একটি গর্ত হয়ে যায়, তাহলে দুর্গন্ধের কারণে লোকজনের এখানে বসে থাকা কষ্টকর হয়ে যাবে। ভক্তদের সকল ভক্তি ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। আমরা তো এসব চিন্তা করি না। অন্যথায় বাস্তবতা হলো, আমাদের প্রত্যেকের অবস্থা এমন যে, প্রত্যেকের পেটে কমপক্ষে দুই-তিন কেজি করে ময়লা বিদ্যমান আছে। এত বড় ত্রুটি সাথে নিয়ে ঘুরি তারপরও আমরা নিজেদেরকে বড় মনে করি! কত বড় নির্বুদ্ধিতা ও অজ্ঞতার কথা! তাই নিজেকে বড় মনে করবেন না; বরং আমরা হলাম পচা।

এমন ঘটনা পড়তে থাকুন, তাহলে আর গর্ব করার দাবি আসবে না ইনশাআল্লাহ।

মহিলাদেরকে নামাযের তাগাদা দিলে তারা অনেক সময় বলে, আমাদের সুযোগ কোথায়। তোমরা তো পুরুষ, না বাচ্চা পালতে হয়, না বাসন মাঝতে হয়। আমাদের তো বাচ্চা পালতে হয়, হাঁড়িপাতিল পরিষ্কার করতে হয়, আমাদের কাপড়ও নাপাক থাকে, তাহলে আমরা নামায পড়ব কীভাবে? সুযোগই তো পাই না!

আসতাগফিরুল্লাহ! কেউ তাদের জিজ্ঞেস করুন, যখন চারজন মহিলা সমবেত হয়ে সারা দুনিয়ার ঘটনা নিয়ে বসে এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলতে থাকে, তখন এমন ফালতু কথাবার্তার জন্য সময় কোত্থেকে বেরিয়ে আসে? কাপড় নাপাক থাকার ওজরও একদম বেহুদা। এক জোড়া কাপড় নামাযের জন্য আলাদা করে রাখা কঠিন কিছু নয়।[২৫৭]

ধোঁকাবাজি ও চালাকি

মহিলাদের মধ্যে ধোঁকাবাজি ও চালবাজির রোগ বিদ্যমান। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, হে নারীরা, তোমরা দান-সদকা করবে। কেননা আমাকে দেখানো হয়েছে যে, জাহান্নামবাসীর মধ্যে তোমরাই সবচেয়ে বেশি। মহিলারা জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, এর কারণ কী? তিনি বললেন, তোমরা অনেক বেশি অভিসম্পাত করো এবং

---

[২৫৭] *আল ইফাযাতুল ইয়াওমিয়্যা।*

স্বামীর অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। পুরুষের বুঝবুদ্ধি হরণ করার ব্যাপারে তোমাদের চেয়ে হুঁশিয়ার আর কাউকে দেখিনি।[২৫৮]

মহিলাদের মধ্যে ধোঁকাবাজি ও চালাকির রোগ বিদ্যমান। বড় বড় বিচক্ষণ পুরুষের বিবেক-বুদ্ধি হরণ করে নেয়। দেখা যায়, এমন চড়াই-উতরাইয়ের কথা বলে যে, যথেষ্ট বুদ্ধিমান মানুষ নির্বোধ হয়ে যায়। তাদের কথার ঢঙে সৃষ্টিগতভাবে এমন ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যে, কারণে-অকারণে পুরুষ তাতে প্রভাবিত হয়ে যায়। এর কারণ এই নয় যে, তারা পুরুষদের চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান; বরং এর কারণ হলো, তাদের মধ্যে ধোঁকাবাজি ও চালবাজির উপাদান বেশি থাকে। বুদ্ধি এক জিনিস আর চালবাজি আরেক জিনিস। শয়তানের কাছে ধোঁকা ও চালাকি ছিল কিন্তু বুদ্ধি ছিল না, তাই সে ধোঁকা খেয়েছে। বিবেক আলাদা জিনিস আর ধোঁকাবাজি আলাদা জিনিস। বিবেক প্রশংসনীয় এবং তার অনুপস্থিতি নিন্দনীয়। আর চালবাজি মন্দ অভ্যাস, তার অনুপস্থিতি পছন্দনীয়। অন্যদের ক্ষতি করা শরীয়তেও পছন্দনীয় নয়। তদ্রূপ এত বেশি নির্বোধ হওয়াও কোনো উল্লেখযোগ্য বিষয় নয় যে, নিজেকে ক্ষতি থেকে বাঁচাতে পারে না।

মোটকথা, মহিলাদের মধ্যে চালাকি আর ধোঁকাবাজি বিদ্যমান। সে তুলনায় বুঝবুদ্ধি কম। তারা অনেক বিচক্ষণ মানুষের বিবেক হরণ করতে পারে। নির্জনে এমন কথা বলে, যার দ্বারা স্বামীর মন তার পক্ষে চলে আসে আর স্বামী সবকিছু ছেড়ে দেয়। বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ি আসার সাথে সাথে তাদের প্রথম চেষ্টা এই থাকে যে, স্বামীর মা-বাবা থেকে পৃথক হতে হবে। এটা বড় অন্যায্য বিষয়।[২৫৯]

বেশি কথা বলা

হাদীসে আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে চুপ থাকে সে নিরাপদে থাকে।[২৬০] বাস্তবেই আমাদের মুখ দ্বারা অনেক গুনাহ

---

[২৫৮] *সহীহ বুখারী*, হাদীস নং ৩০৪; *সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং ৮০।
[২৫৯] *ইসলাহুন নিসা*, ১৮৮।
[২৬০] *তিরমিযী*, হাদীস নং ২৫০১; *মুসনাদে আহমাদ*, হাদীস নং ৬৪৮১।

সংঘটিত হয়। বিশেষত মহিলাদের কথা বলার এত শখ যে, একসাথে বসে গেলে কথার ধারা চলতেই থাকে, শেষ হতেই চায় না। আল্লাহই জানেন তাদের কথা এত দীর্ঘ হয় কেন! আর তারা যখন কথা বলতে বসে যায় তখন তাদের অবস্থা দেখে মনে হয়, তাদের মূল উদ্দেশ্যই হলো কথা বলা। মজা নিয়ে নিয়ে কথা বলতে থাকে, মনে হয় অনেক কষ্টে তারা কথা বলার এই সম্পদ অর্জন করেছে।

অন্যদিকে পুরুষদের অবস্থা ভিন্ন। তাদের কথা ও আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, তারা কথা শেষ করে অন্য কাজ করতে যাবে। হে মহিলাগণ, আল্লাহর ওয়াস্তে নিজের বিবেককে সংশোধন করুন।[২৬১]

স্মরণ রাখবেন, বেশি কথা বলে সম্মান অর্জন করা যায় না। সম্মান ওই নারীই পায় যে চুপ থাকে। চুপ থেকে এক স্থানে বসে আল্লাহর যিকির, তাসবীহ ইত্যাদি পাঠ করলেও তার সম্মান ও মর্যাদা হয় অনেক বেশি। কিন্তু যাদের কথা বলার অভ্যাস হয়ে যায়, তারা লাঞ্ছিত অপমানিত হলেও এই অভ্যাস ছাড়তে চায় না। কেউ তাদের কথার প্রতি কান না দিলেও তারা শুধু হাঁকাহাঁকি করতে থাকে। নমরুদের যেমন জুতা খাওয়ার অভ্যাস হয়েছিল, তেমনই অনেক মহিলার কথা বলার বদ অভ্যাস হয়ে যায়।

ঘটনা হলো, নমরুদ নিজেকে খোদা বলে দাবি করল। Beivnxম আলাইহিস সালাম তাকে অনেক বোঝালেন। কিন্তু সে মানল না এবং অনবরত অবাধ্যতা করতে থাকল। সে বলল, তুমি যদি সত্য নবী হয়ে থাকো, তাহলে নিজের খোদার বাহিনী নিয়ে আসো। তার বিশ্বাস ছিল, ইবরাহীমকে সাহায্য করার কেউ নেই আর আমার সৈন্যের অভাব নেই। ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ওহীর মাধ্যমে জেনে তাকে জানালেন, অমুক দিন আল্লাহর বাহিনী আসবে, তৈরি হয়ে যাও।

নমরুদ নিজের বাহিনী তৈরি করল। মনে মনে ভাবত, ইবরাহীম হয়তো কল্পনার জগতে ঘোরাফেরা করছে। নির্দিষ্ট দিন এক ঝাঁক মশা এলো এবং প্রত্যেক সৈন্যের মগজে একটি একটি মশা প্রবেশ করল এবং তাদের

---

[২৬১] *আদ দুনিয়া*, ১০১।

মেরে ফেলল। নমরুদ এই দৃশ্য দেখে প্রাসাদে চলে গেল। একটা লেঙরা মশা এসে তার নাকে ঢুকে গেল এবং মগজে গিয়ে তাকে জ্বালাতন করতে লাগল। এমন সময় যদি মাথায় জুতা দিয়ে আঘাত করা হতো, তাহলে সে কিছুটা শান্তি পেত। ফলে যে-ই আসত, তাকে সালাম না দিয়ে তার মাথায় দু-চারটা জুতার বারি দিয়ে যেত। আল্লাহ তাআলা দেখিয়ে দিয়েছেন, তোর শক্তি ও ক্ষমতা এতটাই হীন যে, একটা মশা—তাও আবার লেঙরা—তোকে বিধ্বস্ত করে দিয়েছে।

ঠিক তেমনই যে সমস্ত নারী-পুরুষ দ্বীন-ধর্ম ছেড়ে নিজের মনচাহি জীবনে প্রবৃত্তিকে খুশি করতে মত্ত এবং নিজের অবস্থা নিয়ে আনন্দিত, আল্লাহর শপথ তাদেরও জুতা খেতে হবে। অনেক পুরুষকেও দেখি, আল্লাহ তাআলা তাকে অনেক অবসর সময় দিয়েছেন। কিন্তু সে তার কদর করে না। দিনরাত তার কাজ হলো, কোনো দোকান বা হোটেলে বসে থাকা আর কারও গীবত করা, কারও বংশ-সম্মানে টোকা দেওয়া, কাউকে অনর্থ জ্ঞান দেওয়া, কাউকে সম্মান করা, কাউকে অপমান করা। তাদের কেউ জিজ্ঞেস করুন যে, এ কাজ না করলে তোমার কোন কাজ আটকে থাকবে? এতে তো অন্য কারও কোনো ক্ষতি হয় না; বরং নিজের মুখ নষ্ট হয় আর অন্তর দুর্গন্ধ হয়। অনেক মহিলা তো এই শয়তানি কাজ নিজেরাও করে, অন্যদেরও শিখিয়ে দেয়।[২৬২]

কুধারণা

মহিলাদের মধ্যে কুধারণার উপাদান অনেক বেশি। বিয়ে-শাদি ইত্যাদি অনুষ্ঠানে অনেক সময় মহিলারা অলংকার খুলে কোনো জায়গায় রেখে দেয়। তারপর সবাই মিলে তা খুঁজতে থাকে। সকলের কষ্ট হয় এবং খারাপ পরিস্থিতি তৈরি হয়। হঠাৎ কারও নাম নিয়ে বলে দেয়, এটা তার কাজ। এ জন্য অবুঝ বাচ্চারা বাহিরে গেলে তাদের অলংকার পরানো উচিত নয়। কিন্তু মহিলাদের এটা একটা নেশা হয়ে গেছে। এমনকি ছোট মেয়েদেরও এমন শখ থাকে যে, তাদের কাছে অলংকার থাকবে। যদি

---

[২৬২] *আদ দুনিয়া।*

তাদের নাক-কান ফুটা না করা হয়, তাহলে কান্নাকাটি করে ও জেদ ধরে কষ্ট হলেও ফুটা করে নেয়, যেন অলংকার পরা যায়।[২৬৩]

অভিশাপ দেওয়া

মহিলাদের একটি রোগ হলো নিন্দা ও অভিশাপ করা। দেখা যায় সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তাদের একটাই কাজ; যার সাথে শত্রুতা তার গীবত গাওয়া আর যার সাথে হৃদ্যতা তাকে অভিশাপ করা; ফলে নিজের সন্তানদের অভিশাপ দেয়, নিজেকে অভিশাপ দেয়। প্রতিটি জিনিসকে—চাই তা অভিশাপ দেওয়ার যোগ্য হোক বা না হোক—অভিশাপ দিতে থাকে।

মনে রাখবেন, কিছু সময় দুআ ও অভিশাপ কবুল হয়ে যায়। কবুল হওয়ার সময়ে অভিশাপ করে পরবর্তীতে লজ্জিত হতে হয়। আমাদের এলাকায় এক লোক প্যারালাইজড হয়ে গেছে। একদম নড়াচড়া করতে পারে না। অনেক কষ্টে আছে। তার মা তার কোনো দুষ্টুমির কারণে বলেছিল, আল্লাহ তোকে অচল করে দিক। আল্লাহর কুদরতে সে তেমনই হয়ে গেছে। এখন এই দুর্যোগ খোদ মাকেই পোহাতে হচ্ছে।[২৬৪] মোটকথা, মহিলারা অনেক সময় নিজের সন্তানদেরও অভিশাপ দেয় আর তা লেগে যায়। তার পর মাথায় হাত দিয়ে কাঁদতে থাকে।[২৬৫]

হিংসা-বিদ্বেষ

হিংসা রোগও মহিলাদের মধ্যে অনেক বেশি। ছোট ছোট বিষয়ে তাদের মধ্যে হিংসা তৈরি হয়। যেমন : এ ব্যাপারেও তাদের হিংসা হয় যে, আমার স্বামী তার মা-বাবাকে এত জিনিস কেন দেয়! যদি মা-বাবা না থাকত তাহলে তো এগুলো আমাদের থাকত।

---

[২৬৩] *আল ফানী*, ২৮৪।
[২৬৪] *ইসলাহুন নিসা*, ১৮৩।
[২৬৫] *হুকুকুয যাওজাইন*, ৫৫।

হে মহিলাগণ, আমি এ জন্য আপনাদের প্রশংসা করি যে, তাকদীরের প্রতি পুরুষদের তুলনায় আপনাদের বিশ্বাস বেশি। পুরুষদের মনে হাজারো মন্ত্রণা আসে। আলেমদের সাথে এ বিষয়ে বাহাস করে। কিন্তু আপনাদের মনে তেমন কোনো শক-সন্দেহ থাকে না। কিন্তু এই স্থানে আপনাদের তাকদীরের প্রতি বিশ্বাস কোথায় উড়ে যায় জানা নেই।

ভালো করে বুঝে নিন, আপনার ভাগ্যে যেটুকু লেখা আছে তা আপনি পাবেনই। তাহলে হিংসা-বিদ্বেষ কেন করেন? এই হিংসার কারণেই সর্বদা বউ-শাশুড়ির মাঝে দ্বন্দ্ব লেগেই থাকে। কিন্তু কোনো মহিলা কখনো স্বীকার করবে না যে, আমার হিংসা আছে; বরং অন্যদের কথা বলে মনের জ্বালা মেটায়, অমুকের মধ্যে এই দোষ আছে, অমুক তো তুচ্ছ; ভদ্রতার বিবেচনায় আমার বরাবর কেউ নেই।[২৬৬]

চেয়ে নেওয়া জিনিস ফেরত না দেওয়া

মহিলাদের একটি বড় বদ অভ্যাস হলো, তারা অন্যের থেকে চেয়ে নেওয়া জিনিসের ব্যাপারে অলসতা ও অবহেলা করে। অবস্থা এমন যে, কোনো জিনিস চেয়ে নিয়েছে এবং কাজও হয়ে গেছে, কিন্তু ফিরিয়ে দেওয়ার সাধ্য হয়নি। যখন মালিক নিজে এসে চায় তখন ফেরত দেয়। আর যদি নিজে দেয়, তাহলে একে তো দীর্ঘদিন পর দেয়, দ্বিতীয়ত তাতে অনেক জিনিস কম থাকে, অনেক জিনিস থাকে নষ্ট। অনেক সময় মাসকে মাস চলে যায়, কিন্তু জিনিস ফিরিয়ে দেওয়া হয় না। কেউ চাইলে ফেরত দেয়, নাহয় পরোয়াই করে না। এ ক্ষেত্রে সকলের নিয়ত যদিও খারাপ থাকে না, কিন্তু অলসতার পরিমাণ থাকে সীমাতিরিক্ত।[২৬৭]

আরও একটি অসতর্কতা হলো, খাবারের সাথে যে থালাবাটি দেওয়া হয়, সেগুলো ফেরত দেওয়া হয় না। নিজের ঘরে তা ব্যবহার করতে থাকে। দীর্ঘদিন যাওয়ার পর মালিক নিজে চাইলে তা ফেরত পাওয়া যায়। আমার ঘরেও এই অবহেলা হয়ে থাকে। অথচ শরীয়ত এ ব্যাপারে অনেক

---

[২৬৬] *ইসলাহুন নিসা*, ১৯১।
[২৬৭] *আহকামুল মাল*, ১৪০।

সতর্কতা অবলম্বন করার নির্দেশ দিয়েছে। ফুকাহায়ে কেরাম লিখেছেন, যদি কেউ থালায় করে খানা পাঠায় তাহলে ওই থালায় খাওয়া হারাম। নিজের থালায় ঢেলে তারপর খাও। তবে যদি খানা এমন হয় যে, থালা পরিবর্তন করলে নষ্ট হয়ে যায়, যেমন ফিরনি কুলফি ইত্যাদি, অথবা তার মজা নষ্ট হয়, তাহলে ওই থালায় খাওয়া জায়েজ, অন্যথায় জায়েজ নেই। তবে মালিক যদি থালায় খাওয়ার অনুমতি দিয়ে দেয় তাহলে তাতে খাওয়া জায়েজ।

ফুকাহায়ে কেরাম নিম্নোক্ত হাদীস থেকে এ কথা বলেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সাবধান, আত্মিক সন্তুষ্টি ব্যতীত মুসলমানের সম্পদ ব্যবহার হালাল নয়।[২৬৮] যারা খানা পাঠায়, তারা ওই পাত্রে খাওয়া অপছন্দ করে। তবে যদি খানা এমন হয় যে, থালা পরিবর্তন করলে নষ্ট হয়ে যায় অথবা তার মজা খারাপ হয়ে যায়, তাহলে এখানে অবস্থার প্রেক্ষিতে মালিকের পক্ষ থেকে এই পাত্রে খাওয়ার অনুমতি থাকে। অতএব ফুকাহায়ে কেরামের উপর্যুক্ত বক্তব্যের সারকথা হলো, যদি পারিপার্শ্বিকতা থেকে ওই পাত্রে খাওয়ার অনুমতি পাওয়া যায়, তাহলে ওই পাত্রে খাওয়া জায়েজ। অন্যথায় জায়েজ নেই।

অনুমতি ব্যতীত অন্যের জিনিসে হস্তক্ষেপ করলে মানুষ গুনাহগার হয়। যদি কারও জিনিস নষ্ট করে, তাহলে তার জরিমানা দেওয়া আবশ্যক হয়ে যায়।[২৬৯]

ঋণ পরিশোধ না করা

ঋণ পরিশোধ না করা একটি খারাপ গুণ। মহিলাদের মধ্যেও এই গুণ বিদ্যমান। তাদের ঋণ পরিশোধ করার অভ্যাসই থাকে না। তাই তাদের ওপর কারও ভরসা থাকে না। ফলে এমন অবস্থা হয়ে যায় যে, সবার কাছে ঋণ চাইলেও কেউ তাকে ঋণ দেয় না। অথচ ঋণ দেওয়ার সওয়াব অনেক বেশি। হাদীসে আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

---

[২৬৮] *হাকীম*, হাদীস নং ৩১৮; *বায়হাকী*, হাদীস নং ২২৮।
[২৬৯] *আত তাবলীগ*, ৭/৪২।

বলেছেন, আমি জান্নাতের দরজায় লেখা দেখেছি, সদকা করলে দশ সওয়াব পাওয়া যায় আর ঋণ দিলে আঠারো সওয়াব পাওয়া যায়। নবীজী জিবরীল আলাইহিস সালামকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, ঋণ সে-ই চায় যার কঠিন প্রয়োজন দেখা দেয়। কেননা তাকে আবার তা ফেরত দিতে হয়। কিন্তু সদকা তো ফেরত দিতে হয় না।

ঋণ দেওয়ার সওয়াব তো অনেক। কিন্তু কেউ ঋণ নিয়ে ফেরত না দিলে তাকে কে ঋণ দেবে? এখন ঋণ দিলে তা উসুল হয় না। এমনকি ঋণগ্রহীতা সামনে পর্যন্ত আসে না। অনেকে আবার কোনো জিনিস কিনে কিছু টাকা বাকি রাখে, আর দেওয়ার নাম নেয় না। এক-দুই টাকা হওয়ার কারণে সাধারণ মনে করে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা বোধ করে না; আবার দোকানদারেরও চাইতে লজ্জা লাগে। কিন্তু কেয়ামতের দিন এই মামলা অনেক গুরুতর হয়ে যাবে। কারও কাছে যদি তিন পয়সাও পাওনা থাকে, তার সাতশ মাকবুল নামাযের সওয়াব পাওনাদারকে দিয়ে দেওয়া হবে। এটা কত ভয়াবহ কথা। সারা জীবন নামায পড়বে কিন্তু কেয়ামতের দিন তা ছিনিয়ে নেওয়া হবে। আখেরাতও বরবাদ হলো, কোনো সওয়াবও নিজের কাছে অবশিষ্ট থাকল না।[২৭০]

ট্রেন সফরে অনেক নারী-পুরুষ নিয়মের চেয়ে বেশি পরিমাণ সামান নিয়ে যায়। এগুলোর ভাড়াও দেয় না, রশিদও কাটায় না। অনেক সময় নিজে থার্ড ক্লাসের টিকিট কাটে, কিন্তু সেকেন্ড ক্লাসে থাকা বন্ধুর কাছে গিয়ে বসে যায় এবং দুই-তিন স্টেশন সেখানেই বসে থাকে। আবার টিকিট নেয় দুই-তিন স্টেশনের আর চলে যায় অনেক দূর। এসব সুরতে এই ব্যক্তি রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে ঋণী থাকবে। কেয়ামতের দিন তার থেকে তা উসুল করা হবে।

যদি কারও কখনো এমন ভুল হয়ে যায়, তাহলে এই ঋণ শোধ করার সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি হলো, নিজের ওপর রেলওয়ের যত টাকা ঋণ আছে তত টাকার টিকিট কিনবে, কিন্তু তা ব্যবহার করবে না। ফলে কর্তৃপক্ষের

---

[২৭০] *আত তাবলীগ*, ৭/৪২।

ঋণও শোধ হবে আর ওই ব্যক্তির ব্যাপারে কোনো অভিযোগও থাকবে না।[২৭১]

আত্মীয়দের সাথে পর্দায় অবহেলা

মহিলাদের একটি রোগ হলো, তারা পর্দার প্রতি গুরুত্ব কম দেয়। আত্মীয়-স্বজনদের মাঝে যারা না-মাহরাম, যাদের সাথে চিরদিনের জন্য বিয়ে-শাদি হারাম নয়, নির্দ্বিধায় তাদের সামনে চলে যায়। মামাতো, চাচাতো ও খালাতো ভাইয়ের সাথে একেবারেই পর্দা করে না। আরও গজবের বিষয় হলো, সাজসজ্জা করেও তাদের সামনে যায়। শরীর ঢাকার একেবারেই চেষ্টা করে না। মাথার চুল খোলা রেখেই তাদের সামনে চলে যায়। আর কারও শরীর ঢাকা হলেও কাপড় এত পাতলা থাকে যে, পুরো শরীর দেখা যায়। অথচ পাতলা কাপড় পরে মাহরামের সামনেও আসা জায়েজ নেই। কেননা যারা মাহরাম, যাদের সাথে চিরকালের জন্য বিয়ে হারাম, তাদের সামনে পেট, কোমর, বাহু ও বুক ঢেকে রাখা ফরয। অতএব এমন কাপড় পরে মাহরাম তথা আপন ভাই, আপন চাচা প্রমুখের সামনে আসা যাবে না, যা গায়ে দিলে পেট, কোমর, বাহু বা বুক দেখা যায় কিংবা এই অঙ্গের কোনো অংশ দেখা যায়।

শরীয়ত মাহরাম পুরুষদের সামনে আসার জন্যও কত শর্ত লাগিয়ে দিয়েছে। আর বর্তমান মহিলারা না-মাহরামদের সামনেও নির্দ্বিধায় চলে আসে। যেন শরীয়তের পরিপূর্ণ বিরোধিতা। হে মেয়েরা, পর্দার প্রতি গুরুত্ব দিন। না-মাহরাম আত্মীয়দের সামনে কিছুতেই যাবেন না। আর মাহরামদের সামনেও সতর্কতার সাথে যাবেন।[২৭২]

---

[২৭১] *দাওয়াতে আবদিয়্যাত*, ৮/৪৬।
[২৭২] *আল কামাল ফিদ দ্বীন*, ১০৮।

চৌদ্দতম অধ্যায়

মহিলাদের ঝগড়া-বিবাদ

নারীদের পরস্পর ঝগড়া-বিদ্বেষ অনেক তীব্র না হলেও দীর্ঘমেয়াদি হয়ে থাকে। কখনো তাদের মধ্যে মনোমালিন্য হলে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তার প্রভাব চলমান থাকে। তাদের একটি বদ অভ্যাস হলো, কোনো বিষয়ে ঝগড়া লাগলে শুরুতেই অতীতের বিষয় নিয়ে খোটা দেওয়া শুরু করে। পুরুষদের মাঝে এই রোগ কম। কিন্তু মহিলারা যে বিষয়ের সমাধান হয়ে গেছে ঝগড়ার সময় পুনরায় সে কথা দোহরানো শুরু করে। যার ফলে বর্তমান বিষয়টি সহজ হলেও পুরোনো কথা স্মরণ করার কারণে অনেক বেশি কঠিন হয়ে যায়; বিশেষত যখন এই স্মৃতিচারণ নিতান্ত মনদুখানো ভাষায় হয়ে থাকে, যে ব্যাপারে মহিলাদের বিশেষ যোগ্যতা রয়েছে। ঝগড়ার সময় তারা নিজের অনুগ্রহকেও এমন ভাষায় আলোচনা করে যে, অন্যের কলিজা চৌচির হয়ে যায়।[২৭৩]

নারী-পুরুষের ঝগড়ার পার্থক্য

পুরুষের স্বভাব থাকে গরম। তাই রাগ ও ঝগড়ার সময় মারপিট শোরগোল ইত্যাদির মাধ্যমে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। পক্ষান্তরে নারীদের স্বভাব হয় ঠান্ডা ও লজ্জাময়। এ জন্যই তাদের রাগের নিদর্শন প্রকাশ পায় না। অন্যথায় প্রকৃতপক্ষে রাগের দিক দিয়ে নারীরা পুরুষদের তুলনায় কোনো অংশে কম নয়; বরং বেশি। মহিলাদের এমন এমন স্থানে রাগ উঠে যায়, যেখানে পুরুষদের রাগ ওঠে না। যেহেতু তাদের বুঝবুদ্ধি স্বল্প, তাই তাদের রাগের স্থানও অনেক বেশি।

রাগ দু-ধরনের হয়ে থাকে : এক। মিষ্টি রাগ; যা দীর্ঘমেয়াদি হয়ে থাকে। দুই। সরব রাগ; যা চিল্লাচিল্লি ও শোরগোলের সময় ঝড়ের মতো উথলে ওঠে এবং তারপর দেবে যায়। কিন্তু মিষ্টি রাগ মনের গহীনে জমাট হয়ে

---

[২৭৩] *আল ইনসিদাদ লিল ফাসাদ*, ৩২৬।

থাকে। তাকে বিদ্বেষ বলে। এই বিদ্বেষের উৎস হলো রাগ। অতএব মিষ্টি রাগের মাঝে দুটি রোগ পাওয়া গেল—রাগ ও বিদ্বেষ।

বিদ্বেষের মধ্যে একটি সমস্যা এই হয় যে, যেহেতু রাগ প্রকাশ পায় না, তাই অন্তরে তার প্রভাব লুক্কায়িত থাকে এবং আস্তে আস্তে তা আরও কঠোর হতে থাকে। অতএব বিদ্বেষ শুধু একটি গুনাহই নয়; বরং অনেকগুলো গুনাহের মূল। বিদ্বেষ থাকে মিষ্টি রাগে আর মিষ্টি রাগ থাকে মহিলাদের ভেতর। সুতরাং মহিলাদের রাগ অজস্র গুনাহের কারণ হয়ে যায়। পক্ষান্তরে পুরুষদের রাগ তেমন নয়। পুরুষদের রাগ উত্তপ্ত, কিন্তু মহিলাদের রাগ মিষ্টি।[২৭৪]

ঝগড়া লাগানোর অভ্যাস

মহিলারা অনেক বেশি গীবত করে। নিজেও বানিয়ে বানিয়ে ঘটনা অভিযোগ বলে, অন্যদের থেকেও শোনে এবং এর তালাশেই থাকে। বাহির থেকে কোনো মহিলা আসলেই তাকে জিজ্ঞেস করা শুরু করে দেয় যে, অমুকে আমার ব্যাপারে কী কী বলেছিল! যেন তার অপেক্ষাতেই প্রহর গুণছিল। আগন্তুক যদি বলে দেয় যে, অমুক তোমার ব্যাপারে এই এই বলেছে, তাহলে তো সে কোমর বেঁধে ফেলে।
ভালো করে বুঝে নিন, গীবত থেকেই সৃষ্টি হয় অনৈক্য ও ঝগড়া। পরস্পরে শত্রুতা তৈরি হয়। তা ছাড়া গীবত করা ও শোনা খোদ কবিরা গুনাহ। কুরআনে কারীমে এ ব্যাপারে অনেক নিন্দা করা হয়েছে।[২৭৫]

পুরুষদের মাঝে ঝগড়া লাগানো

অনেক সময় মহিলাদের ঝগড়ার ফলাফল অনেক তীব্র হয়ে যায়। নিজেদের ঝগড়ার কথা পুরুষদের কাছে বর্ণনা করে দেয়, অমুকে আমার ব্যাপারে এই এই বলেছে আর তোমার ব্যাপারে এই এই বলেছে। তখন পুরুষদের গরম স্বভাবের কারণে তাদের মাঝে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। ফলে

---

[২৭৪] *গাওয়াইলুল গযব*, ২৮৪।
[২৭৫] *হুকুকুয যাওজাইন*, ৩৪৪।

বিষয়টি আর কথা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং হাতাহাতির পর্যায়ে চলে যায়। যার কারণে হত্যা ও খুন পর্যন্ত সংঘটিত হয়।[২৭৬]

মহিলাদের পরস্পর ঝগড়া

মহিলাদের অভ্যাস হলো, কারও সাথে রাগের সামান্য বাহানা পেয়ে গেলে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তা ভুলতে পারে না। এর শাখা থেকে প্রশাখা বের করতে থাকে। তার মনের বিদ্বেষ কোনোভাবেই বের হতে চায় না। কোনো পরিবার এমন নেই, যার মহিলারা এই রোগে আক্রান্ত নয়। মা ও মেয়ে পরস্পরে ঝগড়া করে। বউ-শাশুড়ি ঝগড়া করে। আর ননদ তো জন্মই নিয়েছে ঝগড়া করার জন্য।

লক্ষ করলে দেখা যায়, এ জাতীয় ঝগড়াঝাঁটির মূল ভিত্তি হলো স্রেফ ধারণাপূজা। কারও ব্যাপারে সামান্য সন্দেহ হলেই তার ব্যাপারে বিধান লাগিয়ে ঝগড়া শুরু করে দেয়। দ্বিতীয় পক্ষ যখন ঝগড়া দেখে তখন তাদের মধ্যে সন্দেহের আরও বেশি সুযোগ তৈরি হয়। তখন একদিক থেকে এক সের ঝগড়া হলে অন্যদিক থেকে পাঁচ সের ঝগড়া হওয়া কোনো ব্যাপার না। কিন্তু যখন পুরো বিষয়টি তদন্ত করা হয় তখন দেখা যায়, বিষয়টি শুধু এতটুকু ছিল যে, অমুকে বলেছিল, অমুক মহিলা তোমার নামে এই অভিযোগ করে; আর শ্রোতা মহিলা বলে, আমার প্রতিবেশী মহিলার প্রতি আমার অনেক বিশ্বাস আছে, সে না শুনে কোনো কথা বলে না!

পরিবারগুলোতে এ জাতীয় কথার মাধ্যমেই ঝগড়া হয়ে থাকে। আল্লাহর কোনো বান্দির এই সুমতি হয় না যে, কারও মুখ থেকে কোনো অভিযোগ শুনে মাঝখানের মধ্যস্থতাকে টপকে গিয়ে সরাসরি অভিযোগকারীর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করবে, আমার ব্যাপারে তোমার কী অভিযোগ!

এ ক্ষেত্রে সুন্নত পদ্ধতি হলো এই, যদি কারও ব্যাপারে অন্তরে কোনো অভিযোগ বা কথা থাকে, তাহলে সরাসরি তার কাছেই তা ব্যক্ত করা যে,

---

[২৭৬] *আল ইনসিদাদ লিল ফাসাদ*, ৩২৭।

আমার অন্তরে তোমার ব্যাপারে এই অভিযোগ বা কথা আছে। তাহলে সরাসরি তার থেকেই এর উত্তর পাওয়া যাবে। আর যদি এই অভিযোগ ভুল হয়, তাহলে একেবারেই সমাধান হয়ে যাবে।

পক্ষান্তরে উড়ন্ত কথাবার্তা শোনা এবং তা বিশ্বাস করে তার ব্যাপারে বিধান আরোপ করে দেওয়া শরীয়ত-পরিপন্থি এবং মূর্খতার পরিচায়ক। এই স্থানের জন্যই কুরআনে কারীমে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ

তোমরা মন্দ ধারণা থেকে বেঁচে থাকবে। কেননা অনেক মন্দ ধারণার কারণে গুনাহ হয়। (সূরা হুজুরাত, ৪৯ : ১২)

হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা মন্দ ধারণা থেকে নিজেদের রক্ষা করবে। কেননা মন্দ ধারণা অনেক কুৎসিত মিথ্যা।[২৭৭]

আমি সারা জীবন অভিজ্ঞতায় দেখেছি, উড়ন্ত কথা খুব কমই সত্য হয়। এক ব্যক্তি বলেছিলেন, যে সমস্ত ঘটনার সাথে বর্ণনাকারীর ব্যক্তিগত সম্পর্ক না থাকে এবং বর্ণনাকারীও সত্যবাদী হয়ে থাকে, এমন বর্ণনার মধ্যেও আমি দেখেছি যে, তদন্ত করার পর এক-চতুর্থাংশ কথা সত্য বের হয়। তাহলে ওই সমস্ত ঘটনার ব্যাপারে কী বলব, যার বর্ণনাকারী মিথ্যাবাদী এবং বর্ণনার যার স্বার্থও বিদ্যমান!

পারিবারিক যত লড়াই-ঝগড়া হয়ে থাকে, সবগুলোই এ জাতীয় মেথর ভাঙ্গি ইত্যাদি মহিলার বর্ণনার ওপর ভিত্তি করেই হয়ে থাকে, যার কোনো ভিত্তিমূল থাকে না। বর্ণনাকারী মহিলারা তার মধ্যে কিছুটা সংযুক্ত করে, যার দ্বারা এই ধারণা তৈরি হয় যে, অমুক আমাদের বিরোধী। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে শ্রোতা মহিলাও বর্ণনার মধ্যে কিছুটা সংযুক্তি করে। ফলে কঠিন একটা ঝগড়ার পরিবেশ তৈরি হয়ে যায়।

---

[২৭৭] *সহীহ বুখারী*, হাদীস নং ২৭২৪।

উদাহরণস্বরূপ রাতের বেলা কেউ একাকী জঙ্গলে গেল। তার মনে রয়েছে বাঘের ভয়। সে যখন কোনো একদিকে মনোযোগ দিয়ে তাকায়, তখন একটি গাছকে তার বাঘ মনে হয়। তারপর যখন তার কল্পনা আরেকটু উন্নত হয়, তখন সেই কল্পনার চিত্রে হাত-পাও দৃষ্টিগোচর হতে থাকে এবং একটি জীবন্ত বাঘ সেখানে দাঁড়িয়ে যায়। অথচ বাস্তবে সেখানে কিছুই থাকে না, পুরোটাই শুধু কল্পনার কর্মফল। ঠিক তেমনই উড়ন্ত কথাবার্তার মধ্যে মানবমন নিজ থেকে কিছু বানোয়াট কথা যুক্ত করে। বর্ণনাকারী থেকেই প্রথমে কিছুটা রেশ লাগিয়ে দেওয়া হয়। শ্রোতা যেহেতু পূর্ব থেকেই দোষ খোঁজার জন্য উদগ্রীব ছিল, সে সামান্য রেশ পেয়েই তার মধ্যে পূর্ব-পরের তাজা কল্পনাগুলোকে বাস্তবের সাথে মিশিয়ে দেয়। ফলে একটি সুগঠিত অভিযোগ রূপ লাভ করে।

মহিলাদের স্বচক্ষে দেখা বিষয়ও তো অনেক সময় বিশ্বাসযোগ্য থাকে না। অধিকাংশ মহিলা নিজের ননদ প্রমুখের স্বচক্ষে দেখা বিষয়ের প্রতিও নারাজ হয়ে যায়। পরবর্তীতে যখন তাদের বোঝানো হয় এবং বলা হয় যে, যে কারণে তুমি রাগ করেছ বিষয়টি আসলে এমন নয়, তুমি ভুল বুঝেছ; তখন সে বলে ওঠে, আমি কি বাচ্চা নাকি, আমি কি কিছু বুঝি না! ওই কাজ আমার ক্ষতি করার জন্যই করা হয়েছিল। এরপর তাকে হাজার বার বোঝালেও তার মনের অবস্থা আগের মতোই থাকে। মনের মধ্যে তা গোপন করে লালন করতে থাকে। যার ফলে কিছুদিনের মধ্যেই পরস্পরে বিদ্বেষ তৈরি হয়। এখন উভয়ে গীবত শুরু করে দেয় এবং ওকে অন্যের দোষ খোঁজা ও অন্যকে নিচু করার ক্ষেত্রে চেষ্টার কোনো কমতি করে না। এ সবকিছুই হলো রাগের ফসল। মহিলারা বেশিরভাগ রাগের কাছে পরাভূত হয়ে থাকে।[২৭৮]

ভাবির রাগ; দেবর ও এতিমের প্রতি অবিচার

অনেক সময় এমন হয়, পরিবারের মুরব্বি ছোট ও বড় বড় সন্তান রেখে মারা যায়। ফলে ছোট সন্তানরা বড় ভাইদের প্রতিপালনে চলে আসে। যেহেতু বাচ্চারা অধিকাংশ সময় ঘরেই থাকে, তাই তাদের দেখভাল

---

[২৭৮] *গাওয়াইলুল গযব*, ২২৪।

ইত্যাদির দায়িত্ব মহিলাদের হাতেই আসে। ভাবি এই দায়িত্ব লাভ করে। বড় ভাই তো কাজের কারণে বাহিরে থাকে। এদিকে ভাবি সাহেবা মনের ক্ষোভ তাদের ওপর ঝাড়তে থাকে। কথায় কথায় মারা, গালিগালাজ করা, খোটা দেওয়া, পেট ভরে খানা না দেওয়া, কাপড়-চোপড়ের খোঁজ না নেওয়া এবং চাকর-বাকরদের চেয়েও নিচু করে রাখা—এসব আচরণ করে। এতেও ক্ষান্ত হয় না; বরং শুরু থেকেই স্বামীর কাছে তাদের ব্যাপারে উল্টাপাল্টা অভিযোগ করতে থাকে। মোটকথা, এমন অমানবিক আচরণ তাদের সাথে করে যা বর্ণনা করা অসম্ভব।

আমি পুরুষদের উদ্দেশে বলে থাকি, নিজেও এতিম বাচ্চাদের দেখভাল করুন। মহিলাদের কথার ওপর এত বিশ্বাসী হয়ে যাবেন না যে, তাদের সব কথাই সত্য মনে করবেন। এ কথা যেহেতু একেবারে স্পষ্ট যে, ভাবি দেবরের সাথে পরের মতো সম্পর্ক রাখে, তাহলে তার ব্যাপারে ভাবির কথার গ্রহণযোগ্যতাই-বা কতটুকু! আমি তো বলি, এই পরিস্থিতিতে পুরুষদের উচিত মহিলাদের বলে দেওয়া যে, তুমি সত্যি বললেও আমি মনে করব মিথ্যা বলছ।

আমি সকল পুরুষের নিন্দা করছি না। অনেক পুরুষ এমন আছে যারা বাস্তবেই পুরুষ এবং এমন পরিস্থিতিতে বিবেক খাটিয়ে কাজ করে। ভাবির তত্ত্বাবধানে বাচ্চা দেবরকে নেকড়ে ও বকরির একত্রে থাকার মতো মনে করে। নেকড়ে ও বকরি একত্রে থাকলে নেকড়ের পক্ষ থেকেই বকরিকে কষ্ট দেওয়া হয়ে থাকে। কখনো এমন কথা বলা যায় না যে, নেকড়ে বকরির সাথে ভালো আচরণ করেছে কিংবা তার প্রতি দয়া করেছে।

মহিলাদের কথার ফাঁদে পড়ে ভাইদের কষ্ট দেবেন না। কেউ কত চমৎকার বাস্তব কথা বলেছে, এতিম বাচ্চাদেরকে জীবিতদের মাঝে গণ্য করা হয় না। বাবা-মার সাথে সাথে তারাও মৃতের খাতায় নাম লিখিয়েছে। তাহলে মৃতকে মারার মধ্যে কী বীরত্ব! যদি সীমাতিরিক্ত দিলদারি দেখান, তবুও তার মন জীবিত হবে না। এতিমের জীবনে সব সময় মৃত্যু ছেয়ে থাকে। দুটি বাচ্চাকে একত্রে বসান; একজন এতিম, আরেকজন এতিম নয়। এবার তাদের সামনে একটি জিনিস রেখে বলুন, যে আগে ওঠাবে

এটা তার। পূর্ণ বিশ্বাসের সাথে বলা যায় যে, এতিমের হাত উঠবে না; কারণ তার মন মরে গেছে।[২৭৯]

ঝগড়া-বিবাদ থেকে বাঁচার উত্তম পদ্ধতি

১। পুরুষদের উচিত মহিলাদের কথার ওপর অন্ধ বিশ্বাস না করা। আর মহিলাদের উচিত পুরুষদের কাছে এমন বিষয় না বলা, যার কারণে রাগের উদ্রেক ঘটে।

২। কারও ব্যাপারে কোনো অভিযোগ শুনলে মনে করবেন যে, বর্ণনাকারী এক কথার সাথে দশটি ভুল কথা মিশিয়ে বর্ণনা করেছে। যদি আমি স্বচক্ষে দেখে বদলা নিতাম, তাহলে একটি খারাবির পরিবর্তে একটি খারাবি হতো, আর এখন বদলা নিলে দশটি খারাবি হবে, তাহলে এর ফলাফল কী হবে! এটা এমন হয়ে যাবে যে, কেউ আমার এক টাকার ক্ষতি করল আর আমি তার দশ টাকার ক্ষতি করলাম। এই মামলা যখন বিচারকের কাছে যাবে, তখন প্রাথমিক অন্যায় তার হলেও বিচারটা আমার কাঁধেই আসবে।

উদাহরণস্বরূপ কারও ব্যাপারে শুনলেন যে, সে আপনার ব্যাপারে গীবত করেছে। প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য আপনিও তার গীবত করলেন। তাহলে এটা বদলাবদলি হয়ে গেল। এটা মেনে নেওয়া যায় যে, এখানে বদলাটা সংখ্যার দিক থেকে একেবারে পরিপূর্ণ বদলা হয়েছে। এক গীবত সে করেছে, বিনিময়ে আপনিও একটি গীবত করেছেন। কিন্তু এ কথার কী নিশ্চয়তা আছে যে, আপনার গীবত ধরনের দিক থেকে তার গীবতের তুলনায় বেশি হয় নি! অথবা ভবিষ্যতে বেশি হয়ে যাবে না!

অধিকাংশ সময় এমন হয়, যখন কারও ব্যাপারে অন্তরের কুধারণা বদ্ধমূল হয়ে যায়, তখন মানুষ তার থেকে শুধু বদলা নিয়েই ক্ষান্ত হয় না এবং বদলা নিলেই সেই কুধারণা অন্তর থেকে বের হয়ে যায় না; বরং ভেতরে বিদ্বেষ থেকে যায় অথবা হিংসা সৃষ্টি হয়। আর হিংসা-বিদ্বেষ স্তর হিসেবে গীবতের চেয়ে অনেক বেশি মন্দ। হিংসার ব্যাপারে হাদীসে বলা হয়েছে,

---

[২৭৯] *গাওয়াইলুল গযব*, ২২৭।

আগুন যেভাবে লাকড়িকে নিঃশেষ করে দেয়, হিংসাও ঠিক সেভাবে মানুষের সওয়াবকে ধ্বংস করে দেয়।[২৮০]

অতএব তার গীবতের পরিবর্তে আপনার মনে যে হিংসা তৈরি হলো, ধরন ও স্তর হিসেবে তা অনেক বড় এবং তা আপনার সওয়াবগুলোকে খেয়ে ফেলবে। এখানে কল্পনাশক্তিকে কাজে লাগান এবং মনের বিরুদ্ধে গিয়ে চিন্তা করুন যে, আমি যদি তার গীবতের বদলা নিতে গিয়ে এত বড় ক্ষতির মধ্যে পড়ে যাই, তাহলে এর ফলাফল কত নিকৃষ্ট হবে! এই চিন্তা করে একটু ভয় করুন।[২৮১]

পারিবারিক ঝগড়া থেকে বাঁচার উপায়

পারিবারিক ঝগড়া-বিবাদ থেকে বাঁচার একটি উত্তম উপায় হলো এই, কয়েকটি পরিবার এবং কয়েকজন মহিলা একত্রে থাকবে না। কেননা কয়েকজন মহিলার একত্রে থাকাই অধিকাংশ বিশৃঙ্খলার কারণ হয়ে থাকে।[২৮২]

আপনজনের সাথে লেনদেন না করাই নিরাপদ

একটি বিখ্যাত উক্তি রয়েছে : আপনজনের সাথে লেনদেন করো পরের মতো আর ওঠবস করো ভাইয়ের মতো। বর্তমানে যেহেতু আপনজন ও ভাইদের সাথে অপরিচিতের মতো লেনদের করা সম্ভব নয়, তাই আমি উক্তিটি মেরামত করে এভাবে বলি যে, লেনদেন করো পরদের সাথে আর মিলেমিশে থাকো আপনদের সাথে। অর্থাৎ আপনদের সাথে লেনদেনও করো না।

অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, আপনজনদের সাথে লেনদেন করলে অনেক সমস্যা সৃষ্টি হয়। সম্পর্ক নষ্ট হয়, অবিচার হয় এবং এক পক্ষকে ক্ষতির ভার ওঠাতে হয়।[২৮৩]

---

[২৮০] *আবু দাউদ*, হাদীস নং ৪৯০৩।
[২৮১] *গাওয়াইলুল গযব*, ২২৪।
[২৮২] *মালফুযাতে আশরাফিয়া*, ২৭।
[২৮৩] *আল ইফাযাতুল ইয়াওমিয়্যা*।

পনেরোতম অধ্যায়

নারীদের প্রথাপ্রীতি

প্রথা পালনের প্রতি নারীদের আকর্ষণ খুব বেশি। অবাক করার মতো। তারা প্রচলিত প্রথা ও বুঝের ওপর এতটাই অটল যে, তা পালন করতে গিয়ে দ্বীনের ক্ষতি তো বুঝেই না, দুনিয়ার ক্ষতির প্রতিও লক্ষ করে না। প্রথা ও নিজের জেদের সামনে যত ক্ষতিই হোক না কেন, তা তারা বাস্তবায়ন করে ছাড়বেই। এমনও কিছু নারী দেখা যায়, যাদের কাছে যথেষ্ট পরিমাণ সম্পদ ছিল, কিন্তু প্রথা পালন, বিয়ে-শাদিতে খরচ করে নিঃস্ব হয়ে গিয়েছে এবং সর্বদা কষ্টে জীবন কাটাচ্ছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, তবুও তারা রুসুম-রেওয়াজের খারাপ প্রভাবের বিষয়টি অনুধাবন করতে সক্ষম হয়নি। লোকদের সামনে বড়ত্ব প্রকাশ করে বলতে থাকে, 'আমি অমুক অনুষ্ঠানে এত এত টাকা খরচ করেছি, অমুকের বিয়ে অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণভাবে করেছি। আমাদের এসব টাকা-পয়সা আল্লাহ তাআলার দরবারে সঞ্চিত আছে।'

এগুলোর কতটুকু জমা আছে, তা চোখ বুঝতেই স্পষ্ট হয়ে যাবে। দুনিয়ার কষ্ট দুর্দশা যা সে ভোগ করছে, তাতেই তার ওপর কোনো প্রভাব পড়ছে না, সে আখেরাতের কথা কবে চিন্তা করবে, যা এখনো সে সরাসরি প্রত্যক্ষ করছে না।

এ সকল মহিলাদের মধ্যে একটি রোগ বাসা বাধে, যার ক্ষতি মারাত্মক। তা হলো, নারীরা খুবই প্রথাপ্রিয়। স্বামীর সম্পদকে খুবই নির্দয়ভাবে ওড়ায়। বিশেষ করে বিবাহ-শাদির অনুষ্ঠানে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে শখের বিষয়াদিতে ব্যয়ের ব্যাপারে কেবল নারীদেরই কর্তৃত্ব থাকে। পরবর্তীতে এর ফলাফল দাঁড়ায় এই যে, পুরুষ হয়তো সুদের সাথে সম্পৃক্ত হয় অথবা ঋণগ্রস্ত হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অধীনস্ত নারীদের অপচয় অপব্যয় পুরুষদের হারাম উপার্জনের প্রেরণা ও বড় কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যেমন : ঘরে বিয়ের উপলক্ষ্য এলে দামি পোশাকের দাবি আসে। এখানে পাঁচ-সাত হাজার খরচ হয়ে যায়। পুরুষ চিন্তা করে, যাক পাঁচ-সাত হাজারেই

বোঝা কেটে গেল। আবার দাবি আসে, এটা তো প্রথম দিন অমুক অনুষ্ঠানে পরব। দ্বিতীয় দিন বা অমুক সময় পরারটাও কিনতে হবে। এবার এখানেও অনুরূপ খরচ। এভাবে একের পর এক দাবি আসতেই থাকে আর খরচের পাল্লা ভারি হতেই থেকে।

এরপর পালা আসে উপঢৌকনের। এই লিস্ট তো কয়েক পৃষ্ঠাতেও শেষ হওয়ার না। এখানে মোটা অংকের বাজেটও হাওয়ায় মিশে যায়। এভাবে জামা-কাপড়, সাজ-সজ্জা ও অপ্রয়োজনীয় বিষয়াদিতেই খরচ হয়ে যায় হাজার হাজার টাকা।

যখন কারও বিয়ের ব্যপারে আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের মাঝে জানাজানি হয়, তখনই মেয়েদের মধ্যে নতুন জামা-কাপড়, অলংকার ও সাজসজ্জার সরঞ্জামাদির চিন্তা ঘুরপাক খেতে থাকে। কখনো স্বামীর কাছে আবদার আবার কখনো নিজেই দোকান থেকে বাকিতে ক্রয় করে নেয়। স্বামীর সামর্থ্যের প্রতি লক্ষ করা হয় না এবং তার অপারগতার প্রতিও সুদৃষ্টি দেয় না। অথচ বাস্তবতা হলো, এই সকল পোশাক-আশাক ও সাজসজ্জার সরঞ্জামাদি কেবল লোকদেখানো ও গর্ব প্রদর্শনের জন্যই হয়ে থাকে। আর এই উদ্দেশ্যে টাকা-পয়সা খরচ করা অপচয়। স্বামীর স্বাধ্যের বাহিরে অপ্রয়োজনীয় ফরমায়েশ করার অর্থ হলো তাকে কষ্ট দেওয়া। অপ্রয়োজনীয় চাহিদাগুলোর কারণে যদি স্বামীর মানসিকতায় পরিবর্তন আসে, সে হারাম উপার্জনের প্রতি মনোনিবেশ করে, কারও হক নষ্ট করে অথবা ঘুষ নেয়, তাহলে এ সকল পাপাচার ও হারামে লিপ্ত হওয়ার কারণ হলো এই স্ত্রী।

এ সকল রুসুম-রেওয়াজ পালন করতে গিয়ে মানুষ অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে। জায়গা-জমি বা মূল্যবান সম্পদ বিক্রি করে দেয়। আবার অনেকে সুদি ঋণে জড়াতেও পিছপা হয় না। সারকথা হলো, প্রথা পালন করতে গিয়ে বহু খারাবি ও গুনাহের মধ্যে লিপ্ত হতে হয়। যে বিষয়টি আবশ্যকীয় নয় তাকে আবশ্যক করা হচ্ছে, জরুরি নয় এমন বিষয়ের ফরমায়েশ করে কষ্ট দেওয়া হচ্ছে, নিজের প্রসিদ্ধি, অপচয়সহ অনেক অপছন্দনীয় বস্তুর সমন্বয় ঘটছে। এই জন্য তা শরীয়ত কর্তৃক নিষিদ্ধ বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত হবে।

নারীরা রুসুম-রেওয়াজ ও বিভিন্ন প্রথার শেকড়

বিবাহ-শাদির যাবতীয় বিষয়াবলির ভিত্তি হলো, লোকদেখানো মানসিকতা ও প্রসিদ্ধি অর্জনের আকাঙ্ক্ষা। যদিও পুরুষরাও গর্ব করে কিন্তু এ ক্ষেত্রে মূল নারীরাই। তারা এসব ক্ষেত্রে সিদ্ধহস্ত এবং পূর্ণ অভিজ্ঞ। খুব সহজেই অন্যদেরকে পড়াতে পারে। কোনো বিষয়ে পারদর্শী ব্যক্তি সে বিষয়ের মূলনীতি সম্পর্কে খুব ভালো জানে। সে একটি মূলনীতির মাধ্যমেই সবকিছু শিখিয়ে দিতে পারে। যখন নারীকে জিজ্ঞাসা করা হয়, বিবাহ অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে কী কী করতে হবে? সে ছোট্ট একটি বাক্য সহজেই বলে যে, খুব বেশি কিছু করতে হবে না, তবে নিজেদের অবস্থানের সাথে মানায় এমন কিছু তো করতেই হবে। এটি কেবল একটি বাক্য নয়, বরং একটি বিশাল মূলনীতি; হাতিও এর মধ্যে ঢুকে যাবে। সে তো সামান্য বাক্যটি বলে তার কাজে লেগে যায়, কিন্তু তা বাস্তবায়নকারী যখন ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করে, তখন তা এত দৈর্ঘ্য হয় যে, হাজারো শাখা-প্রশাখা বের হতে থাকে। যার কারণে দুনিয়াও ক্ষতিগ্রস্ত হয়, আখেরাতও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সে তো কেবল একটি বাক্য বলেছিল যে, নিজের অবস্থান অনুযায়ী করতে হবে। পরবর্তীতে ব্যাখ্যা বাড়তে বাড়তে এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে, হাজারো কবিরা গুনাহ সংঘটিত হতে থাকে।

মহিলাদের একত্রিত হওয়ার ক্ষতি

মাহিলাদের একত্রিত হওয়ার কারণে অনেক গুনাহের কাজ সংঘটিত হয়। যা প্রত্যেক দ্বীনদার ও চিন্তাশীল ব্যক্তি সহজেই বুঝতে পারেন। এ জন্য আমার মত হলো, মহিলাদের একত্রিত হওয়া উম্মুল মাফাসিদ তথা সমস্ত খারাবির মূল। এগুলো বন্ধ করা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

আমার মত হলো মহিলাদেরকে পরস্পরের সাথে মিলিত হতে দেবেন না। এক তরমুজের কারণে আরেক তরমুজের রং পরিবর্তন হয়। আমি নির্দ্বিধায় বলছি, মহিলাদেরকে এক জায়গায় সমবেতই হতে দেবেন না। হ্যাঁ, তবে শরয়ী কোনো প্রয়োজনে একত্রিত হতে সমস্যা নেই। তবে এ ক্ষেত্রেও স্বামীদের উচিত ঘরোয়া সাধারণ পোশাক পরিধান করেই সেখানে যেতে বলবে। সাজসজ্জা, দামি জামা-কাপড় থেকে বিরত রাখবে।

বিভিন্ন উপলক্ষ্য-অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে মহিলারা সমবেত হয়, এ সকল আয়োজনের অসংখ্য মন্দ দিক রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ নিম্নে কিছু তুলে ধরা হলো :

বিয়ে-শাদিতে মহিলাদের মন্দ কাজের বিবরণ

১। বড়াই করা মহিলাদের স্বভাবে পরিণত হয়ে গিয়েছে। নির্দ্বিধায় কোনো কামরায় প্রবেশ করে। ঘরে কোনো গায়রে মাহরাম পুরুষ থাকতে পারে—এর প্রতি কোনো ভ্রুক্ষেপই করে না। অথচ বাস্তবতা হলো, এ জাতীয় অনুষ্ঠান-আয়োজনে গাইরে মাহরামদের সামনে এসে যাওয়ার ঘটনা প্রায়ই ঘটে থাকে। কিন্তু মহিলারা ঘরে প্রবেশের পূর্বে যাচাই করে নেওয়ার ব্যাপারে খুবই উদাসীন।

২। ঘরে পৌঁছে উপস্থিত লোকদেরকে সালাম করে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে অনেকে মুখে আসসালামু আলাইকুম উচ্চারণ করা কষ্টকর মনে করে, শুধু হাত উঠানোকেই যথেষ্ট মনে করে। অথচ হাদীসে এরূপ করতে নিষেধ করা হয়েছে। আবার কেউ কেউ শুধু মাত্র 'সালাম' শব্দটুকু বলেই ক্ষান্ত হয়। এটিও সুন্নতের খেলাফ। কমপক্ষে আসসালামু আলাইকুম বলা উচিত। এবার আসি উত্তরে, বেঁচে থাকো মা! সুখী হও মা! শান্তিতে থাকো বোন! ইত্যাদি ইত্যাদি হাজারো শব্দ বলতে পারে, কিন্তু ওয়ালাইকুমুস সালাম বলা তাদের জন্য অনেক কঠিন। অথচ এটিই সবচেয়ে উত্তম দুআ।

৩। ঘরে প্রবেশ করে এমন জায়গায় বসবে যাতে সকলের দৃষ্টি তার ওপর নিবদ্ধ হয়। হাত, কান অবশ্যই দেখাবে। ঢাকা থাকলেও কোনো না কোনো বাহানায় বের করবে। সবাইকে দেখাবে, আমার কাছে এত এত অলংকার আছে। কারও দৃষ্টি না পড়লে কোনো না কোনো কৌশলে দেখাবেই এবং এই ভেবে প্রশান্তি অনুভব করে যে, সবাই বলবে, পরনে এত অলংকার থাকলে না জানি ঘরে আরও কতগুলো রয়ে গেছে।

৪। এরপর বৈঠক জমে উঠলে গল্পের ঝুড়ি খুলে দেওয়াই হলো গুরুদায়িত্ব, আর গীবতই হয়ে যায় প্রধান আলোচ্য বিষয়। যা মারাত্মক

হারাম ও নিষিদ্ধ কাজ। মহিলারা সাধারণত কনে বিদায় ও বরণের সময় সমবেত হয়ে থাকে।

৫। আলাপচারিতায় নিজের পোশাক-আশাক ও অলংকারের সৌন্দর্য প্রকাশের একটি অদৃশ্য প্রচেষ্টা বিদ্যামন থাকে। অঙ্গভঙ্গি, কথা, ইশারা সবকিছুতেই প্রবণতাটা থাকে, যা স্পষ্ট রিয়া ও হারাম।

৬। যেভাবে নিজের সাজসজ্জা ও অলংকার প্রদর্শন কওে, ঠিক সেভাবেই অন্যের প্রতিও লক্ষ করে। কারও মূল্যবান অলংকার বা পোশাক না থাকলে বা নিজের তুলনায় নিম্নমানের হলে তাকে তুচ্ছ ও হেয় মনে করে। নিজেকে শ্রেষ্ঠ ও সম্মানি ভাবে। এটি স্পষ্ট অহংকার ও কবীরা গুনাহ। আবার কাউকে নিজের থেকে বেশি জাঁকজমকপূর্ণ পেলে মনের মধ্যে লোভ, অকৃতজ্ঞতা ও হিংসার আবির্ভাব ঘটায়। এই তিনটিই কবীরা গুনাহ।

৭। খাবারের সময় শুরু হয় আরেক হুলস্থুল কাণ্ড। আল্লাহ হেফাজত করুন, একেকজন তিন-চারজন করে বাচ্চাসহ হাজির। প্রত্যেককেই ভরপুর খাওয়ায়। আয়োজকের সম্পদ ও সম্মানহানির প্রতি বিন্দু পরিমাণও ভ্রুক্ষেপ করে না।

৮। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ জাতীয় অনুষ্ঠানে অনর্থক ব্যস্ততার কারণে নামায ছুটে যায়। ছুটে না গেলেও সময়ের ব্যাপারে অলসতা করা হয়।

৯। যদি কখনো কোনো গায়রে মাহরাম ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় ঘরের দরজায় দাঁড়ায় বা ঘরের ভেতর দৃষ্টি দেয়, তাহলে মহিলাদের কেউ তাকে দেখে মুখ ফিরিয়ে নেয়, আবার কেউ মাথা নিচু করে নেয়, কেউ আড়ালে চলে যায়। বাস, এতেই তাদের পর্দা হয়ে গেল! অনুষ্ঠান শেষে স্থান ত্যাগের সময় ইয়াজুজ-মাজুজের মতো এমন তাড়াহুড়ো করে বের হতে থাকে যে, একজন আরেকজনের গায়ের ওপর পড়তে থাকে।

১০। কিছু হারিয়ে গেলে কোনো প্রমাণ ছাড়াই কাউকে অপবাদ দেওয়া হয়, গালমন্দ করা হয়। অধিকাংশ বিবাহ অনুষ্ঠানে উপর্যুক্ত মন্দ বিষয়াবলি পরিলক্ষিত হয়।

সাজসজ্জা, অলংকার ও পোশাক-আশাকের মন্দ দিক

১। বিপত্তি হলো, এক বিয়ের জন্য ক্রয়কৃত জামা-কাপড় অন্য বিয়ের সময় অচল হয়ে যায়। নতুন করে আবার জামা-কাপড় বানাতে বা কিনতে হবে। পোশাকের পর আসে অলংকারের পালা। যদি নিজের না থাকে তাহলে কারও থেকে ধার নিয়ে পরতে হয় এবং ধার নেওয়ার বিষয়টি সম্পূর্ণ গোপন রাখা হয়। নিজের মালিকানা বলেই জাহের করা হয়। এটি এক ধরনের মিথ্যা। হাদীস শরীফে এসেছে, যে ব্যক্তি লৌকিকতা করে নিজের কাছে নেই এমন জিনিস দ্বারা সচ্ছলতা প্রকাশ করে, তার উপমা ওই ব্যক্তির ন্যায়, যে মিথ্যা ও ধোঁকার দুটি পোশাক পরিধান করে। অর্থাৎ মাথা থেকে পা পর্যন্ত মিথ্যা আর মিথ্যা।

২। আবার অনেকে এমন অলংকারও পরে যাতে বাজনা হয়। চলতি পথে সকলের দৃষ্টি বাজনার দিকে নিবদ্ধ হয়। বাজনাবিশিষ্ট অলংকার পরা নিষিদ্ধ। হাদীস শরীফে এসেছে, প্রত্যেক বাজনার সাথে একটি করে শয়তান থাকে।

৩। অসচেতন কিছু নারী এমনও আছে যারা সুগন্ধি মেখে রাস্তায় বের হয়। এটি গায়রে মাহরামের সামনে সৌন্দর্য প্রদর্শনের অন্তর্ভুক্ত। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, যে নারী সুগন্ধি মেখে ঘর থেকে বের হয় সে এমন এমন। অর্থাৎ সে ভালো নয়, আযাবের উপযুক্ত হবে।

নারীদের মারাত্মক ভুল

অবাক করা বিষয় হলো, নারীরা ঘরে সাধারণ কাপড় পরে এলোমেলোভাবে থাকে। কিন্তু বাহিরে বের হওয়ার প্রয়োজন দেখা দিলেই মূহুর্তের মধ্যে সুন্দর পোশাক ও সাজগোজে লিপ্ত হয়ে যায়। অন্যদের দেখানো ছাড়া তাদের এই সুন্দর পোশাক ও সাজসজ্জার আর কী উদ্দেশ্য থাকতে পারে? আশ্চর্যের বিষয় হলো, যার কারণে এই কাপড়, যে মূল্য পরিশোধ করল, তার সামনে কখনো পরা হয় না, অন্যদের সামনে ঠিকই পরা হয়।

আফসোস! স্বামীর সাথে সর্বদা মুখ ভেংচিয়ে কথা বলা নারী, সুন্দর দামি কাপড়টি গায়ে না জড়ানো নারীটিই অন্যের সাথে কথা বলার সময় মিষ্টিভাষী কোমল কণ্ঠের অধিকারী হয়ে যায়, কোথাও যাওয়ার সময় একের পর এক সুন্দর পোশাকে নিজেকে সুসজ্জিত করে! ঘাম ঝড়ায় একজন আর সৌন্দর্য উপভোগ করে অপরজন, এটা কেমন ইনসাফ! লোকদেখানো মানসিকতা এই পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছে।

নববী এরশাদ ও গুরুত্বপূর্ণ একটি মাসআলা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি লোকদেখানোর উদ্দেশ্যে কাপড় পরিধান করে, আল্লাহ তাআলা কেয়ামতের দিন তাকে লাঞ্ছনার পোশাক পরিধান করাবেন।[২৮৪]

অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে নারীদের স্বাভাবিক এই কার্যক্রম দেখে কেউ কি বলতে পারবে তাদের নিয়ত সঠিক? নিয়ত সঠিক না ভুল এদিকে তাদের কোনো ভ্রুক্ষেপই থাকে না। এখানে কারও এমন ধারণা করার সুযোগ নেই, যখন কেউ কাপড় ক্রয় করে তখন একাধিক কাপড়ের মধ্যে ভালোটিই বেছে নেয়, তাহলে কি এগুলোকেও তাকাব্বুর-অহংকার বা লোকদেখানো মানসিকতা বলা হবে?

এই মূলনীতি স্মরণ রাখুন, নিজের মনকে খুশি করার জন্য কাপড় পরিধান করা মুবাহ। আর অন্যের দৃষ্টিতে বড় হওয়ার জন্য বা নিজের বড়ত্ব প্রকাশের জন্য পোশাক পরিধান করা নাজায়েজ। মহিলারাও স্মরণ রাখুন! যদি পরিধেয় জামা আসলেই ময়লা হয়ে যায়, তাহলে তা পরিবর্তন করে নেবেন। এতে কোনো সমস্যা নেই। তবে অবশ্যই সাদাসিধে জামা পরবেন। আর পরিধেয় পোশাক পরিচ্ছন্ন হলে পরিবর্তনের কোনো প্রয়োজন নেই। সাধারণ পোশাকেই দেখা-সাক্ষাৎ করবেন। এতে দেখা-সাক্ষাতের উদ্দেশ্য আদায় হয়ে যাবে এবং স্বভাবেরও সংশোধন হয়ে যাবে। আর যদি মনে এই ধারণার উদয় হয় যে, এভাবে চললে আমার অসম্মান হবে, তাহলে এর একটি উত্তর হলো : নফসের অসম্মান ও তুচ্ছ

---

[২৮৪] *সহীহ বুখারী*, হাদীস নং ৬৪৯৯।

হওয়াই তো উচিত। স্বস্তিদায়ক দ্বিতীয় উত্তর হলো : যখন কোনো সমাজে সাদাসিধেভাবে চলার অভ্যাস হয়ে যাবে, তখন আর এটাকে তুচ্ছ বা ছোট মনে করা হবে না।

কোনো পাঠক এমন ধারণা করবেন না যে, আমি ভালো পোশাক পরিধান করতে নিষেধ করছি। আমি ভালো পোশাক পরিধান করতে নিষেধ করি না, বরং ওই মন্দ ও গুনাহের কাজ থেকে নিষেধ করছি, যা এর সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তা হলো রিয়া, লোকদেখানো মনোভাব ও আত্মগৌরব। যে এ সকল মন্দ জিনিস থেকে বেঁচে থাকতে পারে, সে পরিধান করবে।

ভালো পোশাকের দুটি স্তর আছে : একটি হলো মন্দ না হওয়া, যা পরিধান করলে নিজের মন ভালো থাকে এবং অন্যের সামনে হেয় প্রতিপন্ন হতে হয় না। এমন পোশাক পরিধানে কোনো সমস্যা নেই। দ্বিতীয়টি হলো অন্যের তুলনায় জাঁকজমকপূর্ণ হওয়া, যাতে সবার দৃষ্টি নিজের দিকে নিবদ্ধ হয়, নিজের বড়ত্ব প্রকাশ পায় ইত্যাদি। এটি খারাপ ও নাজায়েজ।

প্রথা পালনে বৃদ্ধাদের অপতৎপরতা

অনেক মহিলা আমার কাছে মুরিদ হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে। আমি তখন রুসুম-রেওয়াজ পরিত্যাগ করার শর্ত আরোপ করি। তখন অনেকে বলে, আমার সন্তান-সন্ততি কিছুই নেই। আমি কি রুসুম-রেওয়াজ পালন করব? আমি বলি, করবেন না তো ঠিক আছে, কিন্তু বুদ্ধি পরামর্শ তো ঠিকই দেবেন! এ সকল বৃদ্ধা রুসুম-রেওয়াজের ব্যাপারে শয়তানের খালার ভূমিকা পালন করে। নিজে না করতে পারলেও অন্যদেরকে বুদ্ধি দেওয়ার ক্ষেত্রে এগিয়ে থাকে।

যাদের সন্তান নেই তারা নিজেরা রুসুম-রেওয়াজ পালন করে না, কিন্তু অন্যদেরকে শিক্ষা দেয়। তাদের উচিত ছিল, তাসবীহ নিয়ে জায়নামাযে বসে থাকা। তাদের তো কোনো চিন্তা নেই, আল্লাহ তাআলা চিন্তামুক্ত রেখেছেন। যদি তারা সময়ের মূল্য দিত, তাহলে তাদের জন্য কতই-না

কল্যাণকর হতো। কিন্তু তারা এমনটি কখনোই করে না। কাউকে বুদ্ধি পরামর্শ দেওয়া, কারও সমালোচনা করা, গীবত করা ইত্যাদি মন্দ কাজকে নিজের পেশা বানিয়ে নেয়।

স্মরণ রাখবেন, বেশি কথা বলার কারণে সম্মান বাড়ে না। এমন নারীরাই সম্মানের অধিকারী হয় যারা কম কথা বলে। যদি অনর্থক কথা না বলে নীরবে আল্লাহ তাআলার তাসবীহ জপে, যিকির করে, তাহলে আপনার জন্যই সম্মান ও উঁচু মর্যাদার কারণ হবে।

কিন্তু বেশি কথা বলা যার অভ্যাসে পরিণত হয়েছে, সে কি তা সহজেই ছাড়তে পারে?! অধিক কথা বলার কারণে কেউ তার কথার গুরুত্ব দেয় না, মনোযোগ দিয়ে শুনে না, বারংবার অপমানিত হয়, তবুও সে নিজেকে বারণ করতে পারে না। আমি বলি, যদি আপনি মুখ বন্ধ করে বসে থাকেন, তাহলে কার মাথা খারাপ হয়েছে যে, আপনার সাথে এসে তর্কে জড়াবে, ঝগড়া করবে? অধিকাংশ ফেতনা-ফ্যাসাদ ও গুনাহ কথার কারণেই হয়ে থাকে।

বাস্তবেই আমাদের অধিকাংশ গুনাহ জবানের কারণেই হয়ে থাকে। এই কথাটি নারী-পুরুষ সবারই স্মরণ রাখা উচিত। কিন্তু বর্তমান অবস্থা হলো, আলোচনা শুনে অশ্রু ঝড়ায়, চোখের জলে বুক ভেজায়। আফসোস করে বলে, হায়, আমাদের এ কী অবস্থা! আমাদের ঠিকানা কোথায় হবে?! সম্মানিত পাঠক, শুধু এ সকল আবেগ দ্বারা মুক্তি পাওয়া যাবে না। আমল করার দ্বারাই সমাধান হবে, আমলই মুক্তির পথ। সুতরাং আমল করুন, কথা কম বলুন।

রুসুম-রেওয়াজ দূর করার পদ্ধতি

১। এ সকল প্রথা প্রচলন দূর করার পদ্ধতি দুটি : একটি হলো, ভ্রাতৃপ্রতিম সকলে সম্মিলিতভাবে কুসংস্কারগুলো সমূলে উপড়ে ফেলবে। পরিত্যাগ করবে। এর দেখাদেখি অন্যরাও পরিত্যাগ করবে। পর্যায়ক্রমে পরিত্যাগকারীদের সংখ্যা ব্যাপক হয়ে যাবে। প্রথম পরিত্যাগকারীরা সবার

সওয়াব পেতে থাকবে। মৃত্যুর পরেও তার আমলনামায় সওয়াব জমা হতে থাকবে।

২। দ্বীনদারদের উচিত নিজেরা রুসুম-রেওয়াজ পালন করবেন না এবং যে অনুষ্ঠানে এসব প্রথা পালন হয় সে অনুষ্ঠানে শরিক হবেন না। স্পষ্ট অস্বীকার করে দেবে। প্রতিবেশী ও স্বজনদেরকে খুশি করতে গিয়ে আল্লাহ তাআলার অসন্তুষ্টির কোনো কাজ করবেন না।

৩। নিজের ওপর আবশ্যক করে নেবেন, কোনো পরহেজগার আলেমকে জিজ্ঞাসা করা ব্যতীত নিজের মনমতো কোনো কাজ করবেন না। এটি পরিপূর্ণ ঈমানদার হওয়ার উপায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না তার বাসনা আমার আনিত শরীয়তের অনুগত হবে।[২৮৫]

অনেকে বলে, আমরা তো দুনিয়াদার, আমরা কীভাবে শরীয়ত পালন করব? জনাব, যখন জান্নাত সামনে আনয়ন করা হবে তখন কি বলবেন যে, আমরা তো দুনিয়াদার, কীভাবে এতে প্রবেশ করব? ইসলামকে এমন ভীতিকর বিষয় বানিয়ে নিয়েছেন যে, লোকে ভাবতে বাধ্য হয় ইসলাম পালন করা দুনিয়াদারদের সামর্থ্যের মধ্যে নেই। অথচ ইসলাম অনেক সহজ, প্রশস্ত একটি দ্বীন।

রুসুম-রেওয়াজ দূর করার শরয়ী পদ্ধতি

রুসুম-রেওয়াজ দূর করতে হলে কর্মপদ্ধতি পরিবর্তন করা জরুরি। কর্মপদ্ধতি পরিবর্তন ব্যতীত অন্তর থেকে এগুলোর প্রতি আকর্ষণ দূর করা কঠিন। এ জন্য কর্মপদ্ধতি পরিত্যাগকারী তার চেষ্টা ও মেহনতের কারণে আল্লাহ তাআলার নিকট প্রতিদান প্রাপ্ত হবে।

একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তৈলাক্ত পাত্রে নাবিয (স্বল্প সময়ের জন্য পানিতে খেজুর ভিজিয়ে পানি সুমিষ্ট করা) বানাতে

---

[২৮৫] *বায়হাকী*, হাদীস নং ২০৯; *আস সুন্নাহ ইবনে আসিম*, ১৫।

নিষেধ করলেন। পরবর্তীতে তিনি আবার বললেন, আমি তোমাদেরকে তৈলাক্ত পাত্র ব্যবহার করতে নিষেধ করেছিলাম। এখন তোমরা তা ব্যবহার ও তাতে নাবিয বানাতে পারো। (কেননা পাত্র কোনো বস্তুকে হারাম বা হালাল করে না।)[২৮৬]

পাত্র ব্যবহারের অনুমতি প্রদানের সময় কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন, 'পাত্র কোনো বস্তুকে হালাল বা হারাম করতে পারে না।' এতৎসত্ত্বেও প্রথমে নিষেধ করার কারণ ছিল, এসব পাত্রে আগে মদ তৈরি করা হতো এবং লোকজন মদপানে অভ্যস্ত ছিল। এ জন্য নাবিয বানাতে গিয়ে হারাম মদের প্রতি আগ্রহ অনুভব হতে পারে অথবা সামান্য মাদকতা বা নেশা তৈরি হয়ে গেলে তাদের অনুভব করাটা কঠিন ছিল। এই জন্য সতর্কতাস্বরূপ তাদেরকে উক্ত পাত্র ব্যবহার ও তাতে নাবিয বানানো থেকেই বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পরবর্তীতে যখন তাদের স্বভাবে মদের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হয়েছে, সামান্য পরিমাণ নেশাও অনুভব করার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তখন তাদেরকে পুনরায় উক্ত পাত্র ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

বর্তমান প্রথাসমূহের অবস্থাও অনুরূপ। বাহ্যিক বৈধতা দেখে লোকজন এগুলো পালন করে থাকে। কিন্তু বর্তমান সময়ে এগুলোর মধ্যকার খারাবি ও গুনাহ সম্পর্কে সচেতন নয়, বরং জানেই না। এ জন্য সাময়িক সময়ের জন্য মূল কাজটি পরিত্যাগ করা ব্যতীত এগুলোর খারাবি দূর করার বিকল্প কোনো পদ্ধতি নেই। মূল আয়োজন বা উপলক্ষ্য ঠিক রাখবে আর মন্দ জিনিসগুলো আস্তে আস্তে দূরীভূত হয়ে যাবে—এটা আমাদের সাধ্যের মধ্যে নেই। যেখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাময়িক সময়ের জন্য মূল কাজ তথা পাত্র ব্যবহারকেই নিষেধ করে দিয়েছেন, সেখানে আমরা ভিন্ন তদবীর খুঁজে কীভাবে সমাধান করব? একটি সংস্কার-পদ্ধতির যৌক্তিকভাবে উপকারী এবং এর স্বপক্ষে নকলী তথা কুরআন-সুন্নাহের দলিলও পাওয়া গেলে সেটি বাদ দিয়ে ভিন্ন পন্থা খোঁজার প্রয়োজনীয়তাই-বা কী?

---

[২৮৬] *সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং ১৯৭৭।

রুসুম-রেওয়াজের বিরোধিতাকারী আল্লাহর ওলী ও প্রিয় বান্দা

অনেকে সমালোচনা ও গালমন্দের ভয়ে প্রথা পালন করে। কিন্তু যার শরয়ী বিধান মানার স্পৃহা থাকে সে কুসংস্কার ও প্রথা পরিত্যাগের ক্ষেত্রে কারও তিরস্কার বা সমালোচনার ভয় করে না। সাহসী মুসলমানের জন্য এটি সাধারণ একটি বিষয়। কিন্তু বর্তমানে কুসংস্কারের ব্যাপকতার কারণে পরিত্যাগকারী প্রশংসার যোগ্য হিসেবে বিবেচিত। এমন ব্যক্তিরা বর্তমান সময়ে আল্লাহ তাআলার প্রিয় বান্দা ও ওলীদের দলভুক্ত।

কুসংস্কার ও রুসুম-রেওয়াজে নিমজ্জিত ব্যক্তির ওপর আল্লাহ ও তার রাসূল সা.-এর লানত

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ছয় শ্রেণির ব্যক্তির ওপর স্বয়ং আল্লাহ তাআলা এবং তার ফেরেশতাগণ ও আমি লানত করি। এদের এক শ্রেণি হলো এমন ব্যক্তি, যে জাহেলী প্রথার প্রচলন ঘটায়। অন্য এক হাদীসে এসেছে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তিন ব্যক্তির ওপর আল্লাহ তাআলা সবচেয়ে বেশি ক্রোধান্বিত হোন। এদের একজন হলো, যে ব্যক্তি ইসলামে প্রবেশ করে জাহেলিয়াতের কাজ করতে চায়। এ বিষয়ে আরও বহু হাদীস রয়েছে।

একটু ভেবে দেখুন, প্রথা পালন করতে গিয়ে আপনারা ইসলামের বিরুদ্ধাচরণ করছেন না তো? আল্লাহর ওয়াস্তে কাফেরদের সংস্কৃতি ও কালচার পরিত্যাগ করুন।

সকল মুসলিমের দায়িত্ব

নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল মুসলমানের দায়িত্ব হলো, যাবতীয় কুসংস্কার ও বেহুদা রুসুম-রেওয়াজ দূর করার ব্যাপারে উদ্যোগী হওয়া। জান-প্রাণ দিয়ে চেষ্টা করবে যাতে একটি কুসংস্কারও অবশিষ্ট না থাকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জমানায় যেভাবে অতি সাধারণ ও সাদাসিধেভাবে আয়োজন হতো, এখনো যাতে সেভাবেই সম্পন্ন হয়। যে সকল নারী-পুরুষ সংস্কারের চেষ্টা অব্যাহত রাখবে, তারা অনেক

সওয়াবের অধিকারী হবে। হাদীস শরীফে এসেছে, সুন্নাহসম্মত পদ্ধতি বিলীন হয়ে যাওয়ার পর পুনরায় যারা সুন্নতের প্রচলন ঘটাবে, তাদের শত শহীদের প্রতিদান দেওয়া হবে।

নারীদের নিকট নিবেদন

নারীরা সচেষ্ট হলে সকল রুসুম-রেওয়াজ বিলীন হয়ে যাবে

আমি নারীদের নিকট আবেদন করে বলি, পুরুষদেরকে বাধা দেওয়া নারীদের দায়িত্ব। নারীদের বাধাদান অনেক কার্যকরী। কেননা এ সকল প্রথার মূল নিয়ন্ত্রক হলো নারীরা। যখন তারা নিজেরা বিরত থাকবে এবং পুরুষদেরকে বাধা দেবে, তখন নিমিষেই সকল প্রথা শেষ হয়ে যাবে।
এ ছাড়াও তাদের বচনভঙ্গি, কথা, চাহনি সবকিছুই সীমাহীন প্রভাবক হয়ে থাকে। তাদের কথা সরাসরি হৃদয়ে দাগ কাটে। এ জন্য যদি তাদের সদিচ্ছা থাকে, তাহলে খুব দ্রুতই বাধা দিতে এবং পরিত্যাগ করাতে সক্ষম হয়।

নারীদের কিছু ত্রুটি এবং জরুরি সংশোধন

এখানে নারীদের সাথে সম্পৃক্ত কিছু বিষয় উল্লেখ করব, যেগুলোর ব্যাপারে নারীদের উদাসীনতা অনেক বেশি পরিমাণে পরিলক্ষিত হয় :

১। নারীদের মধ্যে নামাযের গুরুত্ব অনেক কম। যদি নামায ছাড়তে হয় তাহলে পানাহারও ছেড়ে দিন। কিন্তু বাস্তবতা হলো, পাঁচ ওয়াক্ত নামায কাযা হয়ে যায়, এদিকে কোনো ভ্রুক্ষেপই নেই, কিন্তু খাবার একবেলাও বাদ যায় না।

২। নারীদের আরেকটি ব্যাধি হলো, যাকাত আদায় করার অভ্যাস নেই। অলংকারের ব্যাপারে তাদের ধারণা, এটি তো ব্যবহারের বস্তু এতে যাকাত আবশ্যক হবে কেন? খুব ভালো করে স্মরণ রাখুন, সোনা ও রুপার অলংকারেও যাকাত ফরয।

৩। আরেকটি ত্রুটি হলো, নারীরা হজ করে না। তাদের হজের বিষয়েও সচেতন হওয়া উচিত। গুরুত্ব দেওয়া জরুরি। এখন তো হজে যাওয়া অনেক সহজ। হজ পরিত্যাগকারীর ব্যাপারে হাদীসে অনেক শাস্তির কথা বর্ণিত রয়েছে।

৪। নারীদের অরেকটি বিশেষ ব্যাধি হলো স্বামীর অবাধ্যতা করে। হ্যাঁ, কিছু পুরুষও জুলুম করে। কিন্তু অনেক নারীর সাথে যথেষ্ট পরিমাণ সুন্দর ব্যবহারের পরও স্ত্রী স্বামীর সাথে দুর্ব্যবহার করে। উপমহাদেশের নারীদের স্বামীর খেদমতের বিষয়টি অস্বীকারের সুযোগ নেই। কিন্তু তাদের আচরণের সারাংশ হলো, দেহকে প্রশান্তি দেয় কিন্তু হৃদয়কে ক্ষতবিক্ষত করে। তাদের জবান লাগামহীন। মনে যা আসে তা-ই বলতে কুণ্ঠাবোধ করে না। এতে স্বামীর হৃদয় কষ্টে জর্জরিত হয়। এই ব্যাধির সহজ নিরাময়-পদ্ধতি হলো জবান বন্ধ রাখুন। শুরুতে যদিও কষ্ট হবে, কিন্তু অভ্যাসে পরিণত হলে এই সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। এটিই হলো আসল চিকিৎসা। কতিপয় মহিলা স্বামীকে অনুগত করার জন্য পানি পড়া, লবণ পড়া নেয়। এটা সমাধান নয়।

৫। আরেকটি ব্যাধি হলো : পর্দার প্রতি যত্নশীলতার অভাব। অধিকাংশ পরিবারেই দূর-দূরান্তের আত্মীয়-স্বজনদের সাথে পর্দার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না। আশ্চর্যের বিষয় হলো, এ সকল নারীরা নিজেদেরকে পর্দাশীল মনে করে, আর যারা বাহিরে ঘুরাফেরা করে তাদেরকে বেপর্দা নারী মনে করে। অথচ প্রকৃত পর্দানশীন নারী তারাই, যারা শরীয়ত পর্দা করতে নির্দেশ দিয়েছে এমন সবার সাথেই পর্দা করে। শরীরের পর্দার সাথে সাথে কুরআনে এই নির্দেশনাও দেওয়া হয়েছে যে, গায়রে মাহরাম পুরুষদের সাথে কোমল কণ্ঠে কথা বলা যাবে না। এটি হলো আওয়াজের পর্দা।

৬। নারীদের পোশাকের ব্যাপারেও সচেতন থাকা জরুরি। শরীয়তের নির্দেশনা মেনে পোশাক পরিধান করবে। ছোট, আঁটোসাঁটো পোশাক, যার ভেতর থেকে দেহাবয়ব বোঝা যায়, এমন পোশাক পরিধান করবে না।

৭। বর্তমানে নারীরা ফ্যাশনের প্রতি অনেক গুরুত্ব দেয়। বিজাতীয় বেশভূষা ধারণ করে। পুরুষের পোশাক পরিধান করে। হাদীস শরীফে এসেছে, এ সকল নারীদের ওপর আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হয়।

৮। অনেক মহিলা ঘরের কাজ করে না। ঘরের জিম্মাদারি পালন করতে অনীহা প্রকাশ করে। হাদীস শরীফে আছে, মহিলারা ঘরের দায়িত্বশীল। কেয়ামতের দিন ঘরোয়া বিষয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে।[২৮৭] ঘরোয়া কাজগুলো করতে হবে। ঘরে মালামাল-আসবাবপত্রের ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে, যাতে নষ্ট বা হারিয়ে না যায় অথবা চুরি না হয়ে যায়।

৯। নারীদের মারাত্মক আরেকটি ব্যাধি যা বড় ফেতনার কারণ, তা হলো, রুসুম-রেওয়াজ, কুসংস্কার ও প্রথা পালনের ক্ষেত্রে খুবই সিদ্ধহস্ত। আশ্চর্যের বিষয় হলো, অধিকাংশ পুরুষও তাদের অনুগামী হয়ে যায়।

১০। চালচলনের ক্ষেত্রে একেবারে উদাসীন। অধিকাংশ নারী পর্দার প্রতি পূর্ণ সচেতন না। মাথা খুলে রাখা সাধারণ নিয়মে পরিণত হয়েছে। বিশেষত মাথার সামনের অংশ ঢাকা কেমন যেন আবশ্যকীয়-ই নয়।

১১। অনেক নারী এমন অলংকার পরিধান করে যাতে বাজনা হয়। স্মরণ রাখবেন, এমন অলংকার পরিধান করা জায়েজ নেই।

নারীদের মাধ্যমে ফেতনা-ফ্যাসাদ তৈরি হওয়ার কিছু কারণ

১। পর্দার ব্যাপারে উদাসীনতা ও পর্দাহীনভাবে চলা। এটি ফেতনার গুরুত্বপূর্ণ একটি উপাদান।

২। একাধিক পরিবারের নারীদের একসাথে থাকা ঝগড়া-বিবাদের কারণ। পারিবারিক বা ঘরোয়া বিবাদ থেকে বেঁচে থাকার উত্তম পন্থা হলো, প্রত্যেক পরিবারের জন্য আলাদা থাকার ব্যবস্থা করা। এক ঘরে বসবাস না করা। বিশেষ করে পানাহার সামগ্রী (চুলা) ইত্যাদি আবশ্যকীয়ভাবে পৃথক পৃথক থাকা উচিত। বর্তমান সময়ের চাহিদা হলো, যদি স্ত্রী

---

[২৮৭] *সহীহ বুখারী*, হাদীস নং ৫২০০।

একসাথে থাকতে সম্মত হয়, পৃথকভাবে থাকলে আত্মীয়-স্বজন অসন্তুষ্ট হয়, তবুও কল্যাণ পৃথক থাকার মধ্যেই। এতে হাজারো মন্দ বিষয়ের দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। কিছুদিন হয়তো আত্মীয়-স্বজনরা মুখ বেজার করে রাখবে, কিন্তু যখন এর ভালো দিকগুলো অনুধাবন করতে সক্ষম হবে, তখন সবাই বাহবা দেবে।

৩। স্বামী-স্ত্রীর মাঝে মনোমালিন্যতা, কলহ-বিবাদ সকল অনিষ্টের মূল। হাজারো ফেতনা এর থেকে জন্ম নেয়।

নারীদের কিছু মন্দ অভ্যাস

অনেক নারী নিম্নোক্ত মন্দ বিষয়গুলোর সাথে জড়িত :

১। প্রতি মাসে মাসিক থেকে পবিত্র হওয়ার পর গোসলে বিলম্ব হওয়ার কারণে ছুটে যাওয়া নামাযগুলো পরবর্তীতে কাযা আদায় করে না।

২। রোযার হক আদায় করে না। অনর্থক ও গুনাহ হয় এমন কথাবার্তা ও আলাপচারিতায় রোযাকে নষ্ট করে ফেলে।

৩। অনুরূপ যাকাত, হজ ও কুরবানীর ক্ষেত্রেও অনেক উদাসীনতা প্রদর্শন করে।

৪। পর্দার ব্যাপারে যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন করে না। যে সকল নিকটাত্মীয় ও প্রতিবেশীদের সাথে পর্দা করা ফরয, তাদের সাথে পর্দা করে না। অন্যান্য নারী বিশেষত অমুসলিম নারীদের সামনে মাথার চুল, হাতের কনুই, পায়ের গোছা ইত্যাদি ঢাকার ব্যাপারে যত্নবান হয় না।

৫। নারীদের মধ্যে আল্লাহ তাআলার যিকিরের অভ্যাস অনেক কম। নামাযের সাথে কিছু যিকির-আযকার করা উচিত। যিকিরের বরকতে অন্তর আল্লাহ তাআলার দিকে ঝুঁকে থাকে। নামাযে মনোযোগ বসে। যিকিরের সাথে অল্প সময় মৃত্যুর মুরাকাবা (ধ্যান) করা অনেক উপকারী।

নারীদের প্রতি গুরুত্বপূর্ণ কিছু নসীহত

১। সকল আকিদা-বিশ্বাস ঠিক করবেন। আকিদা-বিশ্বাস ঠিক রাখা ঈমানের জন্য জরুরি বিষয়। আবশ্যকীয় মাসআলা-মাসায়েলগুলো শিখবেন এবং গুরুত্ব সহকারে আমল করবেন।

২। সকল কাজে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নতের অনুস্মরণ করবেন। এতে অন্তরে নূর সৃষ্টি হবে।

৩। শিরকের আশপাশেও যাবেন না। কোনো কাজ বা অবস্থাকে কুলক্ষণ মনে করবেন না।

৪। সন্তান ভূমিষ্ট হওয়া বা জীবিত থাকার জন্য রশিতে গিঁট দেওয়া বা মাজারে যাওয়া ইত্যাদি শিরকী কাজ করবেন না।

৫। বুযুর্গদের নামে কোনো মানত করবেন না।

৬। শরীয়ত যার সাথে পর্দা করতে বলেছে তার সাথে পর্দা করবেন। পীর-বুযুর্গ, দেবর, চাচাতো ভাই, ফুফাতো ভাই, খালাতো ভাই, মামাতো ভাই, ভগ্নিপতি, ননদের স্বামী, বানানো ভাই, বানানো বাবা, উকিল বাবা সবার সাথেই পর্দা করতে হবে।

৭। শরীয়ত-বিরোধী পোশাক পরিধান করবেন না। যে সকল পোশাকে পেট, পিঠ, বাহু, গোছা খোলা থাকে, সেগুলো পরিধান করা থেকে বিরত থাকবেন। অনুরূপ পাতলা ও আঁটোসাঁটো পোশাক যা পরিধান করা সত্ত্বেও শরীরের অবয়ব দেখা বা বোঝা যায়, তা পরিধান থেকে বিরত থাকবেন।

৮। সাদাসিধে ঢিলেঢালা লম্বা জামা বানাবেন। অনুরূপ বড়সড়ো ওড়না পরিধান করবেন।

৯। কাউকে উঁকিঝুঁকি দিয়ে দেখবেন না।

১০। বিবাহ-শাদির অনুষ্ঠান, বাজার, মেলা ইত্যাদিতে যাবেন না। এবং নিজের বাড়িতে এ জাতীয় কোনো আয়োজন করবেন না।

১১। নামকেওয়াস্তে দায়সারাভাবে কোনো কাজ করবেন না।

১২। গীবত-শেকায়েত, চোগলখুরি থেকে মুখে লাগাম লাগাবেন।

১৩। পাঁচ ওয়াক্ত নামায মনোযোগ ও গুরুত্ব সহকারে প্রথম ওয়াক্তেই পড়বেন। ধীরস্থিরভাবে রুকু-সাজদাহ আদায় করবেন।

১৪। সোনা বা রুপার অলংকার, নগদ টাকা সঞ্চিত থাকলে যথাযথ হিসাব করে যাকাত আদায় করবেন।

১৫। স্বামীর অনুগত্য করবেন। তার অগোচরে তার সম্পদ ব্যয় করবেন না। ঘরের কাজ বিশেষ করে স্বামীর খেদমত করা ইবাদত।

১৬। কখনো গান শুনবেন না।

১৭। প্রতিদিন কুরআনুল কারীম তিলাওয়াত করবেন।

১৮। কোনো বই পড়ার পূর্বে গ্রহণযোগ্য আলেমের সাথে পরামর্শ করবেন। তিনি পড়তে বললে পড়বেন।

১৯। কেউ কটু কথা বললে ধৈর্যধারণ করবেন। তৎক্ষণাৎ প্রতিক্রিয়া দেখাবেন না। বিশেষ করে রাগান্বিত অবস্থায় নিজেকে অনেক বেশি নিয়ন্ত্রণ করবেন।

২০। নিজেকে বড় মনে করবেন না।

২১। কোনো কথা বলার পূর্বে চিন্তা করবেন, যখন আশ্বস্ত হবেন যে কথাটি অসৎ নয় এবং উপকারী, তখন বলবেন।

২২। কোনো মন্দ ব্যক্তিরও দোষ চর্চা করবেন না এবং শুনবেনও না।

২৩। কোনো মুসলমানকে তুচ্ছ ভাববেন না, যদিও সে গোনাহ করে অথবা নিচু স্তরের হয়।

২৪। ধন-সম্পদ, মান-মর্যাদার প্রতি লালায়িত থাকবেন না।

২৫। অপ্রয়োজনে কারও সাথে মাখামাখি করবেন না। যখন সাক্ষাতের প্রয়োজন হবে তখন উত্তম ও ভদ্র আচরণ করবেন। কাজ শেষ হলে নিজ স্থানে ফিরে যাবেন এবং নিজ কাজে লিপ্ত হবেন।

২৬। তর্ক করে কথা বাড়াবেন না। নিজের ভুল বুঝতে পারলে সাথে সাথে স্বীকার করে নেবেন।

২৭। সর্বদা আল্লাহ তাআলার ওপর ভরসা করবেন। তাঁরই কাছে নিজ প্রয়োজন পেশ করবেন এবং দ্বীনের ওপর অবিচল থাকার দুআ করবেন।

ষোলোতম অধ্যায়

অধিকারসমূহের আলোচনা

মা-বাবার হক

মা-বাবার মাধ্যমেই সন্তান প্রতিপালিত হয়। সন্তানের ওপর তাদের অনেক অধিকার রয়েছে। নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো :

১। তাদের কষ্ট দেওয়া যাবে না, যদিও তারা বাড়াবাড়ি করেন।

২। কথায়, কাজে ও ব্যবহারে তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে হবে।

৩। জায়েজ কাজে তাদের আনুগত্য করতে হবে।

৪। তাদের টাকা-পয়সার প্রয়োজন হলে টাকা-পয়সা দিয়ে তাদের খেদমত করতে হবে, যদিও তারা কাফের হন।

৫। মা-বাবার ইন্তেকালের পর তাদের জন্য ক্ষমা ও রহমতের দুআ করতে থাকবে।

৬। নফল ইবাদত ও দান-সদকা করে তার সওয়াব তাদের জন্য পাঠাবে।

৭। তাদের পরিচিত মানুষদের সাথে সম্মানসূচক ব্যবহার করবে। তাদের প্রতিও অনুগ্রহ করবে এবং তাদের খেদমত করবে।

৮। তাদের ওপর কোনো ঋণ থাকলে কিংবা তারা কোনো জায়েজ কাজের অসিয়ত করে গেলে এবং তা আদায়ের সামর্থ্য থাকলে তা আদায় করবে।

৯। তাদের মৃত্যুর পর শরীয়তবিরোধী কান্নাকাটি ও আহাজারি থেকে বিরত থাকবে। এতে তাদের আত্মা কষ্ট পায়।

১০। মাঝে মাঝে তাদের কবর যিয়ারত করবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : দাদা-দাদি, নানা-নানিও শরীয়তে বাবার মতো। বাবার মতো তাদেরও একই অধিকার রয়েছে। তাদের অধিকারগুলো ভালো করে বোঝা উচিত। তদ্রূপ খালা ও মামা মায়ের মতো আর চাচা ফুফু বাবার মতো। হাদীসের ইশারা থেকে এমনটিই বুঝে আসে।[২৮৮]

সৎ মায়ের হক

সৎ মা হলেন বাবার প্রিয় বন্ধু। বাবার বন্ধুর সাথে উত্তম আচরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাই তার সাথেও উত্তম আচরণ করতে হবে এবং তার প্রতি অনুগ্রহ করতে হবে। পূর্বোল্লিখিত হকসমূহের কিছু হক তার জন্যও আদায় করতে হবে।

ভাই-বোনের হক

হাদীসে আছে, বড় ভাই বাপের মতো।[২৮৯] তাহলে ছোট ভাই সন্তানের মতো। অতএব তাদের মধ্যে পরস্পর ওই রকম অধিকার জারি হবে যেমনটা বাবা-মা আর সন্তানের মাঝে হয়ে থাকে। এভাবে বড় বোন আর ছোট বোনের হকও বুঝে নিতে হবে।

স্বামীর হক

১। তার সকল আদেশ পালন করতে হবে। তবে গুনাহের আদেশ দিলে তা পালন করতে হবে না।

২। তার সামর্থ্যের অধিক খরচা চাওয়া যাবে না।

৩। স্বামীর অনুমতি ব্যতীত কাউকে বাসায় আসতে দেওয়া যাবে না।

৪। তার অনুমতি ব্যতীত ঘর থেকে বের হওয়া যাবে না।

৫। তার অনুমতি ব্যতীত তার সম্পদ থেকে দান করবে না।

---

[২৮৮] *হুকুকুল ইসলাম*, ৭; *বেহেশতী জেওর*, ২৮৬।
[২৮৯] *তবারানী*, ১৯/২০০; *বায়হাকী*, হাদীস নং ৭৯৩০।

৬। তার অনুমতি ব্যতীত নফল নামায পড়বে না এবং নফল রোযাও রাখবে না।

৭। যদি সহবাসের জন্য ডাকে, তাহলে হায়েজ নেফাসের মতো শরয়ী ওজর না থাকলে 'না' করবে না।

৮। নিজের স্বামীকে তার দরিদ্রতা ও খারাপ চেহারার জন্য তুচ্ছ মনে করবে না।

৯। স্বামীর মাঝে শরীয়তের বিপরীত কোনো বিষয় দেখলে সম্মানের সাথে নিষেধ করবে।

১০। স্বামীর নাম ধরে ডাকবে না।

১১। কারও কাছে স্বামীর ব্যাপারে অভিযোগ করবে না।

১২। স্বামীর সাথে তর্কাতর্কি করবে না।

১৩। তার আত্মীয়-স্বজনের সাথে ঝগড়াঝাঁটি করবে না।

এ ছাড়াও আরও অনেক হক রয়েছে, এই মুহূর্তে মাথায় যা উপস্থিত ছিল তা-ই লিখে দিলাম।

স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক হক

স্বামীর দায়িত্ব

১। নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী স্ত্রীর ভরণপোষণ দিতে কার্পণ্য করবে না।

২। তাকে দ্বীনের মাসায়েল শেখাতে থাকবে এবং নেক আমলের প্রতি তাগাদা দিতে থাকবে।

৩। মাঝে মাঝে স্ত্রীকে তার আত্মীয়-স্বজনের সাথে সাক্ষাৎ করার সুযোগ দেবে।

৪। তার ভুলের ব্যাপারে ধৈর্য ধরবে এবং চুপ থাকবে। কখনো সতর্ক করার প্রয়োজন হলে মধ্যমপন্থায় সতর্ক করবে, বেশি কঠোরতা করবে না।

স্ত্রীর দায়িত্ব

১। স্বামীর আনুগত্য করবে। তাকে সম্মান করবে। তার খেদমত করবে। তাকে আনন্দ দেবে। তবে নাজায়েজ বিষয়ের আদেশ দিলে অপারগতা প্রকাশ করবে।

২। তার সামর্থ্যের চেয়ে বেশি কিছু দাবি করবে না।

৩। তার অনুমতি ব্যতীত তার সম্পদ ব্যয় করবে না।

৪। তার আত্মীয়-স্বজনের সাথে দুর্ব্যবহার করবে না, যাতে স্বামীর কষ্ট হয়। বিশেষত স্বামীর মা-বাবাকে নিজের মুরব্বি মনে করে সম্মান করবে।[২৯০]

আত্মীয়-স্বজনের হক

১। নিজের আপন আত্মীয়-স্বজন যদি গরিব হয় এবং উপার্জনের সক্ষমতা না রাখে, তাহলে সামর্থ্য অনুযায়ী তাদের ভরণপোষণ এবং প্রয়োজনীয় খরচের দায়িত্ব গ্রহণ করবে, যেভাবে নিজ সন্তানের দায়িত্ব বহন করে। আর যারা আপন আত্মীয় নয় তাদের ভরণপোষণ তেমন আবশ্যকীয় নয়; তবে তাদেরও কিছু সেবা করা জরুরি।

২। মাঝে মাঝে তাদের সাথে সাক্ষাৎ করবে।

৩। তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা যাবে না। তাদের থেকে কোনোভাবে কষ্ট পেলেও ধৈর্যধারণ করা উত্তম।[২৯১]

শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়দের হক

কুরআনে কারীমে আলাহ তাআলা নিজ বংশের সাথে শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়তার কথাও উল্লেখ করেছেন। তা থেকে বোঝা যায় যে, শ্বশুর-শাশুড়ি, শালা, জামাই, বউ এবং স্ত্রীর প্রথম সন্তানেরও কিছু হক রয়েছে।

---

[২৯০] *হকুকুল ইসলাম*, ১৪।
[২৯১] *হুকুকুল ইসলাম*, ৮।

তাই তাদের সাথেও অন্যদের তুলনায় বিশেষ অনুগ্রহ ও সম্মানের সম্পর্ক রাখা উচিত।[২৯২]

এতিম অসহায়দের হক

এতিম (যার বাবা নেই), বিধবা, অপারগ, দুর্বল, দরিদ্র, কর্মক্ষম, মুসাফির ও ভিক্ষুকদের হক আরও বেশি। তাদের আর্থিক সেবা করতে হবে। নিজে তাদের কাজ করে দেবে। তাদের মন রক্ষা করবে ও সান্ত্বনা দেবে। তাদের প্রয়োজন ও চাহিদাকে প্রত্যাহার করবে না।[২৯৩]

মেহমানের হক

১। তার আগমনের সময় আনন্দ প্রকাশ করা।

২। বিদায়ের সময় কমপক্ষে দরজা পর্যন্ত তার সাথে যাওয়া।

৩। তার প্রয়োজনীয় বস্তুর ব্যবস্থা করা, যাতে সে আরামে থাকতে পারে।

৪। বিনয়, সম্মান ও হাসিমুখে তার সাথে কথা বলবে; বরং নিজে তার সেবা করবে।

৫। কমপক্ষে একদিন তার জন্য মধ্যম পর্যায়ের ওপরে খাবারের ব্যবস্থা করবে। মেহমানেরও যেন কষ্ট না হয় এবং নিজেরও যেন কষ্ট না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখবে।

৬। কমপক্ষে তিনদিন তার মেহমানদারি করা। এটা তার হক। এরপর আরও কিছুদিন থাকলে সেটা মেজবানের অনুগ্রহ হবে।[২৯৪]

প্রতিবেশীর হক

১। তার সাথে দয়া ও যত্নমূলক ব্যবহার করবে।

২। তার স্ত্রী-সন্তানদের সম্মান রক্ষা করবে।

---

[২৯২] *হুকুকুল ইসলাম*, ১০; *বেহেশতী জেওর*, ৫/২৬।
[২৯৩] *হুকুকুল ইসলাম*, ১২।
[২৯৪] *হুকুকুল ইসলাম*, ১২।

৩। মাঝে মাঝে তার বাসায় হাদিয়া-তোহফা পাঠাবে। বিশেষত যখন তাদের অবস্থা খারাপ হবে, তখন অবশ্যই কিছু খানাদানা পাঠাবে।

৪। তাকে কষ্ট দেবে না।

৫। সাধারণ বিষয় নিয়ে তার সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হবে না।[২৯৫]

অমুসলিমদের হক

মুসলমান না হলেও তারা যেহেতু মানুষ তাই তাদেরও কিছু হক রয়েছে :

১। বিনা অপরাধে কাউকে জান-মালে কষ্ট দেবে না।

২। বিনা কারণে কারও সাথে খারাপ ভাষা ব্যবহার করবে না।

৩। কাউকে বিপদে, দরিদ্রতায় কিংবা অসুস্থতায় আক্রান্ত দেখলে তাকে সাহায্য করবে। খাবারদাবার দেবে এবং চিকিৎসা ও সেবা দেবে।

৪। যে সমস্ত স্থানে শরীয়ত শাস্তি দেওয়ার অনুমতি দিয়েছে, সেখানে শাস্তির ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করবে না।

৫। তাকে উত্ত্যক্ত করবে না।[২৯৬]

প্রাণীদের হক

১। যে সমস্ত প্রাণী দ্বারা বিশেষ কোনো উপকার অর্জন করা যায় না, তাদের বন্দি করবে না। বিশেষত বাচ্চা ধরে এনে তার মা-বাবাকে কষ্ট দেওয়া বড়ই নির্দয়তার ব্যাপার।

২। যে প্রাণী উপকারে আসে, তাদেরকে প্রয়োজন ব্যতীত এমনিতেই হত্যা করবে না।

---

[২৯৫] *হুকুকুল ইসলাম*, ১২; *বেহেশতী জেওর*, ২৮৭।
[২৯৬] *হুকুকুল ইসলাম*, ১৪।

৩। যে প্রাণী নিজের কাজের জন্য ব্যবহার হয়, তাদের খানাপিনা, আরাম ও সেবার পূর্ণ ব্যবস্থা করবে।

৪। তাদের থেকে তাদের সামর্থ্যের অধিক কাজ নেবে না।

৫। তাদেরকে সীমাতিরিক্ত মারবে না।

৬। যে প্রাণী জবাই করা হবে কিংবা কষ্টদায়ক হওয়ার কারণে হত্যা করা হবে, তার কাজ দ্রুত সম্পাদন করতে হবে। তাকে তড়পানো যাবে না। ক্ষুধার্ত পিপাসার্ত রেখে হত্যা করবে না।[২৯৭]

[২৯৭] *হুকুকুল ইসলাম।*

সতেরোতম অধ্যায়

ভালো অভ্যাস ও শিষ্টাচারের বিবরণ

খাওয়া-দাওয়ার আদব

১। মেহমানকে সম্মান করবেন। আপনি কারও বাসায় মেহমান হিসেবে গেলে এত বেশিদিন থাকবেন না যে, তাদের জন্য বোঝা হয়ে যান।

২। বিদায় দেওয়ার সময় মেহমানকে দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া সুন্নত।

৩। বিসমিল্লাহ বলে খানা শুরু করবেন। ডান হাতে খাবেন। একত্রে খাওয়ার সময় নিজের সামনে থেকে খাবেন। তবে যদি থালায় বিভিন্ন ধরনের খাবার থাকে, যেমন কয়েক ধরনের ফল কিংবা কয়েক রকমের তরকারি, তাহলে যেটা খেতে মনে চায় যেদিক দিয়ে খেতে মনে চায় খাবেন।

৪। আঙুল চেটে খাবেন। পাত্রের তরকারি শেষ হয়ে গেলে তাও পরিষ্কার করে নেবেন।

৫। যদি হাত থেকে খাবার পড়ে যায়, তাহলে তা উঠিয়ে পরিষ্কার করে খেয়ে নেবেন। বড়লোকি দেখাবেন না।

৬। তরমুজের টুকরো, খেজুর বা আঙুরের দানা অথবা মিষ্টান্নের পাত্র হলে একটি একটি করে খাবেন। একবারে অনেকগুলো নেবেন না।

৭। দুর্গন্ধযুক্ত কিছু, যেমন পেঁয়াজ, রসুন খাওয়ার পর যদি কোনো মজমায় যেতে হয়, তাহলে ভালো করে মুখ পরিষ্কার করে নেবেন, যেন দুর্গন্ধ না থাকে।

৮। প্রতিদিনের খরচের জন্য আটা-চাউল মেপে মেপে পাকাবেন। বিনা হিস বে পাকাবেন না।

৯। খেয়ে-দেয়ে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করবেন।

১০। খাওয়ার পূর্বে ও পরে হাত ধুয়ে নেবেন।

১১। বেশি দ্রুত খানা খাবেন না।

১২। একসাথে খানা খেলে খাবারে বরকত হয়।

১৩। খানা খাওয়া শেষ হলে নিজে ওঠার আগে দস্তরখান উঠিয়ে নেবেন। এর পূর্বে নিজে উঠে যাওয়া বেয়াদবি। একত্রে খাওয়ার সময় যদি সাথিদের আগেই খাওয়া শেষ হয়ে যায়, তাহলে তার সঙ্গ দিন, কিছু কিছু খেতে থাকুন, যেন সে লজ্জায় ক্ষুধার্ত অবস্থাতেই উঠে না যায়। তবে যদি কোনো কারণে উঠতেই হয়, তাহলে তার কাছে ওজর পেশ করে উঠে যাবেন।

১৪। এক শ্বাসে পানি পান করবেন না। তিন শ্বাসে পান করবেন। শ্বাস নেওয়ার সময় মুখ থেকে পাত্র আলাদা করে ফেলবেন। বিসমিল্লাহ বলে পান করবেন এবং পান করে আলহামদুলিল্লাহ বলবেন।

১৫। যে পাত্র থেকে বেশি পানি পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা আছে কিংবা যে পাত্রের ভেতরের অবস্থা জানা নেই, যেমন : তার মধ্যে কোনো পোকা-ময়লা আছে কি না, এমন পাত্রে মুখ লাগিয়ে পান করবেন না।

১৬। প্রয়োজন ব্যতীত দাঁড়িয়ে পান করবেন না।

১৭। পানি পান করে যদি অন্যকেও দিতে হয়, তাহলে প্রথমে আপনার ডান পাশে যে আছে তাকে দেবেন এবং সে তার ডান দিকের জনকে দেবে। তদ্রূপ যদি কোনো জিনিস বণ্টন করতে হয়, যেমন পান আতর মিঠাই, সবকিছুই এই পদ্ধতিতে ডান দিক থেকে বণ্টন করবেন।

১৮। পাত্রের যে দিক দিয়ে ভাঙা, সেদিক দিয়ে পান করবেন না।

১৯। সন্ধ্যার শুরুর দিকে বাচ্চাদের বাহিরে বের হতে দেবেন না। রাতে বিসমিল্লাহ বলে দরজা বন্ধ করবেন। বিসমিল্লাহ বলে সকল পাত্র ঢেকে দেবেন। শোবার সময় বাতি বন্ধ করে দেবেন এবং চুলার আগুন নিভিয়ে কিংবা কমিয়ে দেবেন।

২০। কারও কাছে কোনো খাবার পাঠাতে চাইলে ঢেকে পাঠাবেন।

পরিধানের আদব

১। এক জুতা পরে হাঁটবেন না। চাদর রুমাল এমনভাবে প্যাঁচাবেন না যে, চলতে কিংবা দ্রুত হাত বের করতে সমস্যা হয়।

২। ডান দিক থেকে কাপড় পরা শুরু করবেন। যেমন : ডান হাত, ডান পা, ডান জুতা আগে পরবেন এবং খোলার সময় বাম দিক থেকে খুলবেন।

৩। কাপড় পরে নিচের দুআ পড়বেন (এতে গুনাহ মাফ হয়)—

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي مَا أُوَارِي بِهِ عَوْرَتِي وَأَتَجَمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِي

সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য যিনি আমাকে পরিয়েছেন, যা দিয়ে আমি আমার লজ্জাস্থান ঢেকে রেখেছি এবং আমার জীবনকে সুসজ্জিত করেছি।[২৯৮]

৪। এমন পোশাক পরবেন না, যাতে পর্দা হয় না।

৫। যে ধনী মহিলারা অনেক দামি পোশাক ও অলংকার পরে, তাদের কাছে বেশিক্ষণ বসবেন না। শুধু শুধু দুনিয়ার চিন্তা বাড়বে।

৬। সেলাই করে কাপড় পরাকে লাঞ্ছনার বিষয় মনে করবেন না।

৭। বেশি চকচকে কাপড় পরবেন না, আবার বেশি ময়লা জামাও পরবেন না। বরং মধ্যপন্থা অবলম্বন করবেন এবং পরিষ্কার রাখবেন।

৮। চুলে তেল লাগাবেন, চিরুনি ব্যবহার করবেন। তবে সব সময় এই ধান্দায় থাকবেন না। হাতে মেহেদি লাগাবেন।

৯। তিনবার করে উভয় চোখে সুরমা লাগাবেন।

১০। ঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখবেন।[২৯৯]

---

[২৯৮] *তিরমিযি* হাদীস নং ৩৫৬০।
[২৯৯] *বেহেশতী জেওর*, ৭ম খণ্ড।

অসুস্থতা ও চিকিৎসার আদব

১। অসুস্থ ব্যক্তিকে খানাপিনার জন্য বেশি জোর করবেন না।

২। অসুস্থতার সময় নিষিদ্ধ জিনিস খাবেন না।

৩। শরীয়ত-পরিপন্থি তাবিজ-কবজ কখনো ব্যবহার করবেন না।

৪। যদি কারও নজর লাগে এবং কারও নজর লেগেছে বলে সন্দেহ হয়, তাহলে সন্দেহভাজনের উভয় হাত কনুইসহ, উভয় পা, উভয় রান এবং লজ্জাস্থান ধুয়ে পানি জমা করে যে নজরাক্রান্ত হয়েছে তার ওপর ঢেলে দেবেন। ইনশাআল্লাহ নজর দূর হয়ে যাবে।

৫। যে রোগকে অন্যরা ঘৃণা করে, যেমন : চুলকানি ইত্যাদি, এমন রোগীর উচিত নিজেই তাদের থেকে আলাদা থাকা, যেন কেউ কষ্ট না পায়।

স্বপ্নের আদব

১। যদি ভয়াবহ স্বপ্ন দেখেন, তাহলে বামদিকে তিনবার থুথু ফেলবেন। তারপর তিনবার 'আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম' পড়বেন। তারপর কাত পরিবর্তন করে নেবেন। এবং কারও কাছে এই স্বপ্ন উল্লেখ করবেন না। ইনশাআল্লাহ কোনো ক্ষতি হবে না।

২। স্বপ্ন কাউকে বলতে চাইলে এমন ব্যক্তিকে বলবেন, যে বুঝমান এবং আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী, যেন খারাপ ব্যাখ্যা না করে।

৩। মিথ্যা স্বপ্ন বর্ণনা করা অনেক বড় গুনাহ।

সালামের আদব

১। পরস্পরকে সালাম দেবেন। সালামদাতা বলবেন, 'আসসালামু আলাইকুম'। আর উত্তরদাতা বলবেন, 'ওয়ালাইকুমুস সালাম'। এ ছাড়া অভিবাদনের সকল পদ্ধতি বেহুদা।

২। যে আগে সালাম দেয় সে বেশি সওয়াব পায়।

৩। কেউ অন্যের সালাম পৌঁছে দিলে তার উত্তরে 'ওয়ালাইহিম ওয়ালাইকুমুস সালাম' বলবেন।

৪। একত্রে উপস্থিত ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে একজন সালাম দিলে তা সকলের পক্ষ থেকেই হয়ে যায়। তদ্রূপ সকলের মধ্য থেকে একজন উত্তর দিলে তা সকলের পক্ষ থেকে হয়ে যায়। সালামের সময় হাত দিয়ে ইশারা করে ঝুঁকে যাওয়া নিষেধ। কেউ যদি দূর থেকে সালাম আদান প্রদান করে তাহলে হাত দিয়ে ইশারা করা জায়েজ; কিন্তু মুখেও সালামের শব্দ উচ্চারণ করতে হবে।

যে মুসলিম বাচ্চারা সরকারি স্কুলে পড়ে, তাদেরও ইংরেজ ও হিন্দুদের রীতিতে অভিবাদন না জানানো উচিত; বরং শরীয়ত অনুযায়ী উস্তাদ প্রমুখকে সালাম দেওয়া উচিত। উস্তাদ যদি কাফের হন তাহলে তাকে শুধু 'সালাম' শব্দ অথবা 'আসসালামু আলা মানিত্তাবায়াল হুদা' বলা উচিত। কাফেরদের জন্য পূর্ণ সালামের শব্দ ব্যবহার করা অনুচিত। সকল মুসলমানের জন্য এই বিধান।

বসা, শোয়া ও চলার আদব

১। অহংকারীর মতো হাত-পা ছুড়ে ঊর্ধ্বমুখী হয়ে চলবেন না।

২। উপুড় হয়ে শোবেন না।

৩। এমন উচু স্থানে শোবেন না, যেখানে দেয়াল নেই; পড়ে যেতে পারেন।

৪। শরীরের কিছু অংশ রোদে আর কিছু অংশ ছায়ায় রেখে বসবেন না।

৫। কোনো কারণে রাস্তায় বের হলে রাস্তার কিনারা ধরে ধরে চলবেন। রাস্তার মাঝখান দিয়ে চলা মহিলাদের জন্য লজ্জাজনক বিষয়।

সমবেত বসার আদব

১। কাউকে তার জায়গা থেকে উঠিয়ে নিজে সেখানে বসবেন না।

২। কেউ মজমা থেকে কোনো কাজে উঠে গেছে এবং তার অবস্থা দেখে বোঝা যায় যে সে শীঘ্রই ফিরে আসবে, তাহলে তার স্থানে অন্যের বসা উচিত নয়। এই জায়গা তারই প্রাপ্য।

৩। যদি দুজন মহিলা স্বেচ্ছায় মাহফিলে একসাথে বসে, তাহলে আপনি গিয়ে তাদের মাঝখানে বসবেন না। তবে তারা যদি সানন্দে বসিয়ে নেয় তাহলে কোনো সমস্যা নেই।

৪। কেউ আপনার সাথে সাক্ষাৎ করতে এলে তাকে দেখে নিজের জায়গা থেকে একটু নড়েচড়ে বসুন, যেন সে বুঝতে পারে যে, আমার সম্মান করা হয়েছে।

৫। মজমায় সর্দারের মতো বসবেন না। যেখানে জায়গা পাবেন গরিবের মতো বসে যাবেন।

৬। হাঁচি এলে মুখে কাপড় অথবা হাত রাখবেন এবং নিচু আওয়াজে হাঁচি দেবেন।

৭। যথাসম্ভব হাই তোলা থেকে বিরত থাকবেন। যদি আটকাতে না পারেন, তাহলে মুখ ঢেকে নেবেন।

৮। বেশি জোরে হাসবেন না।

৯। মজলিসে নাক-মুখ উচিয়ে অহংকারীর ন্যায় বসবেন না; বরং গরিবের মতো বসুন। কথা বলার প্রয়োজন হলে বলুন, কিন্তু গুনাহের কথা বলবেন না।

১০। মজমায় কোনো দিকে পা ছড়িয়ে বসবেন না।

মুখকে গুনাহ থেকে বাঁচানোর পদ্ধতি

১। চিন্তাভাবনা না করে কোনো কথা বলবেন না। চিন্তা করার পর যখন বিশ্বাস হয়ে যাবে যে, এ কথার মধ্যে কোনো খারাবি নেই, তখন বলবেন।

২। কাউকে বেঈমান বলা কিংবা কাউকে এই বলে অভিশাপ দেওয়া যে, তার ওপর আল্লাহর গজব পড়ুক, সে জাহান্নামে চলে যাক ইত্যাদি, নারী-

পুরুষ ও প্রাণী সকলের জন্যই এমন অভিশাপ করা গুনাহের কাজ। যাকে অভিশাপ করা হয়েছে সে যদি তেমন না হয়ে থাকে, তাহলে এই আগুন খোদ অভিশাপকারীর ওপর ফিরে আসবে।

৩। কেউ যদি আপনাকে অসংলগ্ন কোনো কথা বলে, তাহলে বিপরীতে আপনিও ততটুকুই বলতে পারবেন। সামান্য পরিমাণ বেশি বললেই আপনি গুনাহগার হবেন।

৪। মুখ দেখে দেখে বিভিন্ন ধরনের কথা বলবেন না। একজনের কাছে একরকম আরেকজনের কাছে আরেক রকম বলবেন না।

৫। কখনো চোগলখুরি করবেন না। কারও চুগলি শুনবেন না।

৬। কখনো মিথ্যা বলবেন না।

৭। কারও সামনে তোষামোদ করে প্রশংসা করবেন না। আবার কারও অনুপস্থিতিতেও সীমাতিরিক্ত প্রশংসা করবেন না।

৮। কখনো কারও গীবত করবেন না। গীবত হলো, কারও অনুপস্থিতিতে তার ব্যাপারে এমন কিছু বলা যা শুনলে সে কষ্ট পাবে; সে কথা সত্য হলে তাকে গীবত বলে, আর যদি তা মিথ্যা হয় তাহলে তাকে অপবাদ বলে, এটা আরও মারাত্মক গুনাহ।

৯। কারও সাথে তর্ক করবেন না। নিজের আওয়াজ উঁচু করবেন না।

১০। মাত্রাতিরিক্ত হাসবেন না। এতে অন্তরের উৎফুল্লতা নষ্ট হয়ে যায়।

১১। যার গীবত করেছেন তার থেকে মাফ করাতে না পারলে তার জন্য মাগফিরাতের দুআ করতে থাকবেন। আশা করা যায়, কেয়ামতের দিন মাফ করে দেবে।

১২। মিথ্যা ওয়াদা করবেন না।

১৩। এমনভাবে হাসবেন না, যাতে অন্যের অপমান হয়।

১৪। নিজের কোনো জিনিস বা যোগ্যতা নিয়ে বড়াই করবেন না।

১৫। কবিতা-শেরের ধান্দা রাখবেন না। তবে যদি বিষয়বস্তু শরীয়তবিরোধী না হয় এবং নিচু আওয়াজে মাঝেমধ্যে দুআ ও উপদেশমূলক কোনো কবিতা পাঠ করেন, তাহলে সমস্যা নেই।

১৬। মানুষের মুখে মুখে শোনা কথা বলে বেড়াবেন না। কেননা এমন কথা অধিকাংশই মিথ্যা হয়ে থাকে।

বিশেষ কিছু আদব

১। চিঠি লিখে ওই বিষয়ে আর কথা বলবেন না। তাহলে ওই কাজ দ্রুত সম্পাদন হওয়ার আশা করা যায়।

২। কাল ও সময়কে মন্দ বলবেন না।

৩। চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বলবেন না। অনেক দীর্ঘ ও অতিশয়োক্তিমূলক কথা বলবেন না। প্রয়োজন পরিমাণ কথা বলবেন।

৪। কেউ গান গাইলে সেদিকে কান দেবেন না।

৫। কারও খারাপ চেহারা কিংবা মন্দ বিষয়ের নকল করবেন না।

৬। কারও দোষ দেখলে তা গোপন করবেন, গীত গেয়ে বেড়াবেন না।

৭। যে-কোনো কাজ করার সময় চিন্তা-ভাবনা করে ধীরে-সুস্থে করবেন। তাড়াহুড়ায় অধিকাংশ কাজ নষ্ট হয়ে যায়।

৮। কেউ আপনার কাছে পরামর্শ চাইলে এমন কথাই বলবেন, যা নিজের কাছে সর্বোত্তম মনে হয়।

৯। রাগকে যথাসম্ভব নিয়ন্ত্রণ করুন।

১০। মানুষদের থেকে নিজের অনর্থক কথা মাফ করিয়ে নিন। অন্যথায় কেয়ামতের দিন মারাত্মক বিপদে পড়বেন।

১১। অন্যদেরকে ভালো কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করতে থাকুন। যদি আপনার কথা একদমই গ্রহণ করার আশা না থাকে কিংবা এই আশঙ্কা থাকে যে, উল্টো কষ্ট দেবে, তাহলে চুপ থাকা জায়েজ। তবে

অন্তরে অন্তরে খারাপ কাজকে খারাপ মনে করবেন এবং অপারগতা ব্যতীত খারাপ মানুষের সাথে মিশবেন না।[৩০০]

বিক্ষিপ্ত কিছু মাসআলা

১। প্রতি সপ্তাহে গোসল করা, নাভির নিচের এবং বগলের চুল পরিষ্কার করে শরীরকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা মুস্তাহাব। প্রতি সপ্তাহে না পারলে পনেরো দিনে একবার। বেশি থেকে বেশি চল্লিশ দিন, এর বেশি যাওয়ার অনুমতি নেই। যদি চল্লিশ দিন পার হয়ে যায় এবং শরীরের অনাকাঙ্ক্ষিত লোম পরিষ্কার না করা হয়, তাহলে গুনাহ হবে।

২। মা-বাবা ও স্বামী প্রমুখকে নাম ধরে ডাকা মাকরুহ ও নিষেধ। কেননা এতে বেয়াদবি হয়। তবে প্রয়োজনের সময় যেমন মা-বাবার নাম ধরে ডাকা যায়, তেমনই স্বামীর নাম ধরেও ডাকা যায়। তদ্রূপ উঠতে-বসতে কথা বলতে তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা উচিত।

৩। কোনো প্রাণীকে আগুনে জ্বালানো ঠিক নয়। যেমন : ভিমরুল কাঠপোকা ইত্যাদি ধরে আগুনে নিক্ষেপ করা, এগুলো নাজায়েজ।

৪। উভয় পক্ষ থেকে শর্ত লাগিয়ে কোনো কাজ করা জায়েজ নেই। যেমন কেউ বলল, এক কেজি মিঠাই খেতে পারলে আমি তোমাকে এক রুপি দেবো আর না খেতে পারলে তুমি আমাকে দেবে। অর্থাৎ যখন উভয় দিক থেকে এমন শর্ত করা হবে তখন তা নাজায়েজ। তবে যদি একদিক থেকে শর্ত করা হয় তাহলে সমস্যা নেই।

৫। দুজন মানুষ যদি চুপিচুপি কথা বলতে থাকে, তাহলে তাদের নিকটে যাওয়া উচিত নয়। গোপনে তাদের কথা শোনা অনেক বড় গুনাহ। হাদীসে এসেছে, কেউ যদি কান পেতে অন্যদের কথা শোনে আর তাদের কাছে এটা অপছন্দনীয় হয়, তাহলে কেয়ামতের দিন তার কানে গরম গরম সিসা ঢালা হবে। এখান থেকে বোঝা যায় যে, বিয়ে-শাদির মধ্যে দুলহা-দুলহানের কথা শোনা ও দেখা অনেক বড় গুনাহ।

---

[৩০০] *বেহেশতী জেওর*, ৭ম খণ্ড।

৬। স্বামীর সাথে যে কথা হয়েছে বা যে কাজ হয়েছে তা অন্য কাউকে বলা কবিরা গুনাহ। হাদীসে আছে, এই গোপন কথা যে বলে তার ওপর আল্লাহ তাআলার সবচেয়ে বেশি গজব ও গোস্বা নেমে আসে।

৭। কারও সাথে এই পরিমাণ মজাক করা যাতে তার কষ্ট হয়, জায়েজ নেই। কাউকে সুরসুরি দিলে অতটুকুই দেওয়া যাবে, যাতে তার হাসি চলে আসে।

৮। বিপদের সময় মৃত্যুর আশা করা এবং নিজেকে অভিশাপ করা ঠিক নয়।

৯। তাস, ষোলো গোটি ইত্যাদি খেলা ঠিক নয়। যদি সাথে জুয়া যুক্ত হয়, তাহলে তা হারাম।

১০। ছেলে-মেয়ের বয়স দশ বছর হয়ে গেলে ছেলেদেরকে মা-বাবা, ভাই-বোন প্রমুখের কাছে আর মেয়েদেরকে ভাই-বাপ প্রমুখের কাছে শোয়ানো ঠিক নয়। তবে ছেলে বাবার কাছে এবং মেয়ে মার কাছে শুতে পারে, এটা জায়েজ।

১১। হাঁচি দিয়ে 'আলহামদুলিল্লাহ' বলা উচিত। আলহামদুলিল্লাহ বলার পর যে শুনবে তাকে উত্তরে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলতে হবে, এটা ওয়াজিব। না বললে গুনাহগার হবে। এও খেয়াল রাখতে হবে, যদি হাঁচিদাতা মহিলা অথবা মেয়ে হয়, তাহলে দুআর মধ্যে 'কাফ' যের দিয়ে আর পুরুষ বা ছেলে হলে 'কাফ' যবর দিয়ে পড়তে হবে। অতঃপর হাঁচিদাতা তার উত্তরে বলবে, 'ইয়াগফিরুলাহু লানা ওয়ালাকুম'। তবে এটা বলা তার জন্য ওয়াজিব নয়; বরং উত্তম।

১২। হাঁচিদাতার আলহামদুলিল্লাহ যদি অনেকজন শোনে তাহলে সকলের ওপর ইয়ারহামুকাল্লাহ বলা ওয়াজিব নয়; বরং একজনে বললেই সকলের পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে। তবে যদি কেউই উত্তর না দেয়, তাহলে সবাই গুনাহগার হবে।

১৩। কেউ যদি বারবার হাঁচি দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ বলতে থাকে, তাহলে শুধু তিনবার তার উত্তর দেওয়া ওয়াজিব। এর পরে ওয়াজিব নয়।

১৪। কেউ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাম মুবারক মুখে উচ্চারণ করলে, পড়লে বা শুনলে তার ওপর দরুদ শরীফ পড়া ওয়াজিব হয়ে যায়। না পড়লে গুনাহ হবে। তবে যদি একই স্থানে কয়েকবার নবীজীর নাম নেওয়া হয়, তাহলে প্রত্যেকবার দরূদ পড়া ওয়াজিব নয়; বরং একবার পড়লেই যথেষ্ট। তবে স্থান পরিবর্তন হওয়ার পর আবার শুনলে বা বললে পুনরায় দরূদ পরা ওয়াজিব হবে।

১৫। ছোট বাচ্চাদের বাবরি চুল রাখা অথবা ফ্যাশন করে চুল রাখা জায়েজ নেই। হয়তো পুরো মাথা মুণ্ডিয়ে ফেলতে হবে অথবা পুরো মাথায় চুল রাখতে হবে।

১৬। মহিলাদের জন্য নিজের কাপড়ে এমন আতর সুগন্ধি ব্যবহার করা জায়েজ নেই, যার ঘ্রাণ পরপুরুষ পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

১৭। নাজায়েজ পোশাক সিলিয়ে দেওয়াও নাজায়েজ। কারও স্বামী যদি এমন জামা বানিয়ে দেয় যা পরিধান করা জায়েজ নেই, তাহলে তার সামনে ওজর পেশ করে দেবে। তদ্রূপ দর্জি নাজায়েজ কাপড় সেলাই করবে না।

১৮। মূর্খরা যে সমস্ত মিথ্যা ঘটনা, সনদহীন হাদীস ইত্যাদি নিজের বইয়ে লিখেছে এবং গ্রহণযোগ্য বইয়ে যার কোনো প্রমাণ নেই, এসব বই পড়া নাজায়েজ। যেমন : নূরনামা ইত্যাদি। তদ্রূপ প্রেম ও সৌন্দর্য-সংক্রান্ত বইপত্র পড়া ও অনুষ্ঠান দেখা জায়েজ নেই। বিশেষ করে বর্তমান কালের উপন্যাসের বইগুলো নিজের কিশোরী ও তরুণী মেয়েদের পড়তে দেবেন না; তাদের কাছে পাওয়া গেলে জ্বালিয়ে দেবেন।

১৯। মহিলাদের পরস্পর সালাম-মুসাফাহা করা সুন্নত।[৩০১]

কিছু জরুরি বিষয়

এই পরিচ্ছদে এমন কিছু বিষয় আলোচনা করব যা দ্বারা নিজেও দুনিয়াতে আরামে থাকা যায় এবং অন্যদেরও কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকা যায়।

---

[৩০১] *বেহেশতী জেওর*, ৩য় খণ্ড।

বাহ্যত এ কথাগুলো দুনিয়াবি মনে হতে পারে, কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম বলেছেন, পূর্ণাঙ্গ মুসলমান সে, যার হাত ও মুখ দ্বারা কেউ কষ্ট পায় না।[৩০২] তিনি আরও বলেছেন, কোনো কঠিন বিপদে ফেঁসে গিয়ে নিজেকে কষ্ট দেওয়া মুসলমানের উচিত নয়। হাদীসে এও আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলোচনা করার সময় খেয়াল রাখতেন, শ্রোতারা যেন বিরক্ত না হয়ে যায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন, মেহমান যেন এতদিন কারও বাড়িতে অবস্থান না করে যে, তারা বিরক্ত হয়ে যায়।

উপর্যুক্ত হাদীসগুলো থেকে এ কথাই বোঝা গেল যে, বিনা প্রয়োজনে নিজে কষ্ট করা বা অন্যকে কষ্ট দেওয়া কিংবা এমন কোনো কাজ করা যা দ্বারা অন্যরা কষ্ট পায় বা বিরক্ত হয়, দ্বীনের পরিপন্থি বিষয়। এ জন্য দ্বীন-ধর্মের কথার পাশাপাশি এই বইয়ে এমন বিষয়ও লিখে দিচ্ছি, যা দ্বারা আপনি নিজেও শান্তিতে থাকতে পারেন এবং অন্যদেরও শান্তি দিতে পারেন।

সুখে থাকার কিছু উপাদান

১। রাতে দরজা বন্ধ করার সময় ঘরের ভেতরটা ভালো করে দেখে দিন। কোনো কুকুর বিড়াল ঘরে ঢুকে গেছে কি না। রাতের বেলা আপনার নিজের অথবা আপনার কোনো জিনিসের ক্ষতি করে ফেলতে পারে। ক্ষতি না করলেও রাতভর গরগর করে আপনার ঘুম হারাম করাও কম কথা নয়।

২। নিজের কাপড় ও বইপত্র মাঝেমাঝে রোদে দিন।

৩। ঘরবাড়ি পরিষ্কার করুন এবং প্রতিটি জিনিস নিজ নিজ স্থানে রাখুন।

৪। সুস্থ থাকতে চাইলে নিজেকে বেশি আরামপ্রিয় বানাবেন না। নিজে কিছু পরিশ্রমের কাজ করবেন। মহিলাদের জন্য সবচেয়ে ভালো হলো চাক্কি পিষা, বটি দিয়ে কাটা। এতে শরীর সুস্থ থাকে।

---

[৩০২] *সহীহ বুখারী*, হাদীস নং ১০; *সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং ৪০।

৫। কারও সাক্ষাতে গেলে সেখানে এত দীর্ঘ সময় বসবেন না বা কথা বলবেন না যে, সে বিরক্ত হয়ে যায় অথবা তার কাজে ব্যাঘাত ঘটে।

৬। পরিবারের সকলের উচিত ঘরের প্রতিটি জিনিসের একটি জায়গা নির্ধারণ করা। সেখান থেকে তা নেওয়ার পর ব্যবহার করে আবার সেখানে ফেরত রাখা, যেন প্রয়োজনের সময় কাউকে জিজ্ঞেস করে খুঁজতে না হয়। জায়গা পরিবর্তন হতে থাকলে দেখা যায় কেউ খুঁজে পায় না, সবার সমস্যা হয়। আর যে সমস্ত জিনিস আপনার ব্যক্তিগত ব্যবহারের, সেগুলোর জন্যও জায়গা নির্ধারণ করে রাখুন, যেন প্রয়োজনের সময় হাত দিলেই পাওয়া যায়।

৭। ঘরের চলাচলের স্থানে চকি চেয়ার পাত্র কিংবা ইট পাথর ইত্যাদি রাখবেন না। নাহয় রাতের বেলা কিংবা দিনের বেলাতেই দেখা যাবে কেউ পূর্বের অভ্যাস অনুযায়ী চলতে গিয়ে হোচট খেয়ে পড়ে যায় এবং আহত হয়।

৮। কেউ আপনাকে কোনো কাজের কথা বললে স্পষ্ট করে হাঁ বা না বলে দিন, যেন তার মনে একটা বিষয় নিশ্চিত থাকে। এমন যেন না হয় যে, সে মনে করল আপনি শুনেছেন অথচ আপনি শোনেননি; অথবা সে মনে করল আপনি কাজটি করবেন কিন্তু আপনার কাজের প্রতি ইচ্ছা নেই। কেউ যেন অযথা অন্যের ওপর ভরসা করে বসে না থাকে।

৯। লবণ কম খাবেন। কেননা সবকিছুরই অল্পের চিকিৎসা হয়। কিন্তু বেশি হয়ে গেলে তার আর চিকিৎসা করা সম্ভব হয় না।

১০। ডাল ও তরকারিতে মরিচ কেটে দেবেন না; বরং পিষে দেবেন। কেননা কেটে দিলে মরিচের বীজগুলো টুকরোর মাঝে থেকে যায়। ফলে এক টুকরো মুখে চলে গেলে পুরো মুখে আগুন লেগে যায়।

১১। রাতে পানি পান করার প্রয়োজন হলে বাতি জ্বালিয়ে ভালো করে দেখে নিন। অন্যথায় গ্লাস কিংবা জগের মুখে কাপড় বেঁধে নিন, যেন মুখে অন্য কোনো জিনিস না আসে।

১২। বাচ্চাদের খেলাচ্ছলে শূন্যে ওঠাবেন না কিংবা জানালা দিয়ে নিচের দিকে লটকাবেন না। হিতে বিপরীত হলে আনন্দ শোকে পরিণত হয়ে

যাবে। তদ্রূপ তাদের পেছনে দৌড় লাগাবেন না, তারা হোচট খেয়ে পড়ে যাবে আর ব্যথা পাবে।

১৩। পাতিল খালি হয়ে গেলে সব সময় তা ধুয়ে উল্টো করে রাখবেন। আবার ব্যবহার করতে চাইলে ধুয়ে ব্যবহার করবেন।

১৪। পাতিল কোনো স্থানে রেখে তা থেকে খানা বাড়তে চাইলে সরাসরি পাতিলকে দস্তরখান কিংবা থালার ওপর রাখবেন না। প্রথমে তার তলাটা দেখে পরিষ্কার করে নিন।

১৫। কারও ঘরে মেহমান হিসেবে গেলে তার কাছে কোনো জিনিস চাইবেন না। অনেক সময় দেখা যায় অযথা চাহিদা থাকে কিংবা সময়সাপেক্ষ বিষয় থাকে, তখন মেজবান তা পুরা কারতে পারে না। ফলে অযথা লজ্জিত হয়।

১৬। যেখানে অনেক মানুষ বসে আছে সেখানে বসে থুথু ফেলবেন না কিংবা নাক পরিষ্কার করবেন না। প্রয়োজন হলে উঠে এক কিনারে গিয়ে কাজ সারবেন।

১৭। খানা খাওয়ার সময় এমন জিনিসের নাম মুখে আনবেন না, যা শুনলে ঘৃণা তৈরি হয়। সংবেদনশীল মেজাজের মানুষদের অনেক কষ্ট হয়।

১৮। অসুস্থ ব্যক্তি কিংবা তার পরিবারের সামনে এমন কথা বলবেন না, যাতে জীবনের প্রতি অনীহা রয়েছে। অযথা তাদের মন ভাঙবে। বরং সান্ত্বনামূলক কথা বলবেন। যেমন, ইনশাআল্লাহ সব ঠিক হয়ে যাবে।

১৯। যদি কারও গোপন কথা বলতে হয় আর সে ওই স্থানে উপস্থিত থাকে, তাহলে চোখ কিংবা হাত দিয়ে তার দিকে ইশারা করবেন না। শুধু শুধু তার মধ্যে সন্দেহ তৈরি হবে। তবে এ কথা যদি শরীয়তে অনুমোদিত না হয়, তাহলে এর জন্য আলাদা গুনাহ হবে।

২০। কথা বলার সময় অতিরিক্ত হাত নাড়াবেন না।

২১। আঁচল, হাতলি কিংবা আস্তিন দিয়ে নাক মুছবেন না।

২২। টয়লেটে ব্যবহৃত পাদুকা নিয়ে ওজু করবেন না। হাত-মুখ ধোয়ার জন্য আলাদা জুতা রাখবেন।

২৩। জুতা সব সময় ঝেড়ে পরবেন, তার মধ্যে কোনো কষ্টদায়ক পোকা-মাকড় ঢুকে বসে থাকতে পারে। জামা-কাপড় ও বিছানাও ঝেড়ে ব্যবহার করুন।

২৪। গোপন জায়গায় কারও ফোঁড়া হলে তাকে জিজ্ঞেস করবেন না যে, কোথায় হয়েছে। বেচারা শুধু শুধু লজ্জায় পড়ে যাবে।

২৫। চলাচলের স্থানে বসবেন না। নিজেরও এবং অন্যদেরও কষ্ট হবে।

২৬। শরীর ও জামায় দুর্গন্ধ তৈরি হতে দেবেন না। যদি ধোয়া কাপড় না থাকে, তাহলে পরিহিত জামাই ধুয়ে ফেলুন এবং গোসল করে নিন।

২৭। যেখানে মানুষজন বসে আছে, সেখানে ঝাড়ু দেবেন না।

২৮। কলার ছিলকা ইত্যাদি কারও গায়ের ওপর ফেলবেন না।

২৯। চাকু কেঁচি বা সুইজাতীয় কোনো জিনিস দিয়ে খেলবেন না। অসতর্কতায় লেগে যেতে পারে।

৩০। কোনো মেহমান আসলে সর্বপ্রথম তাকে টয়লেট দেখিয়ে দিন এবং দ্রুত তার বাহন রাখার স্থান দেখিয়ে দিন। ঘোড়া ইত্যাদির ঘাসের ব্যবস্থা করুন। খানা পাকানোতে বেশি লৌকিকতা করবেন না, যাতে সময়মতো খানা দিতে সমস্যা না হয়। অল্প ও সাদাসিধা হলেও সময়মতো খানা দিন। মেহমানের চলে যাওয়ার সময় হলে দ্রুত নাশতা তৈরি করে দিন। মোটকথা তার আরাম ও যত্নে যেন কোনো ত্রুটি না হয়।

৩১। টয়লেট অথবা গোসলখানা থেকে জামা পরতে পরতে বের হবেন না। বরং ভেতর থেকেই ভালো করে পরে বের হবেন।

৩২। কেউ আপনাকে কিছু জিজ্ঞেস করলে প্রথমে তার কথার উত্তর দিন, তারপর অন্য কাজে মনোযোগ দিন।

৩৩। কথা বললে কিংবা কারও প্রশ্নের উত্তর দিলে মুখ খুলে পরিষ্কার করে বলবেন, যেন অন্যরা ভালো করে বুঝে যায়।

৩৪। হাত দিয়ে কাউকে কিছু দিতে চাইলে দূর থেকে তার দিকে নিক্ষেপ করবেন না। অপরজনের হাতে না পড়লে ক্ষতি হতে পারে। তাই নিকটে গিয়ে দিন।

৩৫। দুজন মানুষ কথা বলছে কিংবা একজন আরেকজনকে পড়াচ্ছে, এমন সময় তাদের মাঝখানে গিয়ে চিল্লানো কিংবা অন্য কারও সাথে কথা বলা উচিত নয়।

৩৬। কেউ কোনো কাজে কিংবা কথায় ব্যস্ত থাকলে তার কাছে গিয়ে সাথে সাথে কথা বলা শুরু করবেন না। বরং সুযোগের অপেক্ষা করবেন। যখন সে আপনার দিকে মনোযোগ দেবে তখন কথা বলবেন।

৩৭। অন্যের হাতে কিছু দিতে চাইলে যতক্ষণ পর্যন্ত অপরজন তা ভালো করে মুঠোয় নিয়ে না নেয়, ততক্ষণ পর্যন্ত নিজের হাত থেকে তা ছাড়বেন না। মাঝখান থেকে পড়ে গিয়ে ক্ষতি হতে পারে।

৩৮। কাউকে পাখা দিয়ে বাতাস দেওয়ার সময় খেয়াল করবেন যেন তার গায়ে না লাগে। তদ্রূপ এত জোরে পাখা ঘুরাবেন না যে তার কষ্ট পায়।

৩৯। খানা খাওয়ার সময় হাড্ডিগুলো এক স্থানে জমা করে রাখুন। তদ্রূপ কোনো কিছুর ছিলকা বা খোসা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রাখবেন না। সবগুলো একত্র হয়ে গেলে সুযোগমতো উপযুক্ত স্থানে ফেলে দিন।

৪০। অনেক জোরে কিংবা মুখ উঁচু করে হাঁটবেন না। গড়িয়ে পড়ে যেতে পারেন।

৪১। বই অনেক যত্নের সাথে বন্ধ করবেন। অধিকাংশ সময় প্রথম ও শেষ পৃষ্ঠা ভাজ হয়ে যায়।

৪২। স্বামীর সামনে কোনো না-মাহরাম পুরুষের প্রশংসা করা উচিত নয়। অনেক পুরুষের এটা পছন্দ নয়।

৪৩। স্বামীর সামনে অন্য মহিলার প্রশংসা করাও উচিত নয়। হতে পারে স্বামীর মনে তার প্রতি আকর্ষণ তৈরি হয়ে যাবে এবং সে ওই দিকে ভিড়ে যাবে।

৪৪। যার সাথে খোলামেলা সম্পর্ক নয়, তার সাথে সাক্ষাতের সময় তার ঘরের অবস্থা, ধনসম্পদ অলংকার ও পোশাকের অবস্থা জিজ্ঞেস না করা উচিত।

৪৫। মাসে দুই-তিনদিন এই কাজের জন্য নির্দিষ্ট করে নিন যে, এই দিনগুলোতে পুরো ঘর পরিপূর্ণভাবে পরিষ্কার করবেন। মাকড়সার জাল পরিষ্কার করবেন, বিছানাপত্র উঠিয়ে ঝেড়ে বিছাবেন এবং প্রতিটি জিনিস সাজিয়ে স্ব-স্থানে রাখবেন।

৪৬। কারও সামনে থেকে লিখিত কোনো কাগজ বা বই নিয়ে পড়া উচিত নয়। যদি কলমের লেখা থাকে, হতে পারে সে কোনো ব্যক্তিগত বিষয় লিখছে। আর যদি তা গোপনীয় কাগজ হয়ে থাকে, তাহলেও বুঝতে হবে সে নিজস্ব কোনো কিছু লিখে রেখেছে।

৪৭। সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামার সময় খুব সাবধান থাকবেন। উত্তম হলো, এক সিঁড়ির ওপর এক পা রেখে সেখানেই অন্য পা রাখার ওপর পরবর্তী সিঁড়ির দিকে ধাবিত হওয়া। এক সিঁড়িতে এক পা আরেক সিঁড়িতে আরেক পা, মেয়ে ও মহিলাদের জন্য এটা একেবারেই উপযোগী নয়; আমি তো ছোট ছেলেদেরকেও এমন করতে নিষেধ করি।

৪৮। যেখানে কেউ বসে আছে, সেখানে কাপড়, বইপত্র কিংবা অন্য কোনো জিনিস এমনভাবে ঝাড়বেন না যে, তার ওপর গিয়ে পড়ে। তদ্রূপ মুখ দিয়ে কিংবা কাপড় দিয়েও কিছু ঝাড়বেন না। বরং ঝাড়তে হলে এই স্থান থেকে দূরে গিয়ে ঝেড়ে নিন।

৪৯। কারও বিপদাপদ কিংবা দুঃখ-অসুস্থতার ব্যাপারে কোনো কথা শুনলে পরিপূর্ণ নিশ্চিত না হয়ে অন্য কারও কাছে তা বলবেন না। বিশেষত ওই ব্যক্তির নিকটাত্মীয়ের কাছে তো একেবারেই বলা যাবে না। কেননা যদি ভুল সংবাদ হয়ে থাকে, তাহলে খামোখা অন্যরা পেরেশান হয়ে যাবে। তারপর লোকজন তার ব্যাপারে বলাবলি করবে যে, অমুক অশুভ কথাবার্তা বলে বেড়ায়!

৫০। সাধারণ আপদ কিংবা অসুস্থতার সংবাদ দূরে অবস্থানরত আত্মীয়কে জানাবেন না।

৫১। দেয়ালে থুথু ফেলবেন না। পানের পিক ফেলবেন না। তদ্রূপ হাতের তেল দেয়ালে কিংবা চৌকাঠে মুছবেন না; বরং ধুয়ে ফেলবেন। তবে কতিপয় মূর্খ মহিলার মতো পাকানো তেলকে নাপাক বলবেন না।

৫২। যদি দস্তরখানে আরও তরকারির প্রয়োজন পড়ে, তাহলে খানেওয়ালার সামনে থেকে পাত্র ওঠাবেন না; বরং অন্য পাত্র দিয়ে নিয়ে আসবেন।

৫৩। কেউ কোনো চকি বা বেঞ্চির ওপর বসে অথবা শুয়ে থাকলে তা নাড়াবেন না। পাশ দিয়ে যেতে হলে এমনভাবে যাবেন যেন তার সাথে পা না লাগে। যদি বেঞ্চি থেকে কোনো জিনিস নিতে হয় বা রাখতে হয়, তাহলে এমন সময়ে আস্তে ওঠাবেন এবং আস্তে রাখবেন।

৫৪। খানাপিনার কোনো জিনিস উন্মুক্ত রাখবেন না। এমনকি দস্তরখানে কোনো খাবার যদি পরে কিংবা বিলম্বে খাওয়া হয়, তাও ঢেকে রাখবেন।

৫৫। মেহমানের উচিত, পেট ভরে গেলে কিছু রুটি তরকারি দস্তরখানের ওপর অবশ্যই রেখে দেওয়া। যাতে মেজবানের এমন সন্দেহ না হয় যে, মেহমানের খাবার কম হয়ে গেছে আর তারা লজ্জিত হয়।

৫৬। যে পাত্র একদম খালি, তা আলমারি বা তাকে রাখলে উল্টো করে রাখবেন।

৫৭। চলার সময় পা পরিপূর্ণ উঠিয়ে সামনের দিকে রাখবেন। মাটির সাথে ঘেঁষে হাঁটবেন না। এতে জুতাও তাড়াতাড়ি ছিঁড়ে যায় এবং দেখতেও খারাপ দেখা যায়।

৫৮। চাদর, ওড়না ইত্যাদির অংশ যেন মাটিতে ঝুলে না যায়, এদিকে বিশেষ খেয়াল রাখবেন।

৫৯। কেউ যদি লবণ বা খাওয়ার কোনো জিনিস চায়, তাহলে হাতে করে না এনে পাত্রে করে আনবেন।

৬০। মেয়েদের সামনে লজ্জাহীনতার কোনো কথা বলবেন না। অন্যথায় তাদের লজ্জা-শরম চলে যাবে।[৩০৩]

---

[৩০৩] *বেহেশতী জেওর*, ১০।

মহিলাদের পরিহার্য কিছু বিষয়

১। মহিলারা অনেক কথার বোধগম্য উত্তম দেয় না। তাদের উত্তরে প্রশ্নকারীর মন প্রশান্ত হয় না। এদিক-সেদিকের অনেক কথা মিলিয়ে দেয়, ফলে আসল কথা বুঝে আসে না। সব সময় মনে রাখবেন, কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে প্রথমে তার উদ্দেশ্য ভালো করে বুঝে নেবেন এবং তারপর প্রয়োজন অনুযায়ী তার উত্তর দেবেন।

২। অনেক সময় কোনো কাজের কথা বললে মহিলারা শুনে চুপ থাকে। সে শুনেছে কি শোনেনি এ নিয়ে নির্দেশকারী সন্দেহে থাকে। ক্ষেত্রবিশেষ সে মনে করে যে, মহিলা শুনেছে কিন্তু বাস্তবে শোনেনি, তখন তার ভরসায় থাকা কাজটি আর হয় না। অতঃপর এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে বলে দেয় যে, আমি তো শুনিনি, ফলে ওই কাজ অসম্পূর্ণই থেকে যায়। অন্যদিকে যদি সে আদেশ বুঝে থাকে আর নির্দেশকারী মনে করে যে শোনেনি, তাই সে আবার বলে, তখন মহিলা তার ওপর চটে যায় যে, শুনেছি শুনেছি, কেন আমার জীবন খেতে এসেছ! প্রথমবারেই যদি মহিলা স্পষ্ট করে বলে দিত যে, হাঁ শুনেছি, তাহলে অপরজনের দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন পড়ত না আর পরস্পরের এমন বিবাদও হতো না।

৩। অনেক সময় চাকরানির সাথে এমন হয় যে, তাকে কোনো আদেশ দিলে বা ঘরের কোনো কথা বললে দূর থেকে চিৎকার দিয়ে বলে। এতে দুটি মন্দ বিষয় তৈরি হয় :

> এক। লজ্জাহীনতা ও পর্দাস্বল্পতা। কেননা ক্ষেত্রবিশেষ বাহিরের দরজা পর্যন্ত এমনকি সড়ক পর্যন্তও তার আওয়াজ পৌঁছে যায়।
>
> দুই। দূর থেকে বলায় কিছু কথা বুঝে আসে আর কিছু বুঝে আসে না। যতটুকু বুঝে না তা কার্যকর হয় না। ফলে মালকিন অসন্তুষ্ট হয়ে জিজ্ঞেস করতে থাকে, এই এই কাজ কেন করলি না? আর চাকরানি উত্তর দিতে থাকে যে, আমি তো শুনিনি। দুজনের ঠিক মাঝখান দিয়ে কাজটা নষ্ট হলো।

তদ্রূপ চাকরানিদেরও বৈশিষ্ট্য হলো, বাহির থেকে যে কথা নিয়ে আসবে দরজা থেকেই চিৎকার করে বলা শুরু করবে। এখানেও কিছু বুঝে আসে,

কিছু অস্পষ্ট থেকে যায়। ফলে আগের মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়। এ জন্য ভদ্রতা হলো, যার সাথে কথা বলবেন তার কাছে যাবেন কিংবা তাকে নিজের কাছে ডেকে আনবেন। তারপর ভালো করে বুঝিয়ে বলবেন এবং বুঝে নেবেন।

৪। কোনো জিনিসের প্রয়োজন হোক বা না হোক, পছন্দ হলেই হলো, একটু পছন্দ হলেই নির্দ্বিধায় কর্জ নিয়ে হলেও তা কিনে নেবে। কর্জ না নিলেও নিজের টাকা এভাবে অযথা নষ্ট করা কোনো বুদ্ধিমানের কাজ? তা ছাড়া অপব্যয়ের গুনাহও হয়। এ জন্য যেখানে খরচ করতে চান প্রথমে ভালো করে চিন্তা করে নিন যে, এখানে খরচ করলে দ্বীনি কোনো ফায়দা হবে বা দুনিয়ার কোনো প্রয়োজন আছে? যদি অনেক চিন্তার পর প্রয়োজন ও উপকার মনে হয়, তাহলে খরচ করবেন। অন্যথায় টাকা নষ্ট করবেন না। আর কর্জ তো যথাসম্ভব নেবেন না, একটু কষ্ট হলেও কর্জ ছাড়াই দিন পার করে দেবেন।

৫। মহিলাদের একটি বদ অভ্যাস হলো, কোথাও শহরে বা সফরে যাওয়ার সময় এই-সেই করে অনেক দেরি করে ফেলে। ফলে সময় সংকীর্ণ হয়ে যায় এবং গন্তব্যেও দেরিতে পৌঁছে। রাস্তায় রাত হয়ে গেলে জান ও মালের আশঙ্কা তৈরি হয়। গরমের দিন হলে নিজে রোদে পুড়তে হয় আর বাচ্চাদেরও কষ্ট করতে হয়। বৃষ্টির দিন হলে প্রথমত বৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা থাকে। দ্বিতীয়ত কর্দমাক্ত রাস্তায় গাড়ি চলতে কষ্ট হয় এবং দেরি হয়ে যায়। কিন্তু যদি সকাল সকাল বের হয়ে যেত, তাহলে কিন্তু সব ধরনের সুযোগ ও নিশ্চয়তা থাকত। এমনকি বাড়িতে আসতে চাইলেও মালিকে বিভিন্ন স্থানে দাঁড় করিয়ে করিয়ে পেরেশান করে ফেলে। তারপর দেরিতে গাড়িতে ওঠার কারণে গন্তব্যে দেরিতে পৌঁছে। নিজের কাজে বিঘ্ন ঘটে। খানাপিনার নিয়ম নষ্ট হয়ে যায়। কখনো তাড়াহুড়ায় খাবার নষ্ট হয়। কখনো স্বামী তাগাদা দিতে থাকে, ওদিকে বাচ্চারা চিল্লাতে থাকে। এসব কিছুই হয় না, যদি সময়মতো তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যায়।

৬। মহিলাদের আরও একটি ত্রুটি হলো, কোথাও গেলে নিষ্প্রয়োজনীয় জিনিস বোঝা ভরে নিয়ে যায়। ফলে জায়গার সংকীর্ণতা তৈরি হয়। সবচেয়ে বেশি বিপদে পড়তে হয় স্বামীদের। তাদের এই বোঝা সামলাতে হয়, কখনো কখনো তো বহন করে নিয়ে যেতে হয় আবার মজুরির

টাকাও তাদেরই দিতে হয়; সকল চিন্তা তাদের ওপর এসে পতিত হয়। অন্যদিকে স্ত্রী আরামসে নিশ্চিন্তে গাড়িতে বসে থাকে। সফরে সব সময় সামান কম নিয়ে যাবেন। তাহলে সব ধরনের সুবিধা ভোগ করতে পারবেন। ট্রেন সফরেও এটা খেয়াল রাখবেন। কেননা ট্রেনে অতিরিক্ত বোঝা নিয়ে আরও বেশি কষ্ট হয়।

৭। মহিলারা অনেক সময় গাড়িতে উঠতে গিয়ে পর্দা রক্ষার জন্য পুরুষদের উদ্দেশে বলে, মুখ ঢেকে নিন, এক কোনায় চলে যান। কিন্তু গাড়িতে উঠে যাওয়ার পর পুনরায় তাদেরকে অবহিত করে না যে, এখন আর পর্দার প্রয়োজন নেই। এতে দুটি সমস্যা সামনে আসে : এক। পুরুষরা মুখ ঢেকে বসে থাকে। অযথা কষ্ট হয়। দুই। কখনো কখনো তারা এই মনে করে মুখ খুলে সামনে চলে আসে যে, পর্দা হয়ে গেছে, কিন্তু দেখা যায় আসলে এখনো পর্দা হয়নি। এসব সমস্যা হয় দ্বিতীয়বার না জানানোর কারণে। যদি তার দ্বিতীয়বার বলার অভ্যাস থাকত, তাহলে সকলেই এভাবে অপেক্ষায় থাকত না এবং এমন দ্বিধার পরিবেশ তৈরি হতো না।

৮। মহিলারা আরও একটি কাজ করে। তা হলো, যাত্রার প্রস্তুতি এখনো শুরু হয়নি, ঘরের সমস্ত পুরুষকে পর্দার জন্য বাইরে বের করে দেয়। এদিকে আল্লাহর বান্দারা বাহিরে কষ্ট করে ওদিকে তারা ঘরে বসে বাদাম খেতে থাকে।

৯। মহিলারা কোথাও গেলে গাড়ি থেকে নেমে চুপিচুপি ওই ঘরে গিয়ে প্রবেশ করে। অনেক সময় ওই ঘরের পুরুষ ভেতরে উপস্থিত থাকে, ফলে তার মুখোমুখি হয়ে যায়। এ জন্য আপনাদের উচিত প্রথমেই ঘরে প্রবেশ না করা; বরং কাউকে পাঠিয়ে নিজের আগমনের খবর দিয়ে দিন। তাহলে কোনো পুরুষ বা অন্য কেউ থাকলে তারা দূরে সরে যাবে। যখন আপনাকে বলা হবে যে, এখন ঘরে কোনো পুরুষ নেই, তখন আপনি ঘরে প্রবেশ করবেন।

১০। দুজন মহিলা একত্রে কথা বলতে বসলে অনেক সময় এমন হয় যে, একজনের কথা শেষ হওয়ার আগেই আরেকজন শুরু করে দেয়। বরং ক্ষেত্রবিশেষ এমনও হয় যে, উভয়েই একসাথে বলতে থাকে। কেউ কারও

কথা না শুনে নিজের মতো হাঁকতে থাকে। এভাবে কথা বলে কী লাভ! মনে রাখবেন, একজনের কথা শেষ হলেই অন্যজন বলা শুরু করবেন।

১১। মহিলারা অনেক সময় অলংকার কিংবা টাকা-পয়সা অসতর্কতায় খাটের নিচে বা কোনো তাকে খোলামেলা রেখে দেয়। তালা-চাবি থাকা সত্ত্বেও অলসতার কারণে এগুলোর যথার্থ হেফাজত করে না। অতঃপর কোনো জিনিস হারিয়ে গেলে তখন সকলের দোষ দিতে থাকে।

১২। মহিলাদেরকে এক কাজের জন্য পাঠালে তারা গিয়ে অন্য কাজে লেগে যায়। উভয় কাজ শেষ করে তারপর ফিরে আসে। এ ক্ষেত্রে যে পাঠায় তার কষ্ট ও অস্থিরতা তৈরি হয়। কেননা তার তো এক কাজ শেষ করার সময়ের হিসেব থাকে। যখন ওই পরিমাণ সময় পার হয়ে যায়, তখন তার পেরেশানি শুরু হয়ে যায়। এটা কোনো বুদ্ধিমত্তার বিষয় নয় যে, এক কাজের জন্য যেহেতু এসেছি আরেকটি কাজ করে ফেলি; বরং প্রথম কাজ শেষ করে গিয়ে তাকে নিশ্চিন্ত করে আসুন। তারপর নিজের মতো করে সময় নিয়ে অন্য কাজ করুন।

১৩। মহিলাদের মধ্যে অলসতা থাকে। এক সময়ের কাজ অন্য সময় করে। এতে অনেক সমস্যা ও ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়।

১৪। অনেক মহিলার মধ্যে সংক্ষেপে কাজ করার মেজাজ নেই। স্থান ও প্রয়োজনের দিকে তাকিয়ে দেখে না যে, এখন তাড়াতাড়ি কাজ করার সময়, সংক্ষেপে কাজ সেরে দিই। বরং তারা সব সময় আরামসে ধীরে ধীরে কাজ করে। এতে করে অনেক সময় আসল কাজ নষ্ট হয় এবং সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যায়।

১৫। কোনো কিছু হারিয়ে গেলে খোঁজ না লাগিয়েই মহিলারা যে কারও ওপর দোষ চাপিয়ে দেয়। কেউ যদি কোনো দিন কোনো কিছু চুরি করে থাকে, তাহলে সাথে সাথে বলে দেবে যে, এটা তারই কাজ। অথচ এটা তো জরুরি নয় যে, সমস্ত দোষ একজনেই করবে। এভাবে সাধারণ বিষয়ে একটু সন্দেহকে পূর্ণাঙ্গ বিশ্বাসে রূপ দিয়ে বড় ধরনের ঝামেলা পাকিয়ে ফেলে।

১৬। মহিলাদের পান তামাকের খরচ এত বেড়ে গেছে যে, গরিব স্বামী তা বহন করতে পারে না। আর ধনীদের স্ত্রীরা যে খরচ করে তাতে চার-পাঁচজন গরিবের সংসার চলে যেত। এই খরচ কমাতে হবে। আরও খারাপ বিষয় হলো, প্রয়োজন ছাড়াই এসব খেতে থাকে। ফলে একসময় তা নেশায় রূপ নেয়।

১৭। দুজন মানুষ পরস্পরে কোনো বিষয়ে কথা বলছে। মহিলাদের কাছে কিছু জিজ্ঞেস না করলেও তারা খামোখা এখানে অনুপ্রবেশ করে এবং পরামর্শ দেওয়া শুরু করে। মনে রাখবেন, কেউ আপনার কাছে পরামর্শ না চাইলে একেবারে বোবা কানার মতো চুপ করে বসে থাকবেন।

১৮। স্ত্রী অনেক সময় কোনো মজমা থেকে এসে নিজের স্বামীর কাছে অন্যান্য মহিলার অলংকার পোশাক ও চেহারা-সুরতের বিবরণ দিতে থাকে। একটু ভেবে দেখেছেন, যদি স্বামীর মন তাদের কারও ওপর চলে আসে এবং সে তার ধান্দায় পড়ে যায়, তাহলে আপনার কত বড় ক্ষতি হবে!

১৯। মহিলাদের একটি ত্রুটি হলো, কারও কাছে কিছু বলতে হলে ওই ব্যক্তির অবস্থা বিবেচনা না করা। সে কোনো কাজ করছে বা কথা বলছে ইত্যাদি। অপেক্ষা না করে তার কাজ ও কথা শেষ হওয়ার আগেই মাঝখানে গিয়ে বা হাত ঢুকিয়ে দেয়। এটা অনেক খারাপ বিষয়। একটু অপেক্ষা করুন। যখন সে আপনার দিকে মনোযোগ দেবে তখন কথা বলুন।

২০। মহিলারা অনেক সময় অসম্পূর্ণ কথা বলে। অসম্পূর্ণ বার্তা পৌঁছে দেয়। ফলে ভুল বোঝাবোঝি হয়। এতে করে অনেক কাজ নষ্ট হয় এবং দুজনের মাঝে মনোমালিন্য তৈরি হয়।

২১। মহিলাদের সাথে কথা বললে পুরোপুরি মনোযোগ দিয়ে তা শুনে না। এরই মাঝে অন্য কাজ করতে থাকে। অন্যজনের সাথেও কথা বলতে থাকে। ফলে যে কথা বলছে তারও মন ভরছে না, না কাজ হওয়ার পরিপূর্ণ ভরসা পাওয়া যাচ্ছে। পুরো কথা যেহেতু শোনেনি, তাহলে কাজ করবে কীভাবে!

২২। মহিলারা নিজের ভুলত্রুটি স্বীকার করে না। যতদূর সম্ভব কথা বানাতে থাকবে, চাই অর্থবোধক কথা হোক বা না হোক।

২৩। কেউ যদি তাদের জন্য অল্প কিছু জিনিস পাঠায় কিংবা নিম্নমানের কিছু পাঠায়, তাহলে মহিলারা নাক সিটকাতে থাকে, বিভিন্ন ধরনের নিন্দা করতে থাকে যে, এটা পাঠানোর কী দরকার ছিল, পাঠানোর সময় লজ্জা করেনি! এটা অনেক মন্দ অভ্যাস। যে পাঠিয়েছে হয়তো তার সামর্থ্যই ছিল এতটুকু; আপনার তো কোনো ক্ষতি করেনি! স্বামীদের সাথেও তারা এমন ব্যবহার করে। খুশি হয়ে কম জিনিস নেয়। তারপর তাতে দোষ বের করে ফিরিয়ে দেয়।

২৪। মহিলাদেরকে কোনো কাজের কথা বললে অনেক চিল্লাচিল্লি করে নেয় এবং তারপর সেই কাজ করে। কাজ যেহেতু করবেনই, তাহলে এত অনর্থক কথা বলার কী লাভ! অযথা অন্যের মন খারাপ করে দেন।

২৫। অনেক মহিলা কাপড় পরিপূর্ণ সেলানোর আগেই পরে নেয়। ফলে শরীরে সুঁইয়ের আঘাত লাগে। খামোখা নিজে নিজে কষ্ট পায়।

২৬। মহিলারা আসার সময় এবং বিদায়ের সময় মিলেমিশে কান্নাকাটি করে। কান্না না আসলেও কান্না করে। এই ভয়ে কান্না করে যে, কেউ যেন এ কথা বলতে না পারে, তার মধ্যে মায়া-মহব্বত নেই।

২৭। অনেক সময় মহিলারা বিছানায় অবহেলায় সুঁই ফেলে রেখে চলে যায়। ফলে কেউ অবচেতনে এসে বসলে কষ্ট পায়।

২৮। অনেক মহিলা বাচ্চাকে গরম ঠান্ডা থেকে রক্ষা করে না। এতে করে অধিকাংশ বাচ্চা অসুস্থ হয়ে পড়ে। তারপর তারা তাবিজ-কবজের পেছনে পড়ে। কোনো ওষুধ কিংবা সতর্ক চিকিৎসার চেষ্টা তবুও করে না।

২৯। অনেক মহিলা বাচ্চাদেরকে ক্ষুধা না লাগতেই খাইয়ে দেয়। মেহমানকে জোরাজুরি করে খাওয়ায়। ফলে তাদের বিনা ক্ষুধায় খাওয়ার কষ্ট করতে হয়।[৩০৪]

---

[৩০৪] *বেহেশতী জেওর*, ১০ম খণ্ড।

কিছু অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষিত বিষয়

১। নিজের দুই ছেলে কিংবা দুই মেয়ের বিয়ে একসাথে দেবেন না। কেননা ছেলের বউ ও মেয়ের জামাইয়ে জামাইয়ে অবশ্যই পার্থক্য থাকবে। এমনকি খোদ ছেলে-মেয়ের চেহারা-সুরত, সাজসজ্জা, সৌন্দর্য ও ধৈর্য এবং লজ্জা-শরমের মাঝে পার্থক্য থাকে। এ ছাড়াও আরও অনেক জিনিসে পার্থক্য থাকে। আর মানুষজনের অভ্যাস হলো আলোচনা-সমালোচনা করা, একজনকে ওপরে ওঠানো আরেকজনকে নিচে নামানো। এতে অযথা অন্যের মনে দাগ কাটে।

২। যে কাউকেই বিশ্বাস করে বসবেন না। কারও ভরসায় ঘর ছেড়ে পালাবেন না। যতক্ষণ পর্যন্ত কাউকে সর্বদিক থেকে যাচাই না করবেন, তার ওপর বিশ্বাস করবেন না। বিশেষত শহরে অনেক কৃত্রিম হাজি মহিলা কা'বার গিলাফ নিয়ে তাবিজ-কবজ ঝাড়ফুঁক করার জন্য, কোনো শুভ লক্ষণ দেখানোর জন্য কিংবা কোনো তামাশা দেখানোর জন্য ঘরে ঢুকে যায়। এদেরকে কিছুতেই ঘরে আসতে দেবেন না। দরজাতেই আটকে দেবেন। এমন মহিলা অনেক পরিবারকে নিঃশেষ করে দিয়েছে।

৩। ছোট বাক্স বা পানদানি যাতে টাকা-পয়সা ও অলংকারও রাখেন, খোলা অবস্থায় রাখবেন না। অবশ্যই তালা মেরে রাখবেন কিংবা নিজের সাথেই রাখবেন।

৪। যথাসম্ভব কারও কাছ থেকে বাকিতে জিনিস কিনবেন না। যদি অপারগ হয়ে কিনতেই হয়, তাহলে দাম জিজ্ঞেস করে লিখে রাখবেন এবং হাতে টাকা আসার সাথে সাথে তা পরিশোধ করে দেবেন।

৫। ধুপির কাপড়, মুদি দোকানির সদাই ও চাল ভাঙানো ইত্যাদির হিসাব লিখে রাখবেন। মৌখিক স্মরণের ওপর ভরসা করবেন না।

৬। যতদূর সম্ভব পরিবারের খরচ পরিমিত ও সুশৃঙ্খলভাবে করবেন। বরং আপনাকে মাসিক যে খরচা দেওয়া হয়, চেষ্টা করবেন তা থেকে কিছু বাঁচাতে।

৭। বাহির থেকে যে মহিলারা আপনার ঘরে আসে, তাদের কাছে এমন কথা বলবেন না, যা অন্যদের জানাতে চান না। এই মহিলাগুলো ঘরের কথাগুলো দশ-বিশ জায়গায় বলে বেড়ায়।

৮। আটা-চাউল আন্দাজে পাকাবেন না। নিজের খরচের হিসাব করে প্রতি বেলা সব জিনিস হিসেব করে ব্যয় করবেন। এতে কেউ আপনাকে খোঁচা দিলে পরোয়া করবেন না।

৯। মেয়েরা বাহিরে বের হলে তাদের অলংকার পরাবেন না। এতে জান ও মাল উভয়ের আশঙ্কা থাকে।

১০। কোনো পুরুষ আপনার ঘরের সামনে এসে যদি আপনার স্বামী অথবা বাপ-ভাইয়ের সাথে নিজের সাক্ষাৎ, বন্ধুত্ব কিংবা কোনো ধরনের আত্মীয়তার কথা বলে, তাহলে ঘরের কোনো পুরুষ দিয়ে তাকে চিহ্নিত না করে কিছুতেই তাকে ঘরে আসতে বলবেন না। পর্দা করেও তাকে ঘরে আসতে বলবেন না এবং কোনো দামি জিনিস তার হাতে দেবেন না। অপরিচিত মানুষের মতো খানা ইত্যাদি পাঠিয়ে দিন। বেশি যত্ন ও আত্মীয়তা দেখাবেন না। তদ্রূপ এমন ব্যক্তির পাঠানো কোনো জিনিস কিছুতেই ব্যবহার করবেন না। যদি এতে সে মন খারাপ করে, তাহলে কোনো পরোয়া করবেন না।

১১। কোনো অপরিচিত মহিলা গাড়ি নিয়ে এসে যদি বলে যে, অমুক ঘর থেকে আমাকে পাঠিয়েছে আপনাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য, তাহলে কখনো তার কথায় গাড়িতে উঠবেন না। মোটকথা অপরিচিত মানুষের কথায় কোনো কাজ করবেন না। সে পুরুষ হোক বা মহিলা, নিজের নামে হোক বা অন্যের নামে, সে কিছু চাইলে তাকে দেবেন না।

১২। ঘরের ভেতর এমন কোনো গাছ থাকতে দেবেন না, যার ফল থেকে চোট পাওয়ার আশঙ্কা আছে। যেমন : বেল গাছ।

১৩। শীতকালে একটু বেশি কাপড় পরবেন। অনেক মহিলা শীতকালেও কম কাপড় পরে। ফলে কখনো জ্বর এসে যায়, কখনো ঠান্ডায় আক্রান্ত হয়।

১৪। বাচ্চাদেরকে মা-বাবা এমনকি দাদার নামও মুখস্থ করাবেন এবং মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করবেন, যেন তার স্মরণ থাকে। এতে এই ফায়দা হবে যে, আল্লাহ না করুক বাচ্চা যদি কখনো হারিয়ে যায় এবং কেউ তাকে তার বাবার নাম জিজ্ঞেস করে, মায়ের নাম জিজ্ঞেস করে, তাহলে বাচ্চা বলে দিতে পারবে এবং কেউ না কেউ তাকে আপনার কাছে ফিরিয়ে দিতে পারবে। আর যদি বাচ্চাকে এগুলো না শেখান, তাহলে এই পরিস্থিতিতে সে শুধু মা মা বাবা বাবা করতে থাকবে; কেউ জানতে পারবে না মা কে আর বাবা কে!

১৫। এক মহিলা নিজের বাচ্চাকে রেখে কোথাও কাজ করতে গিয়েছিল। বিড়াল এসে তাকে এই পরিমাণ আঁচড় দিয়েছে যে, সে মারাই গেছে। এই ঘটনা থেকে দুটি বিষয় বুঝে আসে : এক। বাচ্চাকে কখনো একা ছাড়তে নেই। দুই। বিড়াল কুকুর ইত্যাদি প্রাণীর কোনো ভরসা নেই। অনেক মহিলা বোকামি করে বাচ্চাকে বিড়ালের সাথে শোয়ায়। বিড়ালের কী নিশ্চয়তা আছে? সে যদি রাতে অজান্তেও তাকে খামচি দেয় কিংবা কামড় দেয়, তাহলে কী করবেন!

১৬। ওষুধ সর্বদা ডাক্তারকে দেখিয়ে খাবেন এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখবেন। অনেক সময় আনাড়ি দোকানদার নিজের ইচ্ছামতো ওষুধ দিয়ে দেয়, তার মধ্যে এমন কিছু মেশানো থাকে যার ফলাফল ভালো হয় না। যে ওষুধ কোনো বোতল ডিব্বা বা কাগজে করে বিক্রি হয়, তার ওপর একটি কাগজ লাগিয়ে তার নাম লিখে রাখুন। দেখা যায় কেউ এই ওষুধের নাম জানে না। ফলে যতই কার্যকর হোক, ফেলে দিতে হয়। অনেক সময় আবার ভুল ওষুধ ভুল রোগে খেয়ে ফেলে, যার ফলে উল্টো ক্ষতি হয়।

১৭। সুসম্পর্কের কারও থেকে ঋণ নেবেন না এবং এত বেশি ঋণ দেবেনও না, যা উসুল না হলে আপনার চলতে কষ্ট হয়।

১৮। কোনো বড় বা ভালো কাজ করতে চাইলে প্রথমে কোনো দ্বীনদার বুঝমান মানুষের সাথে পরামর্শ করে নিন।

১৯। নিজের টাকা-পয়সা ও সম্পদ গোপন রাখবেন। কারও কাছে তার আলোচনা করবেন না।

২০। কাউকে চিঠি লিখলে ঠিকানাটা পরিপূর্ণ এবং স্পষ্ট করে লিখবেন। একই স্থানে পুনরায় চিঠি পাঠাতে চাইলে পূর্বের চিঠির ঠিকানাই যথেষ্ট বলে মনে করবেন না। কেননা প্রথম চিঠি আছে কিনা আল্লাহই মালুম। যদি না থাকে তাহলে অপরজনের এত সময় কোথায় যে তা স্মরণ রাখবে। অথবা সে যদি অক্ষরজ্ঞানহীন হয় তাহলে আর কীভাবে ঠিকানা পড়বে!

২১। ট্রেনে সফর করলে নিজের টিকিটটা ভালো করে সংরক্ষণ করবেন অথবা নিজের স্বামীর কাছে দিয়ে রাখবেন। গাড়িতে অবচেতন হয়ে ঘুমাবেন না। পার্শ্ববর্তী কোনো মহিলার সাথে নিজের মনের গোপন কথা এবং নিজের আসবাবপত্র ও অলংকারের কথা আলোচনা করবেন না। কেউ পান মিঠাই ইত্যাদি খাবারের জিনিস দিলে খাবেন না। অলংকার পরে ট্রেনে বসবেন না। বরং নিজের ব্যাগ ইত্যাদিতে রেখে দেবেন। বাড়িতে গিয়ে যত চান পরবেন।

২২। যাত্রার সময় অবশ্যই কিছু টাকা সাথে রাখবেন।

২৩। পাগল মানুষকে উত্ত্যক্ত করবেন না। তার সাথে কথাও বলবেন না। তার যেহেতু হিতাহিত জ্ঞান নেই, তাই সে কী বলে আর কী করে বসে তা জানা নেই। দেখা যাবে অযথা আপনি লজ্জিত হলেন বা কষ্ট পেলেন।

২৪। অন্ধকারে কোথাও খালি পা ফেলবেন না। অন্ধকারে কোথাও হাত দেবেন না। প্রথমে বাতি জ্বালাবেন এবং তারপর কাজ করবেন।

২৫। কারও কাছে নিজের গোপন কথা বলবেন না। অনেকে কারও কাছে গোপন কথা বলে তাকে আবার নিষেধ করে দেয় যে, অন্য কারও কাছে বলবে না। এই ব্যক্তি আরও বেশি বলে বেড়ায়।

২৬। নিজের ঘরে সব সময় প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র রাখবেন।

২৭। যে-কোনো কাজ শুরু করার আগে তার ফলাফল নিয়ে চিন্তা করে নেবেন। তারপর কাজ শুরু করবেন।

২৮। চিনা ও সিসাজাতীয় পাত্র ও সামান প্রয়োজন ছাড়া কিনবেন না। এতে অনেক বেশি টাকা বরবাদ হয়।

২৯। ট্রেন সফরে অনেক সময় স্বামী-স্ত্রী ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বসে। তো যে স্টেশনে নামতে হবে, সেখানে পৌঁছে স্টেশনের নাম শুনে কিংবা প্লেটে লেখা দেখেই সাথে সাথে নেমে যাবেন না। অনেক শহরে একই নামের দুই স্টেশন থাকে। হতে পারে স্ত্রী এই স্টেশনে নেমে গেছে আর স্বামী অন্য স্টেশনে নেমেছে। তখন দুজনেই পেরেশান হবে। অথবা স্বামী ঘুমিয়ে আছে, তাই এখানে নামতে পারেনি আর স্ত্রী নেমে গেছে, তখনও বিপদে পড়তে হবে। এ জন্য স্বামী কিংবা ঘরের পুরুষ নিজের কাছে এলে তখন ট্রেন থেকে নামবেন।

৩০। সফরের সময় শিক্ষিত মহিলারা নিজের সাথে মাসআলার বই, কলম-কাগজ ও ওজু করার পাত্র সাথে রাখতে পারেন।

৩১। যে সফরে যাচ্ছে যথাসম্ভব তার কাছে কোনো ফরমায়েশ করবেন না; অমুক জায়গা থেকে আমার জন্য ওটা কিনে আনবে, ওখানে আমার একটা জিনিস আছে নিয়ে আসবে, এই জিনিসগুলো নিয়ে যাও অমুককে দিয়ে দেবে, এই চিঠি অমুকের কাছে পৌঁছে যাবে ইত্যাদি। এতে সফরকারীর কষ্ট হয়। তা ছাড়া সে যদি দায়িত্বশীল না হয়, তাহলে আপনার ক্ষতি হবে। চিঠি তো তিন পয়সা খরচ করলেই পাঠাতে পারেন, ট্রেনের মাধ্যমে যে-কোনো জিনিস আদান প্রদানও করতে পারেন, এ জন্য নিজের একটু লাভের জন্য অন্যদের ঝামেলায় ফেলানো ভালো কাজ নয়। অনেক কাজ হয় অনেক ছোট, কিন্তু তার ব্যবস্থা করতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়। তবে যদি কোনো জিনিস একেবারে আনতেই হয়, তাহলে সাথে সাথে দামও দিয়ে দিন। আর যদি সে রেলে আসা-যাওয়া করে, তাহলে কিছু অতিরিক্ত টাকাও দিয়ে দিন, হতে পারে তার কাছে নিজেরও সামান থাকবে আর সবকিছু মিলিয়ে ওজন করে ভাড়া দিয়ে আনতে হবে।

৩২। ট্রেনে বা অন্য কোনো সফরে অপরিচিত কেউ কোনো কিছু দিলে তা খাবেন না। কতিপয় খারাপ মানুষ খাবারের মধ্যে নেশা মিলিয়ে মালসামানা সবকিছু নিয়ে পালিয়ে যায়।

৩৩। ট্রেন সফরে তাড়াহুড়োর মধ্যে খেয়াল রাখবেন, আপনি যে ক্লাসের টিকিট কেটেছেন তার চেয়ে উন্নত ক্লাসে বসে যাচ্ছেন না তো! এটা চেনার সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি হলো, যে বগি যে রঙের সে বগির টিকিটও ওই রঙেরই হয়। যেমন : সবচেয়ে কম ভাড়া লাগে থার্ড ক্লাসে। তার রং

হয় হলুদ। তাহলে তার টিকিটের রংও হলুদ হবে। অতএব আপনি উভয়ের রং দেখে ক্লাস মিলিয়ে নেবেন।

৩৪। সেলানোর সময় কাপড়ে সুঁই আটকে গেলে দাঁত দিয়ে চাপ দিয়ে টান দেবেন না। অনেক সময় সুঁই ভেঙে অথবা পিছলে গিয়ে তালুতে আঘাত হানে।

৩৫। সব সময় নিজের কাছে একটি নেলকাটার রাখবেন। তাহলে কখনো নাপিতানি আসতে দেরি হলে নিজেই নখ কেটে আরামে থাকতে পারবেন।

৩৬। বাজার-ঘাটে যে সমস্ত ওষুধ বিক্রি হয়, অভিজ্ঞ বুঝমান কোনো ডাক্তারকে দেখিয়ে তার অনুমতি ব্যতিরেকে তা ব্যবহার করবেন না। বিশেষত চোখে এ জাতীয় ওষুধ কখনো ব্যবহার করবেন না।

৩৭। যে কাজের প্রতি নিজের পরিপূর্ণ ভরসা নেই, অন্যকেও কখনো ওই কাজের ভরসা দেবেন না। এতে কষ্ট ও ক্ষতি হয়।

৩৮। কারও কোনো কাজে বাঁ হাত দেবেন না কিংবা আগ বেড়ে পরামর্শ দেবেন না। তবে যার ওপর পূর্ণ ভরসা আছে কিংবা যে নিজে পরামর্শ চেয়েছে, তার ব্যাপারে কোনো সমস্যা নেই।

৩৯। কাউকে থেকে যাওয়ার ব্যাপারে কিংবা খানা খাওয়ানোর ব্যাপারে বেশি জোরাজুরি করবেন না। এতে অনেক সময় কষ্ট ও বিব্রতকর পরিস্থিতি তৈরি হয়। এমন সম্প্রীতি দেখিয়ে কী লাভ, যার কারণে ঘৃণা ও কষ্ট তৈরি হয়!

৪০। এত ভারি বোঝা ওঠাবেন না যা ওঠাতে বেশি কষ্ট হয়। আমি অনেক মানুষ দেখেছি, যারা বীরত্ব দেখাতে গিয়ে অনেক বেশি ওজন উঠিয়েছে এবং নিজের শরীরে কোনো না কোনো সমস্যা তৈরি করেছে, যার ফলে সারা জীবন তার কষ্ট করতে হয়েছে। বিশেষ করে মেয়ে ও মহিলারা এ ব্যাপারে অনেক বেশি সতর্ক থাকবেন। আপনাদের শরীরে জোড়া, রগ হাড্ডি অনেক নরম ও কমজোর হয়ে থাকে।

৪১। সুঁই ছুড়ি বা এ জাতীয় কোনো জিনিস কোথাও ফেলে রেখে উঠে যাবেন না। কেউ ভুলে এখানে বসে গেলে তার শরীরে বিদ্ধ হয়ে যাবে।

৪২। ওপর দিক থেকে কাউকে ভারি কিংবা আশঙ্কাজনক কোনো বস্তু দেবেন না। খানাপিনাও ওপর দিক থেকে দেবেন না, হাত থেকে ছুটে যেতে পারে।

৪৩। বাচ্চা বা ছাত্রদের শাস্তি দিতে চাইলে মোটা লাঠি কিংবা লাথি ঘুষি মেরে শাস্তি দেবেন না। আল্লাহ না করুন, যদি সংবেদনশীল কোনো জায়গায় লেগে যায়, তাহলে যায় যায় অবস্থা তৈরি হবে। তদ্রূপ চেহারা ও মাথায়ও মারবেন না।

৪৪। কোথাও মেহমান হিসেবে গেলে যদি আগে থেকেই খেয়ে এসে থাকেন, তাহলে গিয়েই তাদেরকে জানিয়ে দেবেন। কেননা ভদ্রতার খাতিরে তারা জিজ্ঞেসও করবে না এবং ভেতরে ভেতরে খাবারের চিন্তা করতে থাকবে। সময়ে-অসময়ে তারা কষ্ট করে খানা পাকিয়ে আনল আর আপনি তখন বলে দিলেন যে, আমি খেয়ে এসেছি, এমন সময় তাদের কী পরিমাণ আফসোস হবে! এ জন্য প্রথমেই বলে দেবেন। তদ্রূপ কেউ যদি আপনাকে দাওয়াত দেয় অথবা আপনাকে মেহমান হিসেবে রেখে দেয়, তাহলে ঘরের লোকদের থেকে অনুমতি নিয়ে তাদের জানিয়ে দেবেন যে, তাদের খানা পাকানোর প্রয়োজন নেই।

৪৫। কারও সাথে বন্ধুত্ব ও সখ্যতার সম্পর্ক থাকলে তার সাথে ক্রয়-বিক্রয়ের লেনদেন করা উচিত নয়। এমন স্থানে কথাও পরিষ্কার হয় না এবং চাহিদাও পূর্ণ হয় না। একজন মনে মনে একরকম মনে করে, আরেকজন অন্যরকম মনে করে। এর ফলাফল ভালো হয় না।

৪৬। চাকু ইত্যাদি দিয়ে দাঁত খোঁচাবেন না।

৪৭। পড়ুয়া বাচ্চাদের সর্বদা মস্তিষ্কের শক্তিবর্ধক খাবার খাওয়াবেন।

৪৮। যতদূর সম্ভব একা এক বাড়িতে থাকবেন না। কী কী ঘটনা ঘটে আল্লাহই মালুম। অনেকে এমন বাড়িতে কয়েকদিন পর্যন্ত মরে পড়ে ছিল, কিন্তু মানুষজন জানতেও পারেনি।

৪৯। ছোট বাচ্চাদের কুয়ার ওপর উঠতে দেবেন না। বাড়িতে কুয়া থাকলে তার ওপর তখতা ইত্যাদি দিয়ে তালা মেরে রাখবেন। বাচ্চাদের

হাতে জগ দিয়ে কখনো পানি আনতে পাঠাবেন না। হতে পারে সেখানে তারা নিজেরাই কুয়া থেকে বালতি দিয়ে পানি ওঠানো শুরু করে দেবে।

৫০। পাথর, শিল, ইট ইত্যাদি অনেকদিন যাবৎ একস্থানে রেখে দিলে তার নিচে বিচ্ছু ইত্যাদি পোকামাকড় জড়ো হয়। তাই এগুলো একটানে উঠিয়ে ফেলবেন না। বরং ভালো করে দেখেশুনে ওঠাবেন।

৫১। বিছানায় শোয়ার সময় কোনো কাপড় দিয়ে তা ঝেড়ে নিন। তাতে কোনো পোকামাকড় থেকে যেতে পারে।

৫২। রেশমি ও তুলাজাতীয় কাপড়ের ভাজে নিমের পাতা বা কাফুর রেখে দেবেন, তাহলে তার মধ্যে পোকা জড়ো হবে না।

৫৩। ঘরে কোথাও যদি টাকা-পয়সা গচ্ছিত রাখেন, তাহলে বাড়ির দুয়েকজন বিশ্বাসযোগ্য মানুষকেও তা জানিয়ে রাখবেন। এক মহিলা স্বামীর আয় থেকে পাঁচশ টাকা গচ্ছিত রেখে মারা গিয়েছিল। কিন্তু কোথায় রেখেছে তা কেউ জানত না। পুরো ঘর খোদার পরও পাওয়া যায়নি। বেচারা স্বামী গরিব মানুষ ছিল। ভেবে দেখেন, কী পরিমাণ কষ্ট সে পেয়েছে!

৫৪। অনেকে তালা লাগিয়ে চাবি এদিক-সেদিক ফেলে রাখে। পরে এর জন্য পেরেশান হতে হয়। এটা অনেক বড় ভুল।

৫৫। রাতের বেলা টাকা-পয়সা গুনলে আস্তে আস্তে গুনবেন। এর হাজারো দুশমন আছে।

৫৬। নির্জন বাড়িতে জ্বলন্ত দোয়াত ও আগুন রেখে যাবেন না। দিয়াশলাই জ্বলন্ত অবস্থায় ফেলে দেবেন না। তা ভালো করে নিভিয়ে ফেলবেন কিংবা ফেলে জুতা ইত্যাদি দিয়ে মলে নিভিয়ে দেবেন, যাতে তার মধ্যে আগুনের কোনো রেশ না থাকে।

৫৭। বাচ্চাদেরকে কখনো দিয়াশলাই, আগুন বা আতশবাজি দ্বারা খেলতে দেবেন না। আমার প্রতিবেশী এক বাচ্চা দিয়াশলাই খোঁচাচ্ছিল। জামায় আগুন লেগে পুরো বুক জ্বলে গেছে। এক জায়গায় আতশবাজির কারণে এক ছেলের হাত উড়ে গেছে।

৫৮। টয়লেট ইত্যাদি স্থানে দোয়াত নিয়ে গেলে সাবধানে রাখবেন, যেন কাপড়ে লেগে না যায়। অনেক মানুষ এভাবে জ্বলে গেছে। বিশেষত কেরোসিন তেল তো আরও ভয়ানক।[৩০৫]

কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ

১। কাউকে পুরান কথা নিয়ে খোঁচা দেবেন না। মহিলাদের একটি বদ অভ্যাস হলো, যে মামলা মাফ-সাফ হয়ে গেছে, নতুন করে বিবাদ লাগলে সেগুলোও স্মরণ করে ফেলে। এটা তো গুনাহের কাজ। পাশাপাশি এর কারণে মানুষের মনে পুনরায় কষ্ট ও দুঃখ বেড়ে যায়।

২। বাবার বাড়ি গিয়ে কখনো শ্বশুরবাড়ির ব্যাপারে অভিযোগ করবেন না। কিছু অভিযোগে গুনাহ হয়। তা ছাড়া এটা ধৈর্যহীনতার পরিচায়ক। অধিকাংশ সময় এর কারণে উভয় দিকে রেষারেষি বেড়ে যায়। তদ্রূপ শ্বশুরবাড়ি গিয়ে বাবার বাড়ির প্রশংসা কিংবা বড়াই করবেন না। এতে অনেক সময় গর্ব ও অহংকারের গুনাহ হয় আর শ্বশুরবাড়ির লোকজন মনে করে যে, বউ আমাদেরকে তুচ্ছ মনে করে। ফলে তারাও বউকে তুচ্ছ মনে করতে থাকে।

৩। বেশি কথা বলার অভ্যাস করবেন না। অনেক কথার মাঝে কিছু কথা অসংলগ্নও থেকে যায়। যার ফলে দুনিয়ায় রেষারেষি আর আখেরাতে গুনাহ হয়।

৪। যথাসম্ভব অন্যদের দ্বারা নিজের কাজ করাবেন না। নিজের কাজ নিজেই করবেন। বরং নিজে অন্যদের কাজ করে দেবেন। এতে আপনি সওয়াবও পাবেন আবার সকলের প্রিয়ভাজনও হয়ে যাবেন।

৫। অন্য মহিলাদের সাথে কখনো তর্কে জড়াবেন না। যারা এদিক-সেদিকের কথা এনে ঘরে লাগিয়ে দেয়, তাদের কথাও মনোযোগ দিয়ে শুনবেন না। এমন কথা শুনলে গুনাহও হয় এবং কখনো কখনো ঝগড়াও সৃষ্টি হয়।

---

[৩০৫] *বেহেশতী জেওর*, ১০ম খণ্ড।

৬। নিজের শাশুড়ি, ননদ, দেবরনি, জেঠানি বা নিকট ও দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়ের ব্যাপারে কোনো অভিযোগ শুনলে তা নিজের মনে চেপে রাখবেন না। বরং মন থেকে তা বের করে দেবেন। যদি এটা না পারেন, তাহলে যে বলেছে তাকে এবং যার ব্যাপারে বলেছে তাকে সামনাসামনি বসিয়ে বিষয়টি পরিষ্কার করে নেবেন। এতে ঝগড়া-বিবাদ বাড়বে না।

৭। চাকর-বাকরদের ওপর সর্বদা কঠোরতা করবেন না। নিজের সন্তানদেরও খোঁজ নেবেন, তারা যেন চাকরদের কিংবা তাদের সন্তানদের কষ্ট না দিতে পারে। কেননা তারা ভদ্রতার খাতিরে মুখে কিছু না বললেও মনে মনে ঠিকই অভিশাপ দেবে। অভিশাপ না দিলেও এই জুলুমের গুনাহ তো অবশ্যই হবে।

৮। অনর্থক কাজে নিজের সময় নষ্ট করবেন না। মেয়েদের কুরআন ও দ্বীন শিক্ষা দেওয়ার জন্য বড় একটা সময় হাতে রাখবেন। বেশি পড়াতে না পারলে কুরআন শরীফ পড়িয়ে বেহেশতী জেওর বইটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অবশ্যই পড়াবেন। মেয়ে, নিজের হোক বা পরের, তার মধ্যে যেন প্রয়োজনীয় যোগ্যতা থাকে, সেদিকে বিশেষ খেয়াল রাখবেন। তবে কুরআন শেষ করার আগ পর্যন্ত তাদের দিয়ে অন্য কোনো কাজ করাবেন না। কুরআন শেষ হলে সকালবেলা পড়াবেন, বিশ্রাম ও খাওয়া-দাওয়ার পর লেখাবেন। তারপর আস্তে আস্তে তাদেরকে খানা পাকানো ও কাপড় সেলানোর কাজ শেখাবেন।

৯। যে মেয়েরা আপনার কাছে পড়তে আসবে, তাদের দিয়ে ঘরের কাজ করাবেন না। তাদের দিয়ে নিজের বাচ্চা সামলাবেন না। বরং তাদেরকেও নিজ সন্তানের মতোই দেখবেন।

১০। অযথা নিজের মনে কোনো দুশ্চিন্তার জায়গা দেবেন না।

১১। কোথাও আসা-যাওয়ার সময় এমন অভ্যাস গড়বেন না যে, জামা অবশ্যই পাল্টাতে হবে কিংবা অলংকার পরতে হবে। কেননা এতে অনেকের নিয়ত থাকে এমন যে, সবাই এগুলো দেখে আমাকে বড় মনে করবে। এই নিয়তের কারণে তো গুনাহ হয়ই, তা ছাড়া এসবের কারণে পথ চলতেও দেরি হয়। যার ফলে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা হয়। তাই

সাদাসিধে রুচির অধিকারী হোন। যে জামা পরে আছেন, এটা নিয়েই চলে যান। যদি জামা ময়লা হয়ে গিয়ে থাকে অথবা কোনো সমস্যা থাকে, তাহলে সংক্ষেপে অল্প সময়ে জামাটি পরিবর্তন করে নিন।

১২। কারও থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার সময় তার বংশের কিংবা মৃত লোকদের দোষত্রুটির কথা উল্লেখ করবেন না। এতে গুনাহও হয়, অন্যের মনে কষ্টও দেওয়া হয়।

১৩। অন্যের জিনিস ব্যবহার শেষ হলে কিংবা পাত্র খালি হয়ে গেলে সাথে সাথে তা ফেরত দিয়ে দেবেন। ঘটনাক্রমে তাদের কাছে ফেরত পাঠানোর মতো কাউকে না পেলে নিজের ব্যবহৃত জিনিসপত্রের সাথে তা মিলিয়ে রাখবেন না। বরং একেবারে আলাদা রাখবেন, যেন তা নষ্ট না হয়ে যায়। তা ছাড়া অনুমতি ব্যতীত কারও জিনিস ব্যবহার করা গুনাহের কাজ।

১৪। উৎকৃষ্ট মানের খাবার খেতে অভ্যস্ত হবেন না। সময় সদা একরকম থাকে না। অনেক সময় অনেক কষ্ট পোহাতে হয়।

১৫। কেউ অল্প উপকার করলেও তা কখনো ভুলবেন না। আর নিজের উপকার যত বড়ই হোক, বলে বেড়াবেন না।

১৬। অবসর সময়ের সবচেয়ে উত্তম কাজ হলো বইপত্র পড়া। যেসব বইয়ের প্রভাব ভালো না, যেমন গল্প-উপন্যাস ও অগ্রহণযোগ্য বইপত্র, কখনো তা পড়বেন না।

১৭। কখনো চিৎকার দিয়ে কথা বলবেন না। ঘরের বাইরে আওয়াজ যাবে, এটা তো অনেক লজ্জার বিষয়।

১৮। যদি রাতে উঠে দেখেন ঘরের সকলেই ঘুমাচ্ছে, তাহলে কোনো ধরনের আওয়াজ করবেন না এবং জোরে কথা বলবেন না। আপনি তো প্রয়োজনে জেগেছেন, অন্যদের কেন জাগাবেন! এ সময় যে কাজই করবেন আস্তেধীরে করবেন। দরজা আস্তে খুলবেন, পানি আস্তে পান করবেন, থুথু আস্তে ফেলবেন, জানালা আস্তে বন্ধ করবেন, আস্তে আস্তে পা ফেলবেন।

১৯। বড়দের সাথে হাসিঠাট্টা করবেন না। এটা বেয়াদবি। ছোটদের সাথে একদম খোলামেলা হয়ে যাবেন না, তাহলে তারা বেয়াদব হয়ে যাবে। অতঃপর সে আপনার সাথে অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণ করবে অথবা অন্য কোথাও গিয়ে লজ্জিত হবে।

২০। কারও সামনে নিজের পরিবারের কিংবা সন্তানদের প্রশংসা করবেন না।

২১। কোনো মজমায় সবাই দাঁড়িয়ে গেলে আপনি বসে থাকবেন না। এতে অহংকারের গন্ধ পাওয়া যায়।

২২। দুজনের মাঝে যদি রেষারেষি থেকে থাকে, তাহলে তাদের কাছে এমন কোনো কথা বলবেন না, যাতে তাদের মিল হয়ে গেলে আপনাকে লজ্জিত হতে হয়।

২৩। যখন টাকা-পয়সা কিংবা নরম ভাষায় কাজ আদায় করা সম্ভব হয়, তখন কঠোরতা করবেন না এবং কোনো ঝুঁকিও নেবেন না।

২৪। মেহমানের সামনে কারও ওপর রাগ করবেন না। এতে মেহমানের মন আগের মতো প্রশস্ত থাকে না।

২৫। শত্রুর সাথেও উত্তম ব্যবহার করুন। এতে শত্রুতা বাড়বে না।

২৬। রুটি কিংবা খাবারের টুকরা কোথাও দেখলে এমনিতেই ফেলে রাখবেন না। উঠিয়ে পরিষ্কার করে নিজে খেয়ে নিন অথবা কোনো প্রাণীকে দিয়ে দিন। আর যে দস্তরখানে ময়লা আছে, তা এমন স্থানে ঝাড়বেন না যেখানে অন্যরা চলাফেরা করে।

২৭। খানা খাওয়ার পর থালা রেখেই উঠে যাবেন না। এটা বেয়াদবি। বরং প্রথমে থালা উঠিয়ে দেবেন, তারপর নিজে উঠবেন।

২৮। মেয়েরা যেন ছেলেদের সাথে না খেলে এর প্রতি বিশেষ জোর দেবেন। কেননা এতে উভয়ের স্বভাব নষ্ট হয়। অপরিচিত কোনো ছেলে ঘরে এলে সে ছোট হলেও ঘরের মেয়েরা যেন সেখান থেকে সরে যায়।

২৯। কারও সাথে হাত-পা দিয়ে ঠাট্টা করবেন না। হতে পারে সে কোনো কারণে ব্যথা পেতে পারে। তদ্রূপ কারও সাথে মুখ দিয়েও ঠাট্টা করবেন না। এটা বারংবার হলে নিজের অবস্থান নষ্ট হয়। অনেকে বরযাত্রীর সাথে ঠাট্টা করে, এটাও ঠিক নয়।

৩০। বড়দের সাথে তাদের সমান জায়গায় বসবেন না। তবে যদি তারা বসতে বলে তাহলে আদবের সাথে তাদের কথা মানবেন।

৩১। কারও থেকে কোনো জিনিস চেয়ে নিলে তার ব্যাপারে খুব সতর্ক থাকবেন। কাজ শেষ হয়ে গেলে সাথে সাথে তা ফিরিয়ে দেবেন। এই আশায় থাকবেন না যে, সে চাইলে তারপর দেবো। কেননা সে তো জানে না আপনার কাজ শেষ হয়েছে কি না। উপরন্তু সে শরমের কারণে চাইতেও পারে না। হতে পারে সে ভুলে গিয়েছে। তখন তার নিজের প্রয়োজনের সময় তাকে পেরেশান হতে হয়। তদ্রূপ কারও থেকে ঋণ নিলেও এ ব্যাপারে সতর্ক থাকবেন। যখন যতটুকু সামর্থ্য হবে পরিশোধ করে দেবেন।

৩২। যদি কখনো অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে রাতে পায়ে হেঁটে কোথাও যেতে হয়, তাহলে ছাতা ইত্যাদি নিজের হাতে নিয়ে নেবেন।

৩৩। কেউ একাকী এক ঘরে দরজা বন্ধ করে শুয়ে থাকলে হুট করে দরজা খুলে ভেতরে প্রবেশ করবেন না। সে উলঙ্গ হয়ে থাকতে পারে, ঘুমিয়ে থাকতে পারে; আপনার কারণে তার বিঘ্ন সৃষ্টি হবে। এ অবস্থায় প্রথমে আস্তে আস্তে তাকে ডাকবেন এবং তার থেকে ভেতরে যাওয়ার অনুমতি নেবেন। সে অনুমতি দিলে ভেতরে যাবেন। অন্যথায় চুপ থাকবেন। অন্য সময় আসবেন। যদি বিশেষ কোনো প্রয়োজন দেখা দেয়, তাহলে তাকে ডেকে জাগ্রত করুন। যতক্ষণ সে জাগ্রত না হয়, ভেতরে যাবেন না।

৩৪। অচেনা মানুষের সামনে কোনো দেশ বা জাতির নিন্দা করবেন না। সে যদি ওই দেশ বা জাতির হয়ে থাকে তাহলে আপনাকে লজ্জিত হতে হবে।

৩৫। তদ্রূপ কোনো কাজের কর্তা জানা না থাকলে এ জাতীয় কথা বলবেন না যে, কোন বেকুব এই কাজ করেছে। কেননা যদি এই কাজ এমন কোনো ব্যক্তি করে থাকে যার প্রতি আপনার ভক্তি ও শ্রদ্ধা আছে, তাহলে আপনাকে লজ্জিত হতে হবে।

৩৬। আপনার বাচ্চা যদি কোনো দোষ-ত্রুটি করে, তাহলে কখনো তার পক্ষে কথা বলবেন না। বিশেষত বাচ্চার সামনে এমন করলে তার স্বভাব বিগড়ে যায়।

৩৭। মেয়েকে বিয়ে দেওয়ার সময় সবচেয়ে বেশি খেয়াল করবেন, ছেলের মধ্যে আল্লাহর ভয় ও দ্বীনদারি আছে কি না। এমন মানুষ স্ত্রীকে সর্বদা শান্তিতে রাখে। যদি অনেক ধনসম্পদ থাকে কিন্তু দ্বীন না থাকে, তাহলে ওই ব্যক্তি তো নিজ স্ত্রীর অধিকার সম্পর্কেই জানে না, তাহলে সে কীভাবে স্ত্রীকে শান্তিতে রাখবে; বরং দেখা যাবে টাকা-পয়সাও ঠিকমতো দেবে না, তাকে আরও বেশি কষ্ট দেবে।

৩৮। অনেক মহিলা পর্দার ভেতর থেকে কাউকে ডাকতে চাইলে কোথাও আড়ালে দাঁড়িয়ে ঢিল ছোঁড়ে। অনেক সময় তা অন্যের গায়ে লেগে যায়। এমন কাজ করা উচিত নয়, যাতে অন্যের কষ্ট পাওয়ার আশঙ্কা আছে। এ পরিস্থিতিতে নিজের স্থানে থেকেই ইট ইত্যাদি দিয়ে খটখটানো উচিত।

৩৯। নিজের কাপড়ে সুঁই সুতা দিয়ে ফুল ইত্যাদির নকশা এঁকে দেবেন। তাহলে ধোপার কাছে গেলে কাপড় পরিবর্তন হবে না। অন্যথায় ভুলে আপনি অন্যজনের, অন্যজন আপনার কাপড় ব্যবহার করে শুধু শুধু গুনাহগার হবেন এবং পার্থিব ক্ষতিও হবে।

৪০। আরব দেশের একটি নিয়ম হলো, কেউ কোনো মুরব্বি থেকে কোনো জিনিস বরকতস্বরূপ নিতে চাইলে নিজের পক্ষ থেকে ওই জিনিস মুরব্বির কাছে নিয়ে যায় এবং বলে, আপনি এই জিনিসটা দুয়েকদিন ব্যবহার করে আমাকে দিয়ে দিন। এতে করে মুরব্বির কোনো ঝামেলায় পড়তে হয় না। অন্যথায় বিশজন মানুষ যদি মুরব্বির কাছে একটি একটি করে কাপড় চায়, তাহলে তার নিজের জন্য তো একটি লুঙ্গিও থাকবে না। আমাদের দেশে বেধড়ক চাইতে থাকে। অনেক সময় মুরব্বিকে চিন্তায়

ফেলে দেয়। আমরাও যদি এ ক্ষেত্রে আরবের নিয়ম অনুসরণ করি, তাহলে অনেক ভালো হবে।

৪১। কেউ নিজের পক্ষ থেকে কিছু বলার পর আপনি তার প্রতিউত্তর দিতে চাইলে নিজের পক্ষ থেকে দেবেন। অন্যের নাম নিয়ে এভাবে বলবেন না যে, তুমি তো এমন বলছ, অথচ অমুকে তো এমন বলে। কেননা অন্যজনকে যদি সে কিছু বলে দেয়, তাহলে সে তা শুনে কষ্ট পাবে।

৪২। শুধু ধারণার বশবর্তী হয়ে তদন্ত না করে কারও ব্যাপারে কিছু বলবেন না। এতে মন ব্যথিত হয়।[৩০৬]

বাচ্চাদের ব্যাপারে বিশেষ সতর্কতা

১। প্রতিদিন বাচ্চার হাত মুখ গলা কান ইত্যাদি ভেজা কাপড় দিয়ে ভালো করে পরিষ্কার করে দেবেন। ময়লা জমলে গোশত গলে জখম হয়ে যায়।

২। পেশাব-পায়খানা করলে সাথে সাথে পানি দিয়ে ধুয়ে দিন। শুধু নেকড়া দিয়ে মুছে দিয়ে ক্ষান্ত থাকবেন না। এতে বাচ্চাদের শরীরে চুলকানি ও প্রদাহ হয়ে যায়। শীতের দিন হলে পানি হালকা গরম করে নেবেন।

৩। বাচ্চাকে আলাদা শোয়াবেন এবং তার নিরাপত্তার স্বার্থে তার দুই পাশে দুটি বালিশ দিয়ে রাখবেন, যেন সে পড়ে না যায়। বাচ্চাকে পাশে শোয়ালে এই আশঙ্কা থাকে যে, আপনি কাত পরিবর্তন করার সময় সে আপনার নিচে চলে আসবে। তাদের হাত-পা তো এমনিতেই নরম থাকে, তথাপি যদি বড় ধরনের আঘাত পায় তাহলে দুর্ঘটনা ঘটা কোনো আশ্চর্যের বিষয় নয়। এক জায়গায় এমন ঘটনায় বাচ্চা মারাই গিয়েছে।

৪। বাচ্চাকে খুব বেশি দোলনায় অভ্যস্ত করবেন না। কেননা সব জায়গায় দোলনা থাকে না। বাচ্চাদের বেশিরভাগ সময় কোলে রাখবেন না, এতে তারা দুর্বল হয়ে যায়।

---

[৩০৬] *বেহেশতী জেওর*, ১০ম খণ্ড।

৫। ছোট বাচ্চারা যেন সকলের কাছে আসা-যাওয়া করে এর অভ্যাস গড়ে তুলবেন। এক ব্যক্তির কোলে থেকে অভ্যস্ত হয়ে গেলে সে মারা গেলে কিংবা দূরে চলে গেলে বাচ্চা বিপদে পড়ে যাবে।

৬। বাচ্চাকে যদি ধাত্রী মার দুধ পান করাতে হয়, তাহলে এমন মহিলা বাছাই করতে হবে, যে যুবতি এবং যার দুধ তাজা; অর্থাৎ তার বাচ্চার বয়স যেন ছয়-সাত মাস হয়। পাশাপাশি তার স্বভাব-চরিত্র যেন ভালো হয় এবং সে যেন হয় দ্বীনদার। আহমক, বেশরম, কৃপণ, চরিত্রহীন ও লোলুপ যেন না হয়।

৭। বাচ্চা খাওয়া-দাওয়া শুরু করলে তার খাবারের ভার শুধু ধাত্রী কিংবা অন্য কারও ওপর ন্যস্ত করেই ক্ষান্ত থাকবে না; বরং নিজে কিংবা নিজের নির্ভরযোগ্য কারও উপস্থিতিতেই খানা খাওয়াবে। তাহলে এলোমেলো খেয়ে বাচ্চা অসুস্থ হবে না। তদ্রূপ ওষুধ-পথ্য খাওয়ানোর ব্যাপারেও একই পদ্ধতি অবলম্বন করবে।

৮। বাচ্চা একটু বুঝমান হয়ে গেলে তাকে নিজ হাতে খাওয়ার অভ্যাস করাবেন। খাওয়ার আগে হাত ধোয়াবেন, ডান হাতে খাওয়াবেন এবং কম খাওয়ায় অভ্যস্ত করবেন, যেন অসুস্থ না হয়ে যায় এবং লোভ-লালসা থেকে বেঁচে থাকে।

৯। মা-বাবা ও দায়িত্বশীলগণ খেয়াল রাখবেন, বাচ্চা যেন সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে।

১০। সম্ভব হলে বাচ্চার সাথে সব সময় একজন লোক থাকবে। খেলাধুলার সময় তার খেয়াল রাখবে। বেশি দৌড়াতে ও লাফাতে দেবে না। উঁচু স্থানে গিয়ে খেলতে দেবে না। ভালো মানুষের বাচ্চাদের সাথে খেলাবে। খারাপ মানুষের বাচ্চাদের সাথে খেলতে দেবে না। গলি ও সড়কে খেলতে দেবে না। তাকে নিয়ে বাজার-ঘাটে ঘুরবে না। তার সকল চালচলন দেখে প্রত্যেক স্থান অনুযায়ী তাকে আদব-কায়দা শেখাবে এবং তাকে অনর্থক কাজ থেকে বাধা দেবে।

১১। বাচ্চাকে খাওয়ানোর দায়িত্বে যে থাকবে তাকে বলে দিতে হবে, যেখানে-সেখানে গিয়ে যেন বাচ্চাকে কিছু না খাওয়ায়। কেউ কিছু খেতে দিলে বাসায় এনে বাবা-মাকে দেখিয়ে যেন খাওয়ায়।

১২। বাচ্চাদের এই অভ্যাস গড়ে তুলবেন, তারা যেন নিজের লোকদের ব্যতীত অন্য কারও কাছে কিছু না চায় এবং তাদের অনুমতি ব্যতীত কেউ কিছু দিলে তা গ্রহণ না করে।

১৩। বাচ্চাকে অতিরিক্ত আদর-সোহাগ করবেন না। তাহলে সে বিগড়ে যাবে।

১৪। বাচ্চাকে একেবারে আঁটোসাঁটো জামা পরাবেন না। অধিক বোতামবিশিষ্ট জামাও দেবেন না। তবে ঈদ উৎসবে আলাদা জামা দেওয়ায় কোনো সমস্যা নেই।

১৫। বাচ্চাকে মিসওয়াক ও ব্রাশের অভ্যাস করাবেন।

১৬। এই বইয়ের বিভিন্ন অধ্যায়ে খানাপিনা, কথা বলা ও পথচলার যে আদবসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে, বাচ্চাকে তাতে অভ্যস্ত করে তুলবেন। এই আশায় থাকবেন না যে, বড় হয়ে নিজে নিজে শিখে নেবে অথবা বড় হলে পড়িয়ে দেবো। মনে রাখবেন, নিজে নিজে কেউ কিছু শিখতে পারে না, পড়ে জানতে পারলেও অভ্যাস গড়তে পারে না। কেউ ভালো কাজে অভ্যস্ত না হলে সে যতই পড়াশোনা করে ফেলুক, তার থেকে সর্বদা বেয়াদবি এবং কষ্টদায়ক আচরণ ও কাজই প্রকাশ পায়।

১৭। বাচ্চাকে পড়ার জন্য বেশি চাপ দেবেন না। প্রথম দিকে এক ঘণ্টা নির্ধারণ করে দেবেন। তারপর দুই ঘণ্টা তারপর তিন ঘণ্টা, এভাবে তার শক্তি-সামর্থ্য অনুযায়ী তাকে মেহনত করাবেন। সারা দিন পড়াতে থাকবেন না। বিরক্তির কারণে বাচ্চা মনে কষ্ট পেতে থাকবে। উপরন্তু অতিরিক্ত মেহনতের কারণে মন-মস্তিষ্ক খারাপ হয়ে মেধা ও মুখস্থশক্তি দুর্বল হয়ে যায় এবং অসুস্থের মতো অলস অবস্থায় পড়ে থাকে, যার পর আর পড়ালেখায় মন বসে না।

১৮। জরুরি প্রয়োজন ব্যতীত নির্দিষ্ট ছুটি ছাড়া অন্য কোনো ছুটি নেবেন না, এতে বাচ্চার স্বভাব নষ্ট হয়।

১৯। যতদূর সম্ভব যে জ্ঞান বা যে শাস্ত্র শেখাবেন, এমন ব্যক্তি থেকে শেখাবেন যে এই বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞানী। অনেকে সস্তায় শিক্ষক রেখে বাচ্চাকে

শিক্ষা দেয়। ফলে শুরু থেকেই ভুল পদ্ধতিতে পাঠদান শুরু হয়, পরবর্তীতে তা ঠিক করা মুশকিল হয়ে যায়।

২০। কঠিন পড়ার জন্য ভোরের সময় এবং সহজ পড়ার জন্য দুপুরের সময় নির্বাচন করবেন। শেষ সময়ে মনমেজাজ ক্লান্ত হয়ে যায়, ফলে কঠিন পড়া তাদের কাছে ভীতিকর মনে হয়।

২১। বাচ্চাদেরকে বিশেষত মেয়েদেরকে রান্না ও সেলানোর কাজ শিখিয়ে দেবেন।

২২। বিয়ের সময় বর-কনের বয়সে বেশি পার্থক্য হওয়ায় অনেক ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হয়।

২৩। বেশি অল্প বয়সে বিয়ে করবেন না। এতেও অনেক ক্ষতি হয়।

২৪। ছেলেদের শিক্ষা দেবেন, কারও সামনে বিশেষত মেয়ে ও মহিলাদের সামনে যেন ঢিলা-কুলুপ ব্যবহার না করে।[৩০৭]

নবীজীর সংক্ষিপ্ত জীবনী ও উত্তম চরিত্রাবলি

নবীজীর বরকতময় নাম মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। পিতার নাম আব্দুল্লাহ। মাতার নাম আমেনা। পিতার দিকের বংশলতিকা : মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল মুত্তালিব, আব্দুল মুত্তালিব ইবনে হাশেম, হাশেম ইবনে আব্দে মানাফ। মায়ের দিকের বংশলতিকা : আমেনা বিনতে ওয়াহাব, ওয়াহাব ইবনে আব্দে মানাফ, আব্দে মানাফ ইবনে যাহরা।[৩০৮]

জনৈক কাফের বাদশাহ হস্তীবাহিনীর সাহায্যে বায়তুল্লাহ বিনাশ করার সংকল্পে মক্কায় আক্রমণের বছর রবিউল আউয়াল মাসে সোমবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পাঁচ বছর দুদিন বয়সে তাঁর ধাত্রীমাতা তাঁকে নিজের মায়ের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন। ছয় বছর বয়সে তাঁর মাতা তাঁকে নিয়ে

---

[৩০৭] *বেহেশতী জেওর*, ১০ম খণ্ড।

[৩০৮] পিতামহের আব্দে মানাফ আর মাতৃমহের আব্দে মানাফ ভিন্ন ব্যক্তি।

বনি নাজ্জারে নানা বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে এক মাস অবস্থান করেন। ফেরার পথে 'আবওয়া' নামক স্থানে সম্মানিতা মাতা ইন্তেকাল করেন। সফরকালে উম্মে আয়মান সাথে থাকায় তিনি নবীজীকে মক্কায় নিয়ে আসেন। মাতৃগর্ভে থাকা অবস্থায় পিতার ছায়া মাথা থেকে সরে যায়। সে সুবাদে সম্মানিত দাদা তাঁর প্রতিপালনের দায়িত্ব গ্রহন করেন। কিছুদিন না যেতেই সম্মানিত দাদাও ইন্তেকাল করেন। দাদার পরে স্বীয় চাচা আবু তালেব তাঁর প্রতিপালনের দায়ভার গ্রহণ করেন।

চাচা আবু তালেন শাম শহরের বাণিজ্যিক সফরে তাঁকে সাথে নিয়েছিলেন। সফরকালে 'বুহায়রা' নামক খ্রিষ্টান পাদরি ও সাধক নবীজীকে দেখতে পেয়ে আবু তালেবকে গুরুত্ব সহকারে বললেন, তাঁকে হেফাজতে রেখো, কেননা তিনি নবী হবেন। ফলে তিনি তাঁকে মক্কায় পাঠিয়ে দিলেন। পরবর্তীতে তিনি খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহার ব্যবসায়ী সম্পদ নিয়ে শামের উদ্দেশে রওনা করেন। পথিমধ্যে খ্রিষ্টধর্মের 'নাসতুরা' নামক আলেম ও দরবেশ তাঁর নবুওয়তের ভবিষ্যদ্বানী করেন। ব্যবসায় সফর থেকে ফেরার পর পঁচিশ বছর বয়সে তিনি হযরত খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহার সাথে বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হন। বিবাহকালে হযরত খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহার বয়স ছিল চল্লিশ বছর।

চল্লিশ বছর বয়সে নবীজী নবুওয়াতপ্রাপ্ত হন এবং বায়ান্ন বা তিপ্পান্ন বছর বয়সে তিনি মিরাজে গমন করেন। নবুওয়াতপ্রাপ্তির পর তেরো বছর তিনি মক্কায় অবস্থান করেন। পরবর্তীতে কাফেরদের অত্যাচারের দরুন আল্লাহর আদেশে তিনি মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেন। মদীনায় তিনি দশ বছর জীবনযাপন শেষে রজব মাসের আটাশ তারিখে অসুস্থ হয়ে পড়েন। রবিউল আওয়াল মাসের বারো তারিখ সোমবারে চাশতের সময় তেষট্টি বছর বয়সে তিনি পরম বন্ধুর সান্নিধ্যে দুনিয়ার সফর শেষ করেন। মঙ্গলবারে দ্বিপ্রহরে মতান্তরে দিবাগত রাতে তাঁকে দাফন করা হয়।

নবীজী আন্তরিকভাবে অত্যন্ত দানশীল ছিলেন। কোনো সাহায্যপ্রার্থীকে কখনো 'না' বলেননি। যদি দেওয়ার মতো কোনো বস্তু থাকত সাথেসাথেই দিয়ে দিতেন, অন্যথায় নম্রতার সাথে পরবর্তী সময়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিতেন। নবীজী অত্যন্ত সত্যবাদী ছিলেন। তিনি কোমল স্বভাবের মানুষ

ছিলেন। সব বিষয়ে তিনি সহজতা ও মধ্যমপন্থা অবলম্বন করতেন। নিজের সাথে চলাফেরাকারীদের অত্যন্ত খেয়াল রাখতেন, যাতে তাঁর পক্ষ থেকে কেউ কোনো কষ্টের সম্মুখীন না হয়। এমনকি রাতের বেলায় ঘরের বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন হলে খুবই সতর্কতার সাথে জুতা পরতেন। সাবধানে দরজা খুলতেন। খুবই সতর্কতার সাথে চলতেন। ঘরে ফিরে এসে কাউকে ঘুমন্ত পেলে নিঃশব্দে সমস্ত কাজ সমাপ্ত করতেন, যাতে কোনো ঘুমন্ত ব্যক্তির ঘুমে ব্যাঘাত সৃষ্টি না হয়।

স্বীয় দৃষ্টি সর্বদা জমিনের দিকে রাখতেন। সামনে কাউকে দেখামাত্রই নিজেই প্রথমে সালাম দিতেন। অধিকাংশ সময় চুপ থাকতেন। বিনা প্রয়োজনে কথা বলতেন না। তিনি অত্যন্ত স্পষ্টভাষী ছিলেন, বিধায় কাউকে কিছু বললে শ্রোতা খুব ভালোভাবেই বুঝতে পারতেন। প্রয়োজন ছাড়া দীর্ঘ কথাবার্তা এবং প্রয়োজনীয় কথা অস্পষ্টভাবে বলতেন না। আল্লাহ তাআলার ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্র নেয়ামত নবীজী ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন। কখনো দোষ বের করার উদ্দেশ্যে বলতেন না যে, এর স্বাদ ভালো নয় অথবা তাতে দুর্গন্ধ আসছে। যে জিনিস পছন্দ হতো না তা নিজেও খেতেন না, তার প্রশংসাও করতেন না এবং দোষ-ত্রুটিও প্রকাশ করতেন না।

ধনী-গরিব কেউ অসুস্থ হলে তার খোঁজ খবর নিতেন। কেউ মৃত্যুবরণ করলে তার জানাযায় শরিক হতেন। সাধারণ থেকে সাধারণ কেউ নবীজীকে দাওয়াত দিলেও দাওয়াত কবুল করতেন। এমন কোনো আচরণ করতেন না, যাতে অন্যরা ঘাবড়ে যায়। অত্যাচারীর অনিষ্ট থেকে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে নিজেকে রক্ষা করতেন এবং অত্যাচারীর সামনে প্রফুল্ল চিত্ত ও খোশ মেজাজে আত্মপ্রকাশ করতেন। নিজ দরবারে আগমনকারীদের কেউ অনুপস্থিত থাকলে তার খোঁজ-খবর নিতেন। সমস্ত কার্যাবলি একই পন্থায় করতেন। যাচ্ছেতাই পদ্ধতি অবলম্বন করতেন না।

উঠাবসায় আল্লাহকে স্মরণ করতেন। কোনো মজলিসে আগমন করলে সাধারণ মানুষের পাশে বসে যেতেন। সবাইকে ডিঙিয়ে উঁচু স্থানে বসতেন না। গৃহস্থালি বহু কার্যাদি স্বীয় হস্তে সম্পাদন করতেন। কখনো বকরির দুধ দোহন করতেন, কখনো নিজের পোশাক-পরিচ্ছদ ধৌত করতেন। নিজের

অধিকাংশ কাজ নিজেই করতেন। যতই খারাপ মানুষ তাঁর দরবারে মেহমান হিসেবে আগমন করুক, তিনি তার সাথে দয়াসলুভ আচরণ করতেন। তাকে কোনো ধরনের কষ্ট দিতেন না। মোটকথা সমস্ত মানুষ থেকে তিনিই অত্যন্ত খোশ স্বভাবের মানুষ ছিলেন।

শোরগোল করা তিনি পছন্দ করতেন না। কেউ তাঁর সাথে মন্দ আচরণ করলেও তিনি তার সাথে খারাপ আচরণ করতেন না, বরং ক্ষমা করে দিতেন। তিনি সর্বদা হাস্যোজ্জ্বল থাকতেন। চোখে-মুখে বিরক্তিভাব প্রকাশ করতেন না। তিনি নরম স্বভাবের মানুষ ছিলেন। কথাবার্তা ও আচরণে কঠোরতা অবলম্বন করতেন না এবং তিনি অযথা কথা বলতেন না। মনের ভাব দ্বিধাহীন প্রকাশ করতেন। কারও দোষচর্চা ও দোষারোপ করতেন না এবং কারও সাথে মন্দ আচরণ করতেন না। পুণ্যমিশ্রিত কথাবার্তাই তাঁর জবান মোবারক থেকে নিঃসৃত হতো।[৩০৯]

কতিপয় সত্য ঘটনা

প্রথম ঘটনা

হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, জনৈক ব্যক্তি কোনো এক জঙ্গলে ঘুরাফিরা করছিল। হঠাৎ সে এক মেঘমালা থেকে আওয়াজ শুনতে পেল যে, অমুকের বাগিচায় পানি দাও। আওয়াজের সাথে সাথেই মেঘখণ্ডটি গিয়ে একটি বাগানে প্রচুর বারিধারা বর্ষণ করল এবং সমস্ত পানি একটি নালায় একত্রিত হয়ে চলতে লাগল। উক্ত লোকটি পানির পিছু পিছু অগ্রসর হয়ে দেখতে পেল যে, একজন ব্যক্তি নিজ বাগানে দাঁড়িয়ে বেলচা দিয়ে পানি ভরছে। সে বাগানের মালিককে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর বান্দা! তোমার নাম কী? সে ওই নামটিই বলল যা সে মেঘমালা থেকে শ্রবণ করেছিল।

অতঃপর বাগানের মালিক তাকে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর বান্দা! তুমি আমার নাম কেন জিজ্ঞেস করছ? প্রতিউত্তরে সে বলল, যে মেঘমালা থেকে পানি বর্ষিত হয়েছে, তা থেকে আমি শ্রবণ করেছি যে, সে আপনার

---

[৩০৯] *বেহেশতী জেওর*, ৮/৪১৬।

নাম নিয়ে বলছে তার বাগানে পানি দাও। এখন আপনি বলুন, আপনি কী আমল করেন এবং কীভাবে আল্লাহর নিকট এত প্রিয় হলেন? সে বলল, তোমার প্রশ্নের উত্তর প্রদানে বলতে বাধ্য হচ্ছি, এই বাগিচায় উৎপন্ন ফসলাদির এক-তৃতীয়াংশ আল্লাহর রাস্তায় দান করি, এক-তৃতীয়াংশ নিজ পরিবারের জন্য সংরক্ষণ করি এবং এক-তৃতীয়াংশ বাগানের মাঝে বপন করি।[৩১০]

ফায়দা : সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ তাআলার কতই-না অনুগ্রহ। যে তাঁর আনুগত্য প্রদর্শন করে তার যাবতীয় প্রয়োজনাদি তার অজ্ঞাতসারে গায়েবীভাবে এভাবেই সম্পাদন হয়ে যায়। নিঃসন্দেহে যে আল্লাহর হয়ে যায়, আল্লাহই তাআলা তার জন্য যথেষ্ট।

দ্বিতীয় ঘটনা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার এরশাদ করেন, বনী ইসরাঈলের মধ্যে তিনজন লোক ছিল। একজন শ্বেতরোগী, একজন মাথায় টাকওয়ালা আর একজন অন্ধ। মহান আল্লাহ তাদেরকে পরীক্ষা করতে চাইলেন। কাজেই তিনি তাদের কাছে একজন ফেরেশতা পাঠালেন। ফেরেশতা প্রথমে শ্বেত রোগীটির নিকট এলেন এবং তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কাছে কোন জিনিস বেশি প্রিয়?

সে জবাব দিল, সুন্দর রং ও সুন্দর চামড়া। কেননা, মানুষ আমাকে ঘৃণা করে। ফেরেশতা তার শরীরের ওপর হাত বুলিয়ে দিলেন। ফলে তার রোগ সেরে গেল। তাকে সুন্দর রং এবং সুন্দর চামড়া দান করা হলো। তারপর ফেরেশতা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কোন ধরনের সম্পদ তোমার কাছে বেশি প্রিয়? সে জবাব দিল, 'উট'। অতএব তাকে একটি দশ মাসের গর্ভবতী উটনী দেওয়া হলো। তখন ফেরেশতা বললেন, 'এতে তোমার জন্য বরকত হোক।'

অতঃপর ফেরেশতা টাকওয়ালার কাছে গেলেন এবং বললেন, তোমার কাছে কোন জিনিস পছন্দনীয়? সে বলল, সুন্দর চুল এবং আমার থেকে

---

[৩১০] *সহীহ মুসলিম; মিশকাত শরীফ*, পৃষ্ঠা : ১৬৪; *বেহেশতী জেওর*, ১/৪০।

যেন এ রোগ চলে যায়। মানুষ আমাকে ঘৃণা করে। ফেরেশতা তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন এবং তৎক্ষণাৎ মাথার টাক চলে গেল। তাকে (তার মাথায়) সুন্দর চুল দেওয়া হলো। ফেরেশতা জিজ্ঞেস করলেন, কোন সম্পদ তোমার নিকট অধিক প্রিয়? সে জবাব দিল, 'গরু'। তারপর ফেরেশতা তাকে একটি গর্ভবতী গাভি দান করলেন এবং দুআ করলেন, 'এতে তোমাকে বরকত দান করা হোক।'

তারপর ফেরেশতা অন্ধের নিকট এলেন এবং তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কোন জিনিস তোমার কাছে বেশি প্রিয়? সে বলল, আল্লাহ যেন আমার চোখের জ্যোতি ফিরিয়ে দেন, যাতে আমি মানুষকে দেখতে পারি। তখন ফেরেশতা তার চোখের ওপর হাত বুলিয়ে দিলেন, তৎক্ষণাৎ আল্লাহ তার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিলেন। ফেরেশতা জিজ্ঞেস করলেন, কোন সম্পদ তোমার কাছে অধিক প্রিয়? সে জবাব দিল 'ছাগল'। তখন তিনি তাকে একটি গর্ভবতী ছাগী দিলেন।

তিনজনের পশুগুলো বাচ্চা দিল। ফলে একজনের উটে ময়দান ভরে গেল, অপরজনের গরুতে মাঠ পূর্ণ হয়ে গেল এবং আরেকজনের ছাগলে উপত্যকা ভরে গেল।

এরপর ওই ফেরেশতা তাঁর পূর্ববর্তী আকৃতি ধারণ করে শ্বেতরোগীর কাছে এসে বললেন, আমি একজন নিঃস্ব ব্যক্তি। আমার সফরের সকল সম্বল শেষ হয়ে গেছে। আজ আমার গন্তব্য স্থানে পৌঁছার আল্লাহ ছাড়া কোনো উপায় নেই। আমি তোমার কাছে ওই সত্তার নামে একটি উট চাচ্ছি, যিনি তোমাকে সুন্দর রং কোমল চামড়া এবং সম্পদ দান করেছেন। আমি এর ওপর সওয়ার হয়ে আমার গন্তব্যে পৌঁছাব।

তখন লোকটি তাকে বলল, আমার ওপর বহু দায়দায়িত্ব রয়েছে। (কাজেই আমার পক্ষে দান করা সম্ভব নয়) তখন ফেরেশতা তাকে বললেন, সম্ভবত আমি তোমাকে চিনি। তুমি কি একসময় শ্বেতরোগী ছিলে না? মানুষ তোমাকে ঘৃণা করত। তুমি কি ফকির ছিলে না? এরপর আল্লাহ তাআলা তোমাকে প্রচুর সম্পদ দান করেছেন।

সে বলল, আমি তো এ সম্পদ আমার পূর্বপুরুষ থেকে ওয়ারিশসূত্রে পেয়েছি। ফেরেশতা বললেন, তুমি যদি মিথ্যাবাদী হও তবে আল্লাহ তোমাকে সেরূপ করে দিন, যেমন তুমি ছিলে।

তারপর ফেরেশতা টাকওয়ালার কাছে তাঁর সেই বেশভূষা ও আকৃতিতে গেলেন এবং তাকে ঠিক তদ্রূপই বললেন, যেরূপ তিনি শ্বেত রোগীকে বলেছিলেন। এ-ও তাকে ঠিক অনুরূপ জবাব দিল, যেমন জবাব দিয়েছিল শ্বেত রোগী। তখন ফেরেশতা বললেন, যদি তুমি মিথ্যাবাদী হও তবে আল্লাহ তোমাকে তেমন অবস্থায় ফিরিয়ে দিন, যেমন তুমি পূর্বে ছিলে। পরিশেষে ফেরেশতা অন্ধ লোকটির কাছে তাঁর পূর্বের আকৃতিতে এলেন এবং বললেন, আমি একজন নিঃস্ব লোক, মুসাফির মানুষ; আমার সফরের সকল সম্বল শেষ হয়ে গেছে। আজ বাড়ি পৌঁছার ব্যাপারে আল্লাহ ছাড়া কোনো গতি নেই। তাই আমি তোমার কাছে সেই সত্তার নামে একটি ছাগী প্রার্থনা করছি, যিনি তোমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন। আমি এ ছাগীটি নিয়ে আমার এ সফরে বাড়ি পৌঁছতে পারব।

সে বলল, বাস্তবিকই আমি অন্ধ ছিলাম। আল্লাহ আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন। আমি ফকির ছিলাম। আল্লাহ আমাকে ধনী করেছেন। এখন তুমি যা চাও নিয়ে যাও। আল্লাহর কসম। আল্লাহর ওয়াস্তে তুমি যা কিছু নেবে তার জন্য আজ আমি তোমার নিকট কোনো প্রশংসারই দাবি করব না। তখন ফেরেশতা বললেন, তোমার সম্পদ তুমি রেখে দাও। তোমাদের তিনজনকে পরীক্ষা করা হলো মাত্র। আল্লাহ তোমার ওপর সন্তুষ্ট হয়েছেন আর তোমার সাথি দুজনের ওপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন।[৩১১]

ফায়দা : স্মরণ রাখা উচিত, প্রথমত দুজন আল্লাহর নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা আদায় না করার দরুন তাদের প্রদত্ত নেয়ামত ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং পূর্বের আকৃতিতে ফিরে গেছে। আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন। দুনিয়া আখেরাত উভয়টা শেষ হয়ে গিয়েছে। তৃতীয় ব্যক্তির কৃতজ্ঞতার দরুন প্রদানকৃত সম্পদ অক্ষত রয়েছে এবং আল্লাহ তাআলা তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন। দুনিয়া ও আখেরাতে সফল হয়েছেন। সুবহানাল্লাহ।

---

[৩১১] *সহীহ মুসলীম*, হাদীস নং ৩৪৬৪, *মিশকাত শরীফ*, হাদীস নং ১৬৬।

তৃতীয় ঘটনা

একবার উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালামা রাযিয়াল্লাহু আনহার কাছে কিছু গোশত হাদিয়া এলো। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গোশত খুব পছন্দ করতেন। এ জন্য উম্মে সালামা রাযিয়াল্লাহু আনহা খাদেমাকে বললেন, গোশতটুকু তাকের ওপর রেখে দাও। হয়তো-বা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুশি হবেন। ফলে গোশতটুকু তাকে রেখে দেওয়া হলো।

হঠাৎ একজন সাহায্যপ্রার্থী এসে দরজায় আওয়াজ দিয়ে বলল, আল্লাহর নামে কিছু দান করুন! আল্লাহ তাআলা বরকত দেবেন। ঘর থেকে উত্তর এলো, আল্লাহ তাআলা তোমাকেও বরকত দান করুন। এটা বলে ইঙ্গিত দিল যে, ঘরে দেওয়ার মতো কোনো বস্তু নেই। উত্তর শুনে সাহায্যপ্রার্থী চলে গেল।

ইতোমধ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গৃহে আগমন করে বললেন, হে উম্মে সালামা! তোমার নিকট খাওয়ার মতো কিছু আছে? তিনি বললেন, জি আছে। খাদেমাকে বললেন আল্লাহর রাসূলের জন্য গোশতটুকু নিয়ে আসতে। খাদেমা গোশত আনতে গিয়ে সেখানে কোনো গোশত পেল না; বরং গোশতের পরিবর্তে সেখানে একটি সাদা পাথরের টুকরো পেল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিস্তারিত শুনে বললেন, যেহেতু তুমি সাহায্যপ্রার্থীকে গোশত দাওনি, তাই তা পাথরে রূপান্তরিত হয়ে গেছে।

ফায়দা : একটু ভেবে দেখুন! আল্লাহর রাস্তায় দান না করার কারণে গোশতের আকৃতি পরিবর্তন হয়ে পাথরে রূপান্তর হয়ে গেল। এ জন্য যে ব্যক্তি অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে দান না করে নিজে পেট পুরে আহার করে, সে যেন পাথর দ্বারা নিজের উদর পূর্ণ করে। যার ফলে তার হৃদয় কঠোর হয়ে যায়। যেহেতু প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিবারের প্রতি আল্লাহ তাআলার বিশেষ অনুগ্রহ রয়েছে, তাই চর্মচক্ষুর সামনে উক্ত গোশতকে পাথরে রূপান্তর করে দিলেন, যাতে তা ভক্ষণ করা থেকে বিরত থাকে।

চতুর্থ ঘটনা

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অভ্যাস ছিল (ফজর) নামায শেষে নিজের সাহাবীদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসতেন এবং জিজ্ঞেস করতেন, তোমাদের কেউ গত রাতে কোনো স্বপ্ন দেখেছ? কেউ স্বপ্ন দেখে থাকলে তিনি তা বিবৃত করতেন। তিনি তখন আল্লাহর মর্জি মোতাবেক স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতেন।

একদিন উপস্থিত সকল সাহাবীকে প্রশ্ন করলেন, তোমাদের কেউ কি কোনো স্বপ্ন দেখেছ? সবাই বললেন, জি না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, গত রাতে আমি দেখলাম দুজন লোক এসে আমার দু-হাত ধরে আমাকে পবিত্র ভূমির দিকে নিয়ে চলল। হঠাৎ দেখতে পেলাম, এক ব্যক্তি বসে আছে আর এক ব্যক্তি লোহার আঁকড়া হাতে দাঁড়িয়ে আছে। দণ্ডায়মান ব্যক্তি উপবিষ্ট ব্যক্তির (এক পাশের) চোয়ালটা এমনভাবে আঁকড়া দ্বারা বিদ্ধ করছিল যে, তা (চোয়াল বিদীর্ণ করে) মস্তকের পশ্চাদ্ভাগ পর্যন্ত পৌঁছে যাচ্ছিল। তারপর অপর চোয়ালটিও পূর্ববৎ বিদীর্ণ করছিল। ততক্ষণে প্রথম চোয়ালটা জোড়া লেগে যাচ্ছিল। আঁকড়াধারী ব্যক্তি পুনরায় সেরূপ করছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ কী হচ্ছে? সাথিদ্বয় বললেন, (পরে কথা হবে এখন) চলুন।

আমরা চলতে চলতে চিৎ হয়ে শায়িত এক ব্যক্তির পাশে এসে উপস্থিত হলাম। তার শিয়রে পাথর হাতে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে পাথর দিয়ে তার মাথা চূর্ণ করে দিচ্ছিল। নিক্ষিপ্ত পাথর দূরে গড়িয়ে যাওয়ার ফলে তা তুলে নিয়ে শায়িত ব্যক্তির নিকট ফিরে আসার পূর্বেই বিচূর্ণ মাথা পূর্ববৎ জোড়া লেগে যাচ্ছিল। সে পুনরায় মাথার ওপরে পাথর নিক্ষেপ করছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, লোকটি কে? তারা বললেন, চলুন।

আমরা অগ্রসর হয়ে চুলার ন্যায় এক গর্তের নিকট উপস্থিত হলাম। গর্তের উপরিভাগ ছিল সংকীর্ণ ও নিচের অংশ প্রশস্ত এবং এর তলদেশে আগুন জ্বলছিল। আগুন গর্তমুখের নিকটবর্তী হলে সেখানের লোকগুলোও ওপরে চলে আসে, যেন তারা গর্ত থেকে বের হয়ে যাবে। আগুন ক্ষীণ হয়ে গেলে তারাও (তলদেশে) ফিরে যায়। গর্তের মধ্যে বহুসংখ্যক উলঙ্গ নারী-পুরুষ ছিল। জিজ্ঞেস করলাম, এরা কারা? তারা বললেন, চলুন।

আমরা চলতে চলতে একটি রক্ত প্রবাহিত নদীর নিকট উপস্থিত হলাম। নদীর মাঝখানে এক ব্যক্তি দাঁড়ানো ছিল, নদীর তীরে অপর এক ব্যক্তি, যার সামনে ছিল পাথর। নদীর মাঝখানের লোকটি নদী থেকে বের হয়ে আসার জন্য অগ্রসর হলেই তীরে দাঁড়ানো লোকটি সে ব্যক্তির মুখ বরাবর পাথর নিক্ষেপ করত, এতে সে তাকে পূর্বস্থানে ফিরিয়ে দিত। এমনভাবে যতবার সে তীরে উঠে আসতে চেষ্টা করে, ততবার সে ব্যক্তি তার মুখ বরাবর পাথর নিক্ষেপ করে পূর্বস্থানে ফিরে যেতে বাধ্য করে। আমি জানতে চাইলাম, এ ঘটনার কারণ কী? তাঁরা বললেন, চলতে থাকুন।

আমরা চলতে চলতে একটি সবুজ বাগানে উপস্থিত হলাম। এতে একটি বড় গাছ ছিল। গাছটির গোড়ায় একজন বয়োবৃদ্ধ লোক ও বেশ কিছু বালক-বালিকা ছিল। হঠাৎ দেখি যে, গাছটির সন্নিকটে এক ব্যক্তি সামনে আগুন রেখে তা প্রজ্জ্বলিত করছে। সাথিদ্বয় আমাকে নিয়ে গাছে আরোহণ করে এমন একটি বাড়িতে প্রবেশ করলেন যে, এর চেয়ে সুদৃশ্য বাড়ি পূর্বে আমি কখনো দেখিনি। বাড়িতে বহুসংখ্যক বৃদ্ধ, যুবক, নারী এবং বালক-বালিকা ছিল।

এরপর তাঁরা আমাকে সেখান থেকে বের করে নিয়ে গাছের আরও ওপরে আরোহণ করে অপর একটি বাড়িতে প্রবেশ করালেন। এটা পূর্বাপেক্ষা অধিক সুদৃশ্য ও সুন্দর। বাড়িতে কতিপয় বৃদ্ধ ও যুবক অবস্থান করছিলেন। আমি বললাম, আজ রাতে আপনারা আমাকে (বহুদূর পর্যন্ত) ভ্রমণ করালেন। এখন বলুন, যা দেখলাম তার তাৎপর্য কী?

তারা বললেন, হ্যাঁ, আপনি যে ব্যক্তির চোয়াল বিদীর্ণ করার দৃশ্য দেখলেন সে মিথ্যাবাদী; মিথ্যা কথা বলে বেড়াত, তার বিবৃত মিথ্যা বর্ণনা ক্রমাগত বর্ণিত হয়ে দূরদূরান্তে পৌঁছে যেত। কেয়ামত পর্যন্ত তার সাথে এ ব্যবহার করা হবে। আপনি যার মাথা চূর্ণ করতে দেখলেন, সে এমন ব্যক্তি যাকে আল্লাহ কুরআনের শিক্ষা দান করেছিলেন, কিন্তু রাতের বেলায় সে কুরআন থেকে বিরত হয়ে নিদ্রা যেত এবং দিনের বেলায় কুরআন অনুযায়ী আমল করত না। তার সাথে কেয়ামত পর্যন্ত এরূপই করা হবে।

গর্তের মধ্যে যাদেরকে আপনি দেখলেন, তারা ব্যভিচারী। (রক্ত প্রবাহিত) নদীতে আপনি যাকে দেখলেন, সে সুদখোর। গাছের গোড়ায় যে বৃদ্ধ ছিলেন, তিনি ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) এবং তাঁর চারপাশের বালক-বালিকারা মানুষের সন্তান। যিনি আগুন জ্বালাচ্ছিলেন তিনি হলেন জাহান্নামের খাযিন মালিক নামক ফেরেশতা।

প্রথম যে বাড়িতে আপনি প্রবেশ করলেন, তা সাধারণ মুমিনদের বাসস্থান। আর এ বাড়িটি হলো শহীদগণের আবাস। আমি (হলাম) জিবরাঈল আর ইনি হলেন মীকাঈল। (এরপর জিবরাঈল আমাকে বললেন) আপনার মাথা ওপরে ওঠান। আমি উঠিয়ে মেঘমালার ন্যায় কিছু দেখতে পেলাম। তাঁরা বললেন, এটাই হলো আপনার আবাসস্থল। আমি বললাম, আমাকে ছেড়ে দিন, আমি আমার আবাসস্থলে প্রবেশ করি। তাঁরা বললেন, এখনো আপনার হায়াতের কিছু সময় অবশিষ্ট রয়ে গেছে। অবশিষ্ট সময় পূর্ণ হলে অবশ্যই আপনি নিজ আবাসে চলে আসবেন।[৩১২]

ফায়দা : জেনে রাখা উচিত, নবীগণের স্বপ্ন ওহীস্বরূপ। উপরোক্ত সমস্ত ঘটনা সত্য। উক্ত হাদীস দ্বারা কিছু মানুষের অবস্থা সম্পর্কে অবগতি লাভ করা গেল। প্রথমত মিথ্যাবাদীর শাস্তি। দ্বিতীয়ত আমলহীন আলেমের শাস্তি। তৃতীয়ত ব্যভিচারের ভয়াবহতা। চতুর্থ সুদের আযাব। আল্লাহ তাআলা সকল মুসলমানকে উক্ত মন্দ কর্মসমূহ থেকে হেফাজত করুন।[৩১৩]

নারীরাও উচ্চ শিখরে পৌঁছতে পারেন

পুরুষের মতো নারীও পারে উচ্চ শিখরে আরোহণ করতে। পুরুষের মাঝে যেমন মর্যাদাগত ভিন্নতা রয়েছে, তদ্রূপ নারীর মাঝেও রয়েছে মর্যাদাগত ভিন্নতা। শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনে পুরুষের সমপর্যায়ে পৌঁছতে না পারলেও নারী নিজস্ব গুণ-গরিমা অনুযায়ী অর্জন করতে পারে শ্রেষ্ঠত্বের চাবিকাঠি।

হাদীসের ভাষ্যমতে পুরুষের তুলনায় নারীদের দুর্বলতার ইঙ্গিতের দরুন নারীদের শ্রেষ্ঠত্বের গুণের ওপর প্রশ্ন তোলা যাবে না যে, হাদীসে

---

[৩১২] *সহীহ বুখারী*, হাদীস নং ১৩৮৬।
[৩১৩] *বেহেশতী জেওর*, ১ম খণ্ড।

যাদেরকে অসম্পূর্ণ বলা হয়েছে তারা কীভাবে মর্যাদাগতভাবে শ্রেষ্ঠ হতে পারে?!

মৌলিক কথা হলো, মহিলাদের মাঝে দুটি ধরন রয়েছে। একটি হলো পুরুষের বিপরীত। এর পূর্ণতা অর্জন করা নারীশক্তির বহির্ভূত এবং উপার্জন ক্ষমতা নারী-স্বভাববিরোধী। দ্বিতীয় ধরন হলো নারীর বিপরীত। যার পূর্ণতা অর্জন করা নারী সক্ষমতার আওতাভুক্ত। উক্ত ধরন অনুযায়ী পূর্ণতা অর্জন করা সম্ভব এবং নারীর ইচ্ছাধিকারের আওতাভুক্ত। মোটকথা নারীরাও জ্ঞানগত মর্যাদার মাধ্যমে ঈমান আনয়ন করে মর্যাদার উচ্চ শিখরে আরোহণ করতে সক্ষম, যাকে ঈমানী শক্তি বলা হয়। অপরদিকে অর্জিত জ্ঞান অনুযায়ী আমল করেও মর্যাদা অর্জন করতে সক্ষম, যাকে ইহসান বলা হয়। সুতরাং জ্ঞান ও তদনুযায়ী আমল করা উভয়টি অত্যাবশ্যকীয়।[৩১৪]

আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ ۝١١٩

হে ঈমানদারগণ, আল্লাহকে ভয় করো এবং সাদেকীনদের সাথে থাকো। (সূরা আত-তাওবা, ৯ : ১১৯)

উক্ত আয়াতে কারিমায় পরিপূর্ণ দ্বীন অর্জন করার পদ্ধতি বলে দেওয়া হয়েছে। তা হলো, তোমরা দ্বীনের ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ গুণাবলি অর্জনকারী এবং দ্বীনের রজ্জুকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধারণকারীর সাথে সংযুক্ত থাকো। পুরুষদের জন্য বর্ণিত পদ্ধতির ওপর আমল করা সহজতর। কিন্তু চিন্তার বিষয় হলো, মহিলাদের জন্য উক্ত পূর্ণতা অর্জনের পদ্ধতি কী? উক্ত প্রশ্নটি বাস্তবেই অনেক গুরুত্বপূর্ণ। এর উত্তর হলো, মহিলাদের নিজের জন্য শ্রেষ্ঠত্বের গুণাবলি অর্জনের দুটি পদ্ধতি রয়েছে। প্রথমত, পুরুষরা যে সমস্ত বুযুর্গদের থেকে ফয়েজ ও বরকত লাভ করে মহিলারও সে বুযুর্গদের ফয়েজ-বরকত অর্জন করবে। কিন্তু উক্ত পদ্ধতিটা কিছুটা দুষ্কর। কেননা পুরুষদের থেকে মহিলারা কী ধরনের ফয়েজ অর্জন করবে? দ্বিতীয়ত, পর্দার বাধ্যবাধকতার জন্য মহিলারা শায়েখদের থেকে পরিপূর্ণ

---

[৩১৪] *আল আ-কিলাতুল গা-ফিলাত*, ৩১২।

সান্নিধ্য অর্জনে ব্যর্থ হবে। আর সান্নিধ্য অর্জন ব্যতীত সম্পূর্ণ উপকারিতা অর্জন সম্ভব নয়। বুযুর্গদের সামনে আসা-যাওয়া করা এবং পর্দাহীনভাবে তাদের সামনে যাওয়া জায়েজ নেই। তবে যে সমস্ত মহিলাদের স্বামী বা পিতা সান্নিধ্য প্রদানের উপযুক্ত, তারা তাদের থেকে সান্নিধ্য অর্জন করতে পারে। কিন্তু সমস্ত মহিলাদের বাবা বা স্বামী তো পূর্ণ মর্যাদার অধিকারী নয়, বিধায় এই পদ্ধতিটা যথেষ্ট নয়।

দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো, পুরুষ পূর্ণ মর্যাদার অধিকারী পুরুষ থেকে সান্নিধ্য অর্জন করবে আর নারী পূর্ণ মর্যাদার অধিকারিণী নারী থেকে সান্নিধ্য অর্জন করবে। এটাই যুক্তির দাবি। যেমনইভাবে পুরুষদের আদেশ করা হয়েছে যে, '(হে পুরুষগণ) তোমরা সত্যবাদীদের সাথে থাকো।' তদ্রূপ নারীদেরও আদেশ করা হয়েছে, '(হে মহিলাগণ) তোমরা সত্যবাদী নারীদের সাথে থাকো।'

কিন্তু এখানে প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, মহিলারাও কি সামগ্রিক বিষয়ে পূর্ণতার গুণাগুণ অর্জন করতে পারে? উত্তরে বলা হবে, 'হ্যাঁ'। কুরআনুল কারীমে ব্যবহৃত বাক্যের মাধ্যমে এর ইঙ্গিত রয়েছে যে, নারীরাও পূর্ণতার গুণ অর্জন করতে পারবে। কেননা যেমনইভাবে আল্লাহ তাআলা পুরুষদের ব্যাপারে صادقين (সত্যবাদী পুরুষগণ) শব্দ ব্যবহার করেছেন, তেমনইভাবে নারীদের ব্যাপারেও صادقات (সত্যবাদী নারীগণ) শব্দ ব্যবহার করেছেন। সূরা আহযাবের اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمٰتِ আয়াতের মাঝেও وَالصّٰدِقِيْنَ وَ الصّٰدِقٰتِ (সত্যবাদী পুরুষগণ ও সত্যবাদী নারীগণ) ব্যবহৃত হয়েছে। الصّٰدِقِيْنَ এর অর্থ পরিপূর্ণ গুণাবলি অর্জনকারী পুরুষগণ এবং الصّٰدِقٰتِ এর অর্থ পরিপূর্ণ গুণাবলি অর্জনকারিণী মহিলাগণ। এর দ্বারা মহিলাদের গুণাবলিতে পূর্ণতা অর্জনের প্রমাণ পাওয়া যায়। বাস্তবিকপক্ষে নারীজাতিকে সংশোধনের উত্তম পদ্ধতি হচ্ছে, ধর্মীয় গুণাবলিতে পূর্ণতা অর্জনকারী নারীদের সান্নিধ্যে অন্যান্য সাধারণ নারীগণ অবস্থান করবেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, বর্তমান বিশ্বে পূর্ণতা অর্জনকারী এ ধরনের মহিলার সংখ্যা খুবই সামান্য।

নারীজাতির সংশোধনের পদ্ধতি

১। নারীদের সমস্ত সমস্যার মূল ভিত্তি একটিমাত্র বিষয়। যদি তা সংশোধন করা যায় তাহলে সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। তা হলো, বর্তমান যুগে সবকিছুতেই মহিলারা দ্বীন সম্পর্কে উদাসীন। যদি প্রত্যেক বিষয়ে দ্বীনের প্রতি খেয়াল রেখে চিন্তা করে যে, আমাদের কাজ কি ইসলাম সমর্থিত না বিবর্জিত? যদি উক্ত বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখি, তাহলে প্রতিনিয়ত আমাদের সংশোধন হয়ে যাবে। ইনশাআল্লাহ।

২। সংশোধনের পদ্ধতি মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করা ও বোঝা উচিত এবং সংশোধনের পদ্ধতিটা ইলম ও আমলের সাথে সম্পৃক্ত হতে হবে। শুধুমাত্র কুরআনুল কারীমের তরজমা অথবা তাফসীর পড়া বা নূরনামা বা কারও জীবনী পড়ার নামই ইলম নয়, বরং ওই কিতাব পড়তে হবে যার মাঝে ব্যক্তির আত্মিক ব্যাধির বর্ণনা রয়েছে। এভাবে পড়ার নাম ইলম অর্জন।

৩। আমলের উৎকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে নিজের জিহ্বাকে আবদ্ধ রাখা। মানুষের জবান খুবই পটু। কেউ আপনাকে ভালো-মন্দ বললেও আপনার জিহ্বাকে বন্ধ রাখতে হবে। কখনোই প্রতিউত্তর করা যাবে না। চুপ থাকার অভ্যাস গড়ে তোলার দ্বারা হিংসা-বিদ্বেষ অনেকাংশে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। মানুষের জিহ্বা বন্ধ থাকলে বহুবিধ ব্যাধির ভিত্তি দুর্বল হয়ে যায়।

৪। সারা দিনের নির্বাচিত একটি মূহূর্তে ধ্যানমগ্ন থেকে এ চিন্তা করতে হবে যে, দুনিয়ার বৈশিষ্ট্য কী? মূলত দুনিয়া পরিত্যাগের বস্তু। মৃত্যু ও তৎপরবর্তী সংঘটিতব্য বিভিন্ন বিষয় তথা কবর, মুনকার-নাকিরের প্রশ্নোত্তর পর্ব, কবর থেকে পুনরুত্থান, হিসাবের সম্মুখীন হওয়া, পুলসিরাতের পারাপার ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা প্রতিদিন চিন্তা করতে হবে। এর ফলে মানব হৃদয় থেকে পদমর্যাদার প্রীতি, সম্পদের ভালোবাসা, অহংকার, লোভ-লালসা, হিংসা-বিদ্বেষ ইত্যাদি সবকিছু বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

মোটকথা সুচিকিৎসা অর্জনের দুটি অংশ। একটি হলো জ্ঞানগত, দ্বিতীয় হলো কর্মগত। জ্ঞানগত বিষয়ের সারমর্ম হলো, কুরআনুল কারীমের পরে এমন কিতাবাদিও পড়তে হবে, যার মাঝে ফিকহী বিধি-বিধানের পাশাপাশি আত্মিক ব্যাধি তথা হিংসা, অহংকার ইত্যাদির বর্ণনাও রয়েছে। কমপক্ষে বেহেশতী জেওর দশ খণ্ডই পড়ে নিতে হবে।

আর কর্মগত অংশের সারমর্ম হলো দুটি বস্তু, বাকশক্তির হেফাজত এবং মৃত্যুর স্মরণ। তাই তোতা পাখির মতো বেহেশতী জেওরের শব্দাবলি নিজে নিজে পড়ে নেওয়ার দ্বারা কোনো উপকার হবে না। বরং যদি নিজেদের ঘরে কোনো আলেম থাকে তাহলে তার থেকে দৈনন্দিন অল্প অল্প করে কিছু পড়ে নেওয়া আবশ্যক। আলেমের অনুপস্থিতিতে ঘরের পুরুষ সদস্যদের কাছে আবেদন করতে হবে, যেন তিনি কোনো আলেমের কাছ থেকে পড়ে এসে তাকে পড়িয়ে দেয়। পুরুষ থেকে একবার পড়ে কিতাব বন্ধ করে রেখে দিলে হবে না, বরং প্রতিদিন নির্ধারিত সময়ে পঠিত সবকটি নিজে নিজে পড়ে নেবে এবং অন্যদেরকে পড়ে শোনাবে। আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি উক্ত পদ্ধতিতে খুব দ্রুতই সংশোধন হয়ে যাবে। ইনশাআল্লাহ।

নারী সংশোধনের পরিকল্পনা ও নিয়মতান্ত্রিক আমলের সারসংক্ষেপ

১। মহিলারাও ইসলামী গুণে পরিপূর্ণ হতে পারে। তাদের পরিপূর্ণ গুণ অর্জনের পদ্ধতির প্রথম করণীয় হচ্ছে, বিভিন্ন ফিকহী ও শরয়ী মাসলা-মাসায়েলের কিতাবাদি অধ্যয়ন করে প্রতিটি আমলের পরিপূর্ণ পদ্ধতি জেনে নেবে। যে সমস্ত আমলের মধ্যে অলসতা হয় তা সংশোধন করে নেবে। এটাই মৌলিক নীতি।

২। জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত করার জন্য দ্বীনি জ্ঞানে পূর্ণতা অর্জনকারী মাহরাম (যাদের সাথে দেখা দেয়া জায়েজ) কোনো পুরুষের সান্নিধ্যে উপকৃত হবে। নিজের স্বভাব-চরিত্র সংশোধনের পদ্ধতি জেনে নিজেকে পরিশুদ্ধ করবে।

৩। ধর্মীয় জ্ঞানে পূর্ণতা অর্জনকারী কোনো মাহরাম পুরুষ না থাকলে উক্ত জ্ঞানে গুণান্বিত কোনো মহিলার সান্নিধ্যে উপকৃত হবে।

৪। এ ধরনের কোনো মহিলা পাওয়া না গেলে নিজের দায়িত্বশীল পুরুষের অনুমতিক্রমে অন্য কোনো বুযুর্গ থেকে চিঠি-পত্র আদান-প্রদানের মাধ্যমে নিজের সংশোধনের সম্পর্ক রাখবে এবং তাকে নিজের অবস্থা সম্পর্কে খোঁজ-খবর দেবে। চিঠির উত্তরে লিখিত নির্দেশনার ওপর আমল করার দৃঢ় সংকল্প করবে। নিজ ঘরে অবস্থান করে আমলের প্রতি মনোযোগী হবে। শায়েখের কাছে যাওয়ার ব্যাপারে সংকল্প করবে না।

৫। নিজেদের ঘরে আল্লাহওয়ালা বুযুর্গদের জীবন-বৈচিত্র, ঘটনাবলি এবং তাদের বিভিন্ন বয়ান এবং তাদের কিতাবাদি অধ্যয়নের অভ্যাস চালু রাখবে। অধ্যয়নের দ্বারা সান্নিধ্যে অবস্থানের মতো উপকার অর্জন হবে। ইনশাআল্লাহ।

পুরুষদের মধ্যে কেউ যদি বুযুর্গদের সান্নিধ্যে যাওয়ার সুযোগ না পায় তাহলে সে-ও উপরোক্ত পদ্ধতিতে আমল করবে। আশা করা যায়, এ পদ্ধতির দ্বারাও তার দ্বীনি পূর্ণতা অর্জিত হবে। বর্তমান যুগে মহিলারা একে অপরের থেকে সবক অর্জন করে নিজেদের সংশোধনের চেষ্টা করে। এই পদ্ধতি কার্যকর নয়। সুতরাং বর্তমানে নারীজাতির সংশোধনের পন্থা দুটি :

এক। যে মহিলার মাহরামগণের (যার সাথে দেখা দেয়া জায়েজ) মধ্যে কোনো আল্লাহওয়ালা বুযুর্গ রয়েছে, তার থেকে বরকত অর্জন করবে। যার স্বামী বুযুর্গ সে স্বীয় স্বামী থেকে বরকত অর্জন করবে। কিন্তু তাতে কিছুটা সমস্যা দেখা দিতে পারে—(ক) কারও স্বামী তার গোলাম হয় আবার কারও স্বামী নিজের বন্ধু হয়। আল্লাহওয়ালা বুযুর্গদেরকে মহিলারা যেভাবে সম্মান করে থাকে, স্বীয় স্বামীকে সাধারণত ততটুকু সম্মান করে না। আর সম্মান ব্যতীত সান্নিধ্যের বরকত অর্জিত হবে না। (খ) অন্য কোনো বুযুর্গের প্রতি যতটা ভক্তি-শ্রদ্ধা থাকে ততটা ভক্তি স্বীয় স্বামীর প্রতি থাকে না, নিজের স্বামী যত বড় আল্লাহওয়ালা বুযুর্গই হোক না কেন। এমতাবস্থায় নারী যদি নিজের স্বামী থেকে সান্নিধ্য অর্জন করতে না পারে এবং নিজের কোনো মাহরামের মাঝেও তদীয় গুণাবলি বিদ্যমান না থাকে, তখন ভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে।

> দুই। দ্বিতীয় পদ্ধতি হচ্ছে বুযুর্গদের কিতাবাদি, তাদের ওয়ায-নসীহত অধ্যয়ন করতে হবে। বুযুর্গদের সংকলিত পুস্তিকা ও ওয়ায-নসীহত তদ্রূপ প্রভাব বিস্তার করে, যে প্রভাব তাদের সান্নিধ্যে অর্জিত হয়। ফুলের ঋতু বিদায় নিলে গোলাপ পানি থেকে তার সুগন্ধি অর্জন করা হয়। গোলাপ পানি থেকেও ফুলেল সৌরভ অর্জিত হয়। এমনইভাবে সূর্য অস্তমিত হলে প্রদীপ থেকে আলো অর্জন করতে হয়। আল্লাহওয়ালাদের কথায় এক ধরনের নূরের ঝলক থাকে, তার প্রভাব পাঠকের ওপর ক্রিয়াশীল হয়ে থাকে।[৩১৫]

অভিজ্ঞতার আলোকে এ কথা প্রমাণিত যে, আল্লাহওয়ালাদের কথায় নূরের ঝলক থাকে। যদ্দরুন তাদের কিতাবাদি থেকেও তদ্রূপ উপকার অর্জন করা যায়, যা তাদের সান্নিধ্যে অবস্থান করে অর্জিত হয়। সান্নিধ্যে থাকার পুরোপুরি উপকার অর্জন না হলেও আশা করা যায় অধিকাংশ উপকার অর্জিত হবে। সুতরাং মহিলাদের পক্ষে কোনো বুযুর্গের সান্নিধ্য অর্জন সম্ভবপর না হলে তাদের লিখিত কিতাবাদি, ওয়ায-নসীহত দিক-দিগন্তে বিদ্যমান রয়েছে। সেগুলো অধ্যয়ন করলে দ্বীনি শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে অবশ্যই খাঁটি মানুষ হওয়া যাবে।

আলহামদুলিল্লাহ, নারীরা কীভাবে আল্লাহওয়ালাদের সান্নিধ্য অর্জন করবে?—উক্ত প্রশ্নের সামগ্রিক উত্তর প্রদান করা হলো।

সারকথা হলো, যে নারীর কোনো মাহরাম দ্বীনি জ্ঞানে পরিপূর্ণ যোগ্যতা অর্জন করেনি, তার জন্য উচিত সমসাময়িক কোনো বুযুর্গ নারী অন্বেষণ করা। যদি এমন কাউকে পাওয়া যায়, তাহলে ওই নারীর সান্নিধ্যে দ্বীনি উপকারিতা অর্জন করবে। যে উপরোক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারবে না, সে বুযুর্গদের কিতাবাদি, ওয়ায-নসীহত ইত্যাদি অধ্যয়ন করে উপকৃত হবে। যাই হোক, কুরআনুল কারীমের আয়াতের আলোকে নারীর দ্বীনি জ্ঞানে পূর্ণতা অর্জনের সহজ পদ্ধতি বর্ণনা করলাম। আমল করা বা না করা তাদের ইচ্ছাধিকার।[৩১৬]

---

[৩১৫] *আল কামাল ফিদ দ্বীন*, ১১০।

[৩১৬] *আল কামাল ফিদ দ্বীন লিন্নিসা*, ১২১; *হুকুকুয যাওজাইন*, ১২২।

নারী সংশোধনের সহজ পদ্ধতি

নারীজাতির সংশোধনের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, তারা নিজেরাই ধর্মীয় কিতাবাদি অধ্যয়ন করবে। কিন্তু আফসোস ও পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, বর্তমান সমাজে এমন নারীর দৃষ্টান্ত পাওয়া দুষ্কর, যে নিজেই নিজের সংশোধনের জন্য কিতাবাদি অধ্যয়ন করে আত্মশুদ্ধিতে আত্মনিয়োগ করবে। স্বামীদের দায়িত্ব হচ্ছে তাদের সংশোধনের ব্যাপারে সচেষ্ট থাকবে। কিন্তু নারীরা তাদের স্বামীর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসী নয়। এ জন্য স্বামীরা তাদেরকে বিভিন্ন বুযুর্গদের কিতাবাদি পড়াবে বা পড়িয়ে শোনাবে। সংশোধন হোক বা না হোক, তাদেরকে কিতাব পড়িয়ে শোনাতে থাকবে। যদি সংশোধন নাও হয়, তথাপিও স্বামী আল্লাহর কাছে জবাবদিহি থেকে বেঁচে যাবে।[৩১৭]

নারীরাও কি পীরের মতো অন্যদের ইসলাহ করতে পারবে?

আমি একবার কিছু বুযুর্গদের নামের লিস্ট লিখেছিলাম, যাতে সাধারণ মানুষ তাদের সাথে সম্পর্ক তৈরি করতে পারে। সে সময় আমার অন্তরে এ কথা জাগ্রত হলো যে, এ ধরনের কিছু নারী বুযুর্গের নাম লিখে দিই, যাতে নারীরা তাদের থেকে বরকত অর্জন করতে পারে। কিন্তু এমন কোনো নারীর কথা স্মরণ হলো না, যাদের নাম নিশ্চিন্তে লিপিবদ্ধ করা যায়। কিছু মহিলা তো এমন ছিল, যারা দ্বীনি গুণে গুণান্বিত ছিল এবং তাদের ব্যাপারে বিশ্বাসও ছিল, কিন্তু কিছু কারণে তাদের নাম লেখা থেকে বিরত ছিলাম।

এক। উক্ত নারীদের বুযুর্গী ও শ্রেষ্ঠত্বের কথা আমি অন্য মহিলাদের কাছ থেকেই শুনেছি। আমি ব্যক্তিগতভাবে ওই মহিলাদের বুযুর্গীর বাস্তবতা অনুসন্ধান করিনি, বরং অনুসন্ধানের সুযোগও ছিল না। কিন্তু যেই বুযুর্গ পুরুষদের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছিল তাদের বিষয়টি ছিল ভিন্ন। তারা নিজেরাই দ্বীনি জ্ঞানে পরিপূর্ণ জ্ঞানী ছিল। অপরদিকে মহিলাদের কথার ওপর আমার ভরসা ছিল না। কেননা জানা নেই তারা কোন জিনিসকে

---

[৩১৭] *হুসনুল আযীয*, ২/৭৪।

কামালত বা বুযুর্গী মনে করেছে এবং কাকে কামেল বা বুযুর্গ মনে করেছে। তাদের দ্বারা এটা অসম্ভব নয় যে, হতে পারে কোনো অসম্পূর্ণ গুণাবলিকে তারা পূর্ণ গুণাবলি মনে করেছে।

দুই। দ্বীনি জ্ঞানে পূর্ণতা অর্জনকারী পুরুষদের সাথে যদি মহিলাদের নামের তালিকা প্রকাশ করা হতো, তাহলে এমন হতে পারে যে, পুরুষরাও তাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে। এমনকি কিছু পুরুষ তাদের থেকে ফয়েজ ও বরকত অর্জন করতে যাবে। তাতে ফেতনা সৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে।

তিন। মহিলা বুযুর্গদের নামের তালিকা প্রকাশিত হলে দূর-দূরান্ত থেকে মহিলারা তাদের বরকত লাভের জন্য সফর করে ছুটে আসবে। আর আমি ব্যক্তিগতভাবে মহিলাদের সফরকে পছন্দ করি না। যদি তারা সফর করে বুযুর্গ মহিলাদের খানকায় আসে, তাহলে বুযুর্গ মহিলারা তাদের মুরিদদের জন্য মেহমানদারি করতে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়বে, যা তাদের জন্য বড়ই কষ্টকর হবে।

চার। বুযুর্গ মহিলাদের কাছে আগত মেহমানদের প্রতিনিয়ত গমনাগমন এবং তাদের আপ্যায়নে ব্যস্ত থাকার দরুন বুযুর্গ মহিলাদের স্বামীদের সাথে মনোমালিন্যতা সৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে। স্বামী বেচারা বলতে বাধ্য হবে, নারীদের আগন্তুক দল কেন বারংবার তার বাড়িতে আনমণ করছে? তা ছাড়া অনবরত নারীদের গমনাগমনের দরুন পর্দা পালনে ব্যাঘাত সৃষ্টি করবে। যা পুরুষের স্বাধীনতার মাঝে ব্যাপক প্রতিবন্ধকতা তৈরি করবে।

পাঁচ। মহিলা মুরিদদের গমনাগমনের ফলে পূর্ণতা অর্জনকারী মহিলাদের মাঝেও ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। কেননা মর্যাদা ও সম্মান এমন এক ভীতিকর বিষয়, যা অনেক বড় বড় বুযুর্গরাও রক্ষা করতে কষ্টের সম্মুখীন হয়ে যায়। মহিলাদের মেজাজ-মস্তিস্ক আরও একধাপ এগিয়ে নিজেদের প্রভাব-প্রতিপত্তির প্রতি দুর্বল হয়ে অহংকার বা গরিমা সৃষ্টি হবে। ফলে দ্বীনের যতটুকু পূর্ণতা ছিল, তাও অহমিকা ও অহংকারের দরুন তাদের থেকে হারিয়ে যাবে।

মোটকথা, বিভিন্ন কারণেই মহিলা বুযুর্গদের নামের তালিকা প্রকাশ করিনি। তন্মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট ছিল, তাদের দ্বীনদারিত্বের গুণাবলি সম্পর্কে আমি মহিলাদের মাধ্যমে অবগতি লাভ করেছিলাম। মহিলাদের থেকে শ্রুত বিষয়ে আমি তাদের প্রতি আশ্বস্ত হতে পারছিলাম না। বাস্তবিকপক্ষে আমার ধারণাই সঠিক হিসেবে বিবেচ্য ছিল। আমি আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি যে, সে সময় বুযুর্গ মহিলাদের নামের তালিকা প্রকাশ করিনি। যদি একবার প্রকাশিত হয়েই যেত, তাহলে আল্লাহ না করুন বিভিন্ন সমস্যা সৃষ্টি হতো।

নারী–মনে পুরুষ হওয়ার কামনা

হযরত উম্মে সালামা রাযিয়াল্লাহু আনহা দুআ করেছিলেন, হায় আফসোস! আমরাও যদি পুরুষ হতে পারতাম! তাহলে পুরুষদের ব্যাপারে বর্ণিত ফযিলতগুলো আমরাও অর্জন করতে পারতাম। উক্ত বাসনার নিষেধাজ্ঞা জারি করে আল্লাহ তাআলা আয়াত অবতীর্ণ করেন :

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ؕ

তোমরা এমন সব বিষয়ে আকাঙ্ক্ষা করো না, যে বিষয়ে আল্লাহ তাআলা তোমাদের কতককে কতকের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছেন। (সূরা নিসা, ৪ : ৩২)

উক্ত আয়াতের মর্মার্থ হলো, মানব জীবনের সৃষ্টিগত ও ঐচ্ছিক শ্রেষ্ঠত্ব, যা অর্জনের পেছনে কারও কোনো কৃতিত্ব নেই, তার বাসনা তোমরা নিজেদের হৃদয়ে লালন করো না। আর যেগুলো চেষ্টার মাধ্যমে অর্জিত হয়, তা অর্জনে তোমরা মেহনত করতে পারো। সুতরাং কারও হৃদয়ে এ কথা জাগ্রত হওয়া যে, 'হায় আমি যদি পুরুষ হতে পারতাম! এর অর্থ হলো, আল্লাহ তাআলার ওপর প্রশ্ন উত্থাপন করা যে, আমাদেরকে আপনি কেন নারী হিসেবে সৃষ্টি করেছেন!

বাস্তবতা হলো, আল্লাহ তাআলা যাকে যেমন সৃষ্টি করেছেন সেটাই তার জন্য অতি উত্তম। নারীদের অধীনে আল্লাহ তাআলা কোনো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করেননি। অপরদিকে পুরুষদের কাঁধে অনেক কাজের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন; সফর করা, ব্যবসা করা, জীবিকা উপার্জন করা

ইত্যাদি। দুনিয়ার সমস্ত জটিল ও কঠিন বিষয়াদি পুরুষের দায়িত্বে অর্পণ করেছেন। জুমা আদায়, জামাতে নামায আদায়, দ্বীনের প্রচার-প্রসারে তাবলীগ করা, সমস্ত পরিবার-পরিজনের খরচাদিসহ সমস্ত দায়িত্ব পুরুষের কাঁধে।

হে নারীজাতি! আপনাদের জিম্মায় কোনো দায়িত্ব অর্পণ করা হয়নি। এ জন্য সম্পদ প্রাপ্তির ক্ষেত্রেও আপনাদের জন্য অর্ধেকাংশ নির্ধারিত হয়েছে। বরং এতটুকুও আপনাদের জন্য অতিরিক্ত। কেননা আপনাদের দায়িত্বে কারও ওপর খরচের দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। এমনকি নিজের যাবতীয় প্রয়োজনীয় খরচের দায়িত্বও পুরুষের জিম্মায় অর্পণ করা হয়েছে। আপনাদের জন্য ইসলাম অনেক সহজ পদ্ধতির অবতারণা করেছে। সুতরাং আপনাদের নারীত্বই আপনাদের জন্য মঙ্গলজনক। মর্যাদা অর্জন করে আর কী করবেন?

মুক্তি লাভ করাই তো আপনাদের জন্য গনিমতস্বরূপ। এমনকি আল্লাহর আযাব ও শাস্তির সম্মুখীন না হলেই যথেষ্ট। তথাপিও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের জন্য যদি আপনারা বিভিন্ন আমলে লিপ্ত হন, তাহলে আপনারাও মর্যদার উচ্চ শিখরে আরোহণ করতে পারবেন। তবে এটা আবশ্যক নয় যে নবীদের মতো মর্যাদা অর্জন করতে হবে। মোটকথা, আপনাদের দায়িত্বে খুব কমই কাজ দেওয়া হয়েছে। এ জন্য আপনারা আপনাদের ওপর অর্পিত বিষয়াবলি নিয়েই সন্তুষ্ট থাকবেন। পুরুষদের সাথে হিংসা-বিদ্বেষ রাখবেন না এবং পুরুষ হওয়ার কামনা-বাসনা লালন করবেন না।[৩১৮]

নারীজাতির ভালো গুণ

নারীদের প্রশংসনীয় বিষয় হচ্ছে, আল্লাহ তাআলা ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে তাদের কোনো সন্দেহ থাকে না। যখনই জানতে পারে এটা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিধান, আমলের সুযোগ না পেলেও তাৎক্ষণিক নিশ্চিন্তে উক্ত বিধানের সামনে মস্তক অবনত করে দেয়। খোদায়ী বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে তাদের পক্ষ থেকে কোনো ধরনের সন্দেহ পোষণ, অযাচিত প্রশ্ন উত্থাপিত হয় না।

---

[৩১৮] *ওয়াজুল খুজু'আ*, ৩১৬।

পুরুষরা তাদের বিপরীত। তাদের মধ্যে এ জাতীয় আনুগত্যের গুণাবলি বিদ্যমান নেই। বিশেষত বর্তমান যুগের বুদ্ধিজীবীদের অবস্থা হলো, তারা সব বিষয়ে নিজেদের বুদ্ধি খাটাতে চায়। প্রতিটি বিষয়কে নিজের জ্ঞানের পাল্লায় ওজন করতে চায় এবং চুলচেরা বিশ্লেষণ করে দেখে তাদের মনোভাবের সাথে সামঞ্জস্য নাকি সাংঘর্ষিক। কিন্তু নারীজাতির মেধায় বুঝে আসুক বা না আসুক, খোদায়ী বিধানের সামনে তাদের মস্তক অবনত করতে কুণ্ঠাবোধ করে না।

কিছুদিন পূর্বের একটি ঘটনা : একটি বিষয়ে জনৈক মহিলার খুবই আগ্রহ-উদ্দীপনা ছিল। আমি তার কাছে খবর পাঠালাম, আপনার কাঙ্ক্ষিত বিষয়ে শরীয়তের হুকুম এই ধরনের। আমার উক্ত নির্দেশিকা শ্রবণের সাথে সাথেই বিনাবাক্যে তা মেনে নিল এবং তার বিপরীত টু শব্দও করল না। যে বিষয়ে তাকে শুধরানো হয়েছিল নিশ্চিন্তে তা গ্রহণ করল। নারীদের মান্যতার গুণটি খুবই প্রশংসার দাবিদার।[৩১৯]

নেককার মহিলাদের গুণাবলি

আমাদের এখানকার পানিপথের মহিলাদের দ্বীনদারিত্বে সুখ্যাতি রয়েছে। এখানকার কিছু মহিলা কুরআনের হাফেজা, কিছু মহিলার কেরাত শাস্ত্রে দক্ষতা রয়েছে। বিশেষত সকল মহিলাই কুরআনুল কারীম পাঠে পারদর্শী। অধিকাংশ নারীরা নামাযের প্রতি যত্নবান। দুনিয়াবি বিষয়েও রয়েছে তাদের গ্রহণযোগ্যতা। প্রত্যেকের মালিকানায় রয়েছে চাষাবাদ উপযোগী কম-বেশি ক্ষেত-খামার। খাদ্য উৎপাদনের বিষয়ে তাদের দুশ্চিন্তা নেই। চিন্তাহীন এ জীবনযাত্রার মূলমন্ত্র হলো, তারা দুনিয়ার লালসা থেকে নিজেদেরকে সংযত রেখেছে।

এখানকার মহিলাদের ব্যাপারে শ্রুতি আছে যে, তারা খুবই স্বাভাবিক জীবন-যাপনে অভ্যস্ত। এমনকি বিবাহের সময়ে নববধূরা সাধারণ কাপড় পরিধান করেই অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে। নিত্যনতুন ও মূল্যবান কাপড়ের প্রতি তাদের লালসা নেই বললেই চলে। বাস্তবেই যদি এমনটা না হতো

---

[৩১৯] প্রাগুক্ত, ৮৫।

তাহলে তাদের জমিদারি গয়না-গাটি ও পোশাক-পরিচ্ছদ ক্রয়ে নিলাম হয়ে যেত। যে এলাকার নারীদের মাঝে এ ধরনের আড়ম্বরি স্বভাব ছিল, তাদের মাঝে দরিদ্রতা এসে পড়েছিল। তাদের বিলাসিতার কারণে নিজেদের ঘড়-বাড়ি ও জায়গা-জমি পর্যন্ত ব্রিটিশদের নিকট বন্ধক রাখতে বাধ্য হয়েছে। এমন বিলাসী ও ঐশ্বর্যের পোশাক-পরিচ্ছদ এবং অলংকার পরার কী উপকারিতা রয়েছে, যার পর নিজের ভিটেমাটি পর্যন্ত বিক্রি করতে বাধ্য হয়!

বর্তমানের মহিলাদের অবস্থা হচ্ছে ঘরে খাবারের কোনো বস্তু না থাকলেও আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে যাওয়ার জন্য মূল্যবান পোশাক ও স্বর্ণালংকার লাগবেই, যাতে করে আত্মীয়-স্বজনের সামনে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হয়। অথচ দরিদ্র মানুষ নিত্য-নতুন পোশাক পরলেই সম্মানিত হয়ে যায় না। তার বাস্তবিক অবস্থা সম্পর্কে তো সকলেই অবগত রয়েছে।[৩২০]

নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

অভিজ্ঞতার আলোকে এ কথা প্রমাণিত যে, পুরুষদের মাঝে আলেম বিদ্যমান থাকা নারীদের দ্বীনি প্রয়োজনীয়তার জন্য যথেষ্ট নয়। এর মৌলিক কারণ দুটি। প্রথমত, পর্দার বিধান পালনের জন্য নারীরা সর্বদা আলেমদের সংস্পর্শে থাকা অসম্ভবপ্রায়। দ্বিতীয়ত, নিজের মাহরাম পুরুষদেরকে মাধ্যম বানিয়ে শেখার পদ্ধতি অবলম্বনের ক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে, অনেকের ঘরে এ ধরনের পুরুষ নাও থাকতে পারে। অনেকের ঘরে মাহরাম পুরুষ থাকলেও দেখা যায় পুরুষ নিজের দ্বীনের ব্যাপারেই উদাসীন, অন্যের ব্যাপারে প্রশ্ন করার কতটুকুই-বা গুরুত্বারোপ করবে!

সুতরাং এ সমস্যার সম্মুখীন নারীদের দ্বীনি শিক্ষা অর্জন করা কষ্টকর। ঘটনাক্রমে কোনো নারীর যদি উক্ত সমস্যা না থাকে এবং নিজের ঘরে বাবা, সন্তান, ভাই ইত্যাদি আলেম থাকলেও কিছু মাসআলা-মাসায়েল তাদের কাছে জিজ্ঞেস করা অসম্ভব। উক্ত মাসআলা-মাসায়েল একমাত্র নিজের স্বামীর সাথেই আলোচনা করা যেতে পারে। আর বাস্তবতার আলোকে সকলের স্বামীই দ্বীনি জ্ঞানে পারদর্শী হওয়া সম্ভব নয়।

---

[৩২০] *হাম্মুল আখিরাহ*, ৫২৯।

আলোচনার সারমর্ম দাঁড়ালো এই যে, নারীদের সামগ্রিক প্রয়োজন পূরণের লক্ষ্যে কিছু মহিলাকে দ্বীনি শিক্ষায় শিক্ষিত করার কোনো বিকল্প নেই। সর্বসাধারণ মহিলারা তাদের থেকে নিজেদের দ্বীনি সকল প্রয়োজনীয় বিষয় সমাধান করে নেবে। সুতরাং কিছু মহিলাকে প্রচলিত দ্বীনি শিক্ষায় শিক্ষিত করা ওয়াজিব। কেননা ওয়াজিবের মাধ্যমও ওয়াজিব হয়ে থাকে।[৩২১]

পুরুষের তুলনায় নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অত্যধিক

সৎ-চরিত্রবান ও আদর্শ সন্তান গঠনের জন্য নারীশিক্ষার গুরুত্ব অত্যধিক। নারীজাতি শিক্ষিত না হলে তার মন্দ প্রভাব পুরুষের ওপর আপতিত হয়। সন্তান-সন্ততি অধিকাংশ সময় মাতৃকোড়েই লালিত হয়। এ জন্য সন্তানের ওপর মায়ের প্রভাব বেশি প্রভাবিত হয়। বিজ্ঞজনেরা বলেছেন, ছোট শিশুরা যখন বাক্যালাপ করতে পারে না, তখন তাদের সামনে আলোচিত কথাবার্তা এবং সংঘটিত কর্ম তাদের স্মৃতিতে অঙ্কিত হয়ে যায়। এ জন্য অবুঝ শিশুর সামনে অনাকাঙ্ক্ষিত কথাবার্তা উচিত নয়।

বিজ্ঞজনরা এটাও লিখেছেন, মাতৃগর্ভে বাচ্চা যখন ভ্রূণ হিসেবে বসবাস করে, তখন মায়ের কৃতকর্মের প্রভাব বাচ্চার ওপর প্রভাব ফেলে। এ জন্য নারীদের শিক্ষা ও সংশোধন বেশি প্রয়োজন। কেননা পুরুষ সন্তানরা তো মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ট হওয়ার পর উস্তাদ ও মাশায়েখদের সান্নিধ্যে যাওয়ার সুযোগ পায়, যদ্বারা তাদের সংশোধনের সুযোগ সৃষ্টি হয়। নারীজাতির জন্য সাধারণত এ সুযোগ হয়ে ওঠে না। নারীরা সর্বদাই ঘরে অবস্থান করে এবং ঘরে অবস্থান করাই তাদের জন্য অধিক নিরাপদ।

মোটকথা, যুগের চাহিদা হলো নারীদের মাঝেও দ্বীনি ইলম অর্জনকারী কোনো মনীষী বিদ্যমান থাকবে এবং তাদের মাধ্যমে নারীদের সংশোধন করা সহজ হয়ে যাবে। কেননা পুরুষদের আলেম হওয়ার দ্বারা মহিলারা পরিপূর্ণ সংশোধিত হতে পারে না।[৩২২] আল্লাহ না করুন! নারীরা সুশিক্ষা থেকে বঞ্চিত হলে তার সম্পূর্ণ দায়ভার মাতাপিতার ওপর বর্তাবে যে,

---

[৩২১] *ইসলাহে ইনকিলাব*, ১/২৬৫।
[৩২২] *আত-তাবলীগ*, ১৪/১৬৪-৬৬।

তারা নিজ কন্যাদের শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারে পরিপূর্ণভাবে গুরুত্বারোপ করেনি।[৩২৩]

নারীদের দ্বীনি শিক্ষার উপকারিতা

আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, নারীদেরকে দ্বীনি শিক্ষা দিয়ে দেখুন, তাদের মাঝে এত পরিমাণ বুঝ-বুদ্ধি, বিচক্ষণতা এবং দুনিয়াবি বিষয়ে সীমাহীন যোগ্যতা সৃষ্টি হয়, যার ফলে ইংরেজি শিক্ষায় এম. এ. পাশ করা মেম সাহেবরাও তাদের সমপর্যায়ে পৌঁছতে সক্ষম হবে না। তবে বেহায়া ও নির্লজ্জলতায় ইংরেজি শিক্ষিত মেয়েরা অগ্রগামী হয়ে যাবে। অনর্থক বাক্যালাপ ও বাচালতায় ইংরেজি শিক্ষিত মেয়েরা অগ্রগামী হলেও যুক্তিনির্ভর ও মূল্যবান কথোপকথনে দ্বীনি শিক্ষায় শিক্ষিত নারীরাই অগ্রগণ্য। স্বামীরা শুধু বিবিদের দোষ ধরলেই হবে না, বরং তাদের দ্বীনি শিক্ষার বিষয়েও গুরুত্বারোপ করতে হবে।[৩২৪]

দ্বীনি শিক্ষা বনাম আধুনিক শিক্ষা

দুনিয়ায় যত শিক্ষা ও শিষ্টাচার রয়েছে, তার মধ্যে একমাত্র দ্বীনি শিক্ষা ও শিষ্টাচারই সঠিক শিক্ষা ও দীক্ষা দিয়ে থাকে। কারও মনে সন্দেহের আবির্ভাব হলে বাস্তবতার নিরিখে যাচাই করে দেখার সুযোগ রয়েছে। দ্বীনি শিক্ষায় শিক্ষিত একজন নারী ও জাগতিক শিক্ষায় শিক্ষিত একজন নারীর মাঝে যদি তুলনা করা হয়, তাহলে তাদের মধ্যে আসমান-জমিনের ব্যবধান পরিলক্ষিত হবে। তবে লৌকিকতা প্রদর্শন ও কৃত্রিমতাকে কেউ যদি শিষ্টাচার আখ্যা দেয়, তাহলে এটা হবে তার ভুল যে, সে বস্তুর মৌলিক রহস্য উদঘাটনে ভুল করেছে। কারও সামনে যদি এমন কোনো দ্বীনি শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তির আবির্ভাব হয়, যার মাঝে উত্তম চরিত্র ও শিষ্টাচারের স্বল্পতা রয়েছে, তাহলে বুঝতে হবে এখনো দ্বীনের পূর্ণ প্রতিক্রিয়া তার মাঝে প্রভাব বিস্তার করেনি।[৩২৫]

---

[৩২৩] প্রাগুক্ত, ৭/৬২।
[৩২৪] *আত-তাবলীগ*, ২১।
[৩২৫] *ইসলাহে ইনকিলাব*, ২৭০।

দ্বীনি শিক্ষার অভাবে অপূরণীয় ক্ষতি

বর্তমানে ইসলামী শিক্ষাকে দূরে ঠেলে এমন শিক্ষাকে গ্রহণ করা হচ্ছে যা বাস্তবে ক্ষতিকর। ফলশ্রুতিতে উপকারী ও বাস্তবিক শিক্ষায় ভাটা পড়ছে। এমনকি দ্বীনি শিক্ষার অভাবে মানব সমাজ থেকে শিষ্টাচার ও ভদ্রতা হারিয়ে যাচ্ছে। নারীদের মাঝে ভালোবাসা, সেবা করার মানসিকতা ও অন্যকে প্রাধান্য দেওয়ার গুণাবলি বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তাদের স্বামীর সাথে বনিবনা হচ্ছে না। কেননা ইসলামী শিক্ষার অভাবে তাদের মাঝে নির্বুদ্ধিতা ও বাচালতা বিদ্যমান রয়েছে। মুখে যাই আসে নির্দ্বিধায় বলতে থাকে, যার ফলে স্বামীর হৃদয় ব্যথিত হয় এবং গৃহযুদ্ধ লেগে গিয়ে জীবনে তিক্ততা বাসা বাঁধে।[৩২৬]

নারীশিক্ষায় উত্থাপিত প্রশ্ন ও তার জবাব

অতিবুদ্ধিজীবী এক শ্রেণির মানুষ নারীশিক্ষাকে এই বলে কটাক্ষ করে যে, নারীর শিক্ষা অর্জনে তাদের জন্য উপকারের তুলনায় ক্ষতির পরিমাণ বেশি। কেননা তাদের শিক্ষার দরুন অনেক ফেতনার আবির্ভাব হয়, যা বন্ধ করা অপরিহার্য। কিন্তু তাদের উক্ত ধারণা ভ্রান্ত প্রমাণ হবেই। উদাহরণ হিসেবে ধরা যাক, কোনো পরিবারের কর্তা তার সকল সদস্যদের খাবার খাওয়ানোর পর সকলের পেট খারাপ হয়ে গেল। এখন পরিবারকর্তা এই সিদ্ধান্ত নিল যে, খাবার খাওয়ার দ্বারা যেহেতু সকলের পেটে সমস্যা হয়েছে, তাই সকলের খাবার বন্ধ থাকবে এবং মনে মনে ধারণা করল খাওয়া-দাওয়ার মতো ক্ষতিকর আর কোনো বস্তু নেই। সুতরাং শিক্ষার মাধ্যমে ঘটনাচক্রে কেউ যদি ক্ষতির সম্মুখীন হয়েও যায় তাহলে বুঝতে হবে, এটা শিক্ষার সদ্ব্যবহার না করার কারণে হয়েছে, মৌলিক শিক্ষা অর্জনের জন্য নয়।[৩২৭]

এখন যদি মেনেও নিই যে, শিক্ষার মধ্যে ক্ষতিকর দিক রয়েছে, তাহলে শুধুমাত্র নারীরাই কেন সেই ক্ষতির সম্মুখীন হবে? যদি পুরুষরাও শিক্ষা অর্জনে অগ্রসর হয় তারাও তো উক্ত ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে? তাহলে

---

[৩২৬] *আত-তাবলীগ*, ৭/৮২।
[৩২৭] *আল আ-কিলাতু আল গা-ফিলাতু*, ৩০৬।

কোন যুক্তিতে নারীদেরকে শিক্ষা-দীক্ষা থেকে দূরে ঠেলে দিয়ে শুধুমাত্র পুরুষদেরকে গুরুত্ব সহকারে সামগ্রিক বিষয়ে শিক্ষিত করার পেছনে উঠেপড়ে লেগেছে![৩২৮]

নারীদের শিক্ষিত করা পুরুষদের আবশ্যকীয় দায়িত্ব

সমাজের পুরুষরা নারীদের শিক্ষা দেওয়াকে নিজেদের দায়িত্ব মনে করে না। অথচ পুরুষদের দায়িত্বে নারীদের শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। পুরুষদের ওপর নারীদেরকে দ্বীনি শিক্ষা দেওয়া ওয়াজিব। হাদীস শরীফে আছে : তোমরা সকলেই দায়িত্বশীল। কেয়ামতের দিন তোমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। প্রত্যেক পুরুষ নিজ পরিবারে সকলের দায়িত্বশীল। কেয়ামতের দিন পুরুষদেরকে তাদের অধীনস্তদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমরা অধীনস্তদের অধিকার কতটুকু আদায় করেছ?[৩২৯]

শুধু ভরণ-পোষণ দেওয়াতেই হক আদায় করা হয় না। কেননা ভরণ-পোষণ শুধুমাত্র দুনিয়া পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। দুনিয়ার জীবন শেষ হলে ভরণ-পোষণের প্রয়োজন মিটে যায়। এ জন্য শুধুমাত্র ভরণ-পোষণের ওপর সীমাবদ্ধ করলেই হক আদায় হয় না। এ জন্য আল্লাহ তাআলা পরিষ্কার ভাষায় কালামুল্লাহ শরীফে এরশাদ করেছেন :

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজেদের এবং নিজেদের পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও। (সূরা তাহরিম, ৬৬ : ৬)

অর্থাৎ নারীদের দ্বীনি শিক্ষায় শিক্ষিত করো। খোদায়ী হকসমূহ শেখানোর পাশাপাশি তদনুযায়ী আমল করার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করো। গৃহের সদস্যদের জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানোর অর্থ হলো, তাদেরকে জাহান্নামের ব্যাপারে সতর্ক করো। কিছু মানুষের অবস্থা হচ্ছে, তারা মৌখিকভাবে বলেই ক্ষান্ত হয়, কিন্তু কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করার ব্যাপারে অলসতা করে। তাদেরকে জিজ্ঞেস করলে উত্তর দেয়, আমি

---

[৩২৮] *ইসলাহে ইনকিলাব*, ২৬৮।
[৩২৯] *সহীহ বুখারী*, হাদীস নং ৫২০০।

পরিবারের সদস্যদেরকে বারংবার বলেছি, কিন্তু তারা না মানলে আমি কী করব?

আসল কথা হলো, পুরুষরা দ্বীনি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে গুরুত্ব প্রদান করে না। ভরণ-পোষণ আবশ্যক, ফ্যাশন্যাবল জীবন-যাপন আবশ্যক, সুনাম রক্ষা আবশ্যক; কিন্তু অপ্রয়োজনীয় বিষয় হচ্ছে একমাত্র দ্বীন! দুনিয়াবি কোনো বিষয়ে কোনো ক্ষতির সম্মুখীন হলে তা সমাধান করা প্রয়োজন মনে করলেও দ্বীনি কোনো বিষয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হলেও তার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করার প্রয়োজন মনে করে না। অথচ যদি দ্বীনি কোনো সমস্যা হয়ে যায় তাহলে কতই-না ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে? আর ক্ষতিটা যদি ঈমান ভঙ্গের কারণ নাও হয়, বেঈমান হওয়া থেকে নিষ্কৃতি পেলেও কিছু সময়ের জন্য হলেও খোদায়ী শাস্তি অবশ্যই ভোগ করতে হবে। আর ঈমান নষ্টের কারণ হলে তো চিরকালের জন্য ধ্বংস অনিবার্য। আশ্চর্যের বিষয়, মানুষ দুনিয়াবি বিষয়ে উদাসীন না হলেও দ্বীনি বিষয়ে কীভাবে উদাসীন হয়ে যায়![৩৩০]

হাদীসের ভাষ্যমতে সারকথা দাঁড়ালো, বড়রা ছোটদের দায়িত্বশীল হয় এবং এ ব্যাপারে বড়রা জিজ্ঞাসিত হবে। সুতরাং যেভাবেই হোক পুরুষরা নারীদের দ্বীনি শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করবে অথবা এক নারী অন্য নারীকে শিখিয়ে দেবে। শিক্ষা দেওয়ার পাশাপাশি তাদেরকে তদনুযায়ী আমল করানোর ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করতে হবে। নতুবা খোদায়ী জিজ্ঞাসা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে না।[৩৩১]

নারীদের দ্বীনি শিক্ষা না দেওয়া অন্যায়

বর্তমানে পরিস্থিতি হচ্ছে, পুরুষরা ঘরে প্রবেশ করেই প্রথমে জিজ্ঞেস করে, খাবার রান্না হয়েছে কি না? যদি খাবার প্রস্তুত হয়ে থাকে কিন্তু তাতে লবণের পরিমাণ বেশি হয়ে যায়, তাহলেই গৃহের বাসিন্দাদের ওপর শুরু হয় অত্যাচার। বর্তমানে পুরুষরা নারীদের দ্বীন ও দুনিয়াবি কোনো বিষয়ে গুরুত্ব দেয় না। শুধুমাত্র নিজের আরাম-আয়েশের চিন্তায় নিমগ্ন

---

[৩৩০] *বুকুকুয যাওজাইন*, ৩৫, *দাওয়াত ও আবদিয়্যাত*, ১৭০।
[৩৩১] *দাওয়াত ও আবদিয়্যাত*, ৮৯।

থাকে। দিবানিশি নারীদের থেকে সেবা নিতে থাকে। কখনো চুলার পাড়ে, কখনো কাপড় সেলাইয়ের কাজে ব্যতিব্যস্ত রাখে। দ্বীন-দুনিয়ার কোনো বিষয়ে চিন্তা নেই, তাদের আরাম-আয়েশের প্রতি খেয়াল নেই। বরং নারীদেরকে অজ্ঞ ও মূর্খ বানিয়ে রাখে।

স্মরণ রাখবেন, আপনারা নারীদের প্রতি খুবই অন্যায় করছেন। আমাদের উচিত নিজেরা দ্বীনি শিক্ষা অর্জনের পাশাপাশি নারীদেরকেও দ্বীনি শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা। যে পদ্ধতি আল্লাহ তাআলা তাঁর কালামে বর্ণনা করেছেন যে, প্রথমে দ্বীনি ইলম অর্জন করো, পুনরায় তদনুযায়ী আমলের ওপর গুরুত্বারোপ করো।[৩৩২]

নারীদের আরবী শিক্ষা

আমি নারীশিক্ষার বিরুদ্ধে নই। কিন্তু আমি বলতে চাই, আপনারা নারীদেরকে প্রথমে ধর্মীয় শিক্ষা দেবেন। এর চেয়ে বেশি হিম্মত থাকলে দ্বীনি শিক্ষার পাশাপাশি আরবী শিক্ষা প্রদান করবেন। এখানে 'অতিরিক্ত হিম্মত' এর শর্তারোপ এ জন্য করেছি যে, আরবী শিক্ষার জন্য অধিক বুঝশক্তি ও পরিশ্রম করা জরুরি।[৩৩৩] বাস্তবিকপক্ষে পুরুষরা সমস্ত শিক্ষা অর্জন করতে পারে, কিন্তু সাধারণত নারীরা সবকিছু অর্জন করতে সক্ষম হয় না। কেননা সামগ্রিক বিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জন করতে হলে অধিক উদ্যমতা আবশ্যক, যা নারীদের মাঝে বিদ্যমান নেই। কিন্তু বর্তমানে স্বাধীনতার নামে সকলের বুঝ-বুদ্ধির বদহজম আরম্ভ হয়েছে। প্রত্যেকেই স্বাধীনতার দাবি তুলছে। তাই নারীরা কোনো দিক থেকেই পুরুষদের থেকে পিছিয়ে থাকতে চায় না। নারীরাও সকল বিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জন করতে বদ্ধপরিকর। লেখালিখির ময়দানে পদচারণা আরম্ভ করেছে, এমনকি বিভিন্ন পত্রিকায়ও কলাম লেখা আরম্ভ করেছে।

'সমস্ত বিদ্যা উপকারী'—এই মূলনীতি সঠিক নয়। এটাও সঠিক নয় যে, সমস্ত মানুষের সর্বপ্রকার বিদ্যা অর্জনের যোগ্যতা রয়েছে। সামগ্রিক জ্ঞান অর্জনের যোগ্যতা পুরুষের মাঝে বিদ্যমান। নারীরা যদি এ ক্ষেত্রে

---

[৩৩২] *আত-তাবলীগ*, ৪/২৩।
[৩৩৩] প্রাগুক্ত, ১৪/২২৬।

পুরুষদের সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়, তাহলে ক্ষমতাহীন বিষয়ে লড়াই করার নামান্তর হবে। ফলশ্রুতিতে নারীসুলভ যে গুণাবলি তাদের মাঝে থাকা বাঞ্ছনীয়, সেগুলো তাদের থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। দিবানিশি তার প্রমাণ জনসমাজে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে।[৩৩৪]

সুতরাং নারীদের জন্য উত্তম হচ্ছে দ্বীনি শিক্ষা প্রদানের পর যদি কারও মাঝে অতিরিক্ত যোগ্যতা পরিলক্ষিত হয়, তাহলে তাকে আরবী শিক্ষার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে তুলবে। যাতে করে কুরআন-হাদীস ও ইসলামী ফিকহ মৌলিক আরবী ভাষায় বোঝার উপযুক্ত হতে পারে। কিছু কিছু নারীকে দেখা যায় তারা কুরআনুল কারীমের তরজমা নিজেরাই পড়তে থাকে। আমার দৃষ্টিতে এটা অনেক বড় ধরনের ভুল। কেননা সব মর্মার্থ উপলব্ধি করতে না পেরে ভুল বুঝতে পারে। এ জন্য অধিকাংশ নারীর ক্ষেত্রে কুরআনুল কারীমের শুধু অনুবাদ পাঠ করা সমীচীন নয়।[৩৩৫]

কন্যাশিশু ও নারীদেরকে আলেমা হিসেবে গড়ে তোলা

দ্বীনি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা দেওয়ার পর কোনো কন্যা ও নারীর মাঝে যদি যোগ্যতা পরিলক্ষিত হয়, তাহলে তাকে আরবী শিক্ষার প্রতি ধাবিত করবেন। যাতে কুরআন-হাদীস ও ইসলামী ফিকাহকে আরবী ভাষায় রপ্ত করতে পারে। কোনো এক মজলিসে জনৈক ব্যক্তি কন্যাশিশুর আলোচনা তুলে বলছিল, হৃদয়ের সুপ্ত বাসনা এমন কন্যাদেরকে আলেমা হিসেবে গোড়া তোলা! খাজা সাহেব বলে উঠলেন, পূর্বেকার নারীরাও কি আলেমা ছিলেন? উত্তরে বলা হলো, জি, পূর্বেকার নারীদের মাঝে বড় বড় দ্বীনি বিদ্বান ছিলেন। অতীতকালে যদিও পুরুষদের সমপর্যায়ের আলেমা ছিল না, তবে নারী হিসেবে উঁচু মাপের দ্বীনি বিদ্বান বিদ্যমান ছিল।[৩৩৬]

নারী বা পুরুষ উভয়কে আলেম বানানোর জন্য যাচাই-বাছাই জরুরি

মাদরাসার দায়িত্বশীল ও শিক্ষকদের সকল শিক্ষার্থীকে আরবী শিক্ষা দেওয়া উচিত নয়। বরং যার মাঝে উপযুক্ত যোগ্যতা ও বিচক্ষণতা

---

[৩৩৪] প্রাগুক্ত, ৭/৬৭-৬৮।
[৩৩৫] *ইসলাহে ইনকিলাব*, ১/২৭৩।
[৩৩৬] *ইসলাহুল ইয়াতামা*, ৪০২।

পরিলক্ষিত হবে, তাকেই সমস্ত কিতাব পড়িয়ে দেবে। আর যার মাঝে যোগ্যতা থাকবে না, তাকে দ্বীনের প্রয়োজনীয় শিক্ষা দিয়ে বলবে যাও, দুনিয়া অর্জনের পেছনে সময় ব্যয় করে অর্থ উপার্জন করো। কিন্তু বর্তমানে মাদরাসার দায়িত্বশীলরা এগুলোর প্রতি একেবারেই দৃষ্টিপাত করে না। যত ছাত্রই মাদরাসায় ভর্তি হতে আসে, সকলেই কি দ্বীনি ইলমের উপযুক্ত? কখনোই না। কোন কারণে শিক্ষার্থী যাচাই-বাছাই করা হয় না? এ ধরনের শিক্ষার্থীদের জন্য এমন একটা শিক্ষা সিলেবাস নির্ধারণ করা উচিত, যার অতিরিক্ত তাদেরকে পাঠদান করা যাবে না। সে সিলেবাসটা এমন হতে হবে, যার মাঝে দ্বীনের প্রয়োজনীয় মাসআলা-মাসায়েল বিদ্যমান থাকবে।

যে সমস্ত শিক্ষার্থী লোভী ও নিচু স্বভাবের হবে, তাদেরকে জরুরি শিক্ষা দিয়ে ক্ষান্ত করবে, পুরোপুরি আলেম বানাবে না। উঁচু-নিচু সব স্বভাবের শিক্ষার্থীদেরকে আলেম বানিয়ে দেওয়া একটি মারাত্মক ভুল, যা থেকে বেঁচে থাকা জরুরি। সালফে সালেহীনও শিক্ষার্থী যাচাই-বাছাই করে শিক্ষা দিতেন। আশ্চর্যের বিষয়, বিভিন্ন অবস্থার মাধ্যমে কোনো শিক্ষার্থীকে অযোগ্য প্রমাণিত হলেও যে সমস্ত ব্যক্তিরা অযোগ্যদের শিক্ষা দেবে, তারাও তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে কেয়ামতের দিন জিজ্ঞাসিত হবে। লন্ডনে একটি নির্বাচক দল রয়েছে, তারা যাকে যে শিক্ষার উপযুক্ত মনে করে, তাকে সেই শিক্ষায় নিয়োজিত করে। উক্ত পদ্ধতি মাদরাসার দায়িত্বশীলদেরও অবলম্বন করা উচিত।[৩৩৭]

নারীদের কুরআনে কারিম হিফজ করা

ছেলে-মেয়ে যে-ই হোক, উপযুক্ত বয়স হওয়ার সাথে সাথেই তাদেরকে কুরআনের শিক্ষা প্রদান করবেন। কুরআন শরীফ অত্যন্ত মূল্যবান বস্তু, কোনো অবস্থাতেই তার শিক্ষা বন্ধ করা যাবে না। এমন চিন্তা করা যাবে না যে, কুরআন শিক্ষা করলে সময় নষ্ট হয়। সম্ভব হলে পূর্ণ কুরআন শরীফ হিফজ করাবে। পূর্ণ না হলেও অর্ধাংশ অথবা কমপক্ষে এক মনজিল মুখস্থ করাবে, যাতে ছোট ছোট সূরাগুলো নামাযে তিলাওয়াত

---

[৩৩৭] *ইসলাহে ইনকিলাব*, ১/২৭৩।

করতে সক্ষম হয়। এক মনজিল পড়ালে কতটুকুই-বা সময় ব্যয় হবে? কুরআনের একটি পরীক্ষিত অলৌকিক বরকত হলো, যদি কেউ কুরআন হিফজ করে তাহলে হাফেজে কুরআনের জন্য অন্যান্য বিদ্যা অর্জন অনেক সহজ হয়ে যায়, যা অন্যদের কাছে কঠিন মনে হয়।[৩৩৮]

নারীদের পাঠপরিকল্পনা

আমি মনে করি, নারীদেরকে দ্বীনি শিক্ষায় শিক্ষিত করার ক্ষেত্রে কুরআন মাজীদের অনুবাদ ও তাফসীর, ফিকাহ ও তাসাউফের শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে। যে শিক্ষার মাধ্যমে নারীর বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সংশোধন হয়ে যাবে। নারীদের জন্য এমন কিতাবাদি জরুরি, যা পাঠ করার দ্বারা হৃদয়ে আল্লাহর ভয়, জান্নাতের আকাঙ্ক্ষা ও জাহান্নামের ভয় জাগ্রত হয়। এ জাতীয় শিক্ষার প্রতিক্রিয়া নারীদের ওপর খুবই প্রভাব বিস্তার করে। সে লক্ষ্যে আমি বারংবার বলছি, নারীদেরকে প্রয়োজন অনুপাতে সেই শিক্ষাই প্রদান করতে হবে, যা 'পুরোনো শিক্ষা' হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। সেই শিক্ষা মানব চরিত্রের সংশোধন করবে, যা দ্বারা নারীর দুনিয়া ও আখেরাত উভয়ই সঠিক হয়ে যাবে। মোটকথা নারীদের আকিদা, অভ্যাস, লেনদেন, স্বভাব-চরিত্র ইত্যাদি সবকিছু পরিশুদ্ধ হয়ে যাবে।[৩৩৯]

ছোটকাল থেকেই বাচ্চাদেরকে নতুন কারিকুলামের শিক্ষা তথা ইংরেজি শিক্ষার পরিবর্তে পুরাতন শিক্ষা তথা ইসলামী শিক্ষা দিতে হবে। যাতে করে দ্বীনি শিক্ষা তাদের শিরা-উপশিরায় গেঁথে যায়। যদি এভাবে তাদেরকে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহলে বড় হলে তাদের লাজুকতা, পর্দা-পুশিদা, শিষ্টাচার, দ্বীনদারিত্ব ও বুঝ-বুদ্ধি কী পরিমাণ পোক্ত হয় দেখতে পাবেন।[৩৪০]

মৌলিক কথা

এখন আলোচনার বিষয় হলো, নারীদের শিক্ষার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। কিন্তু তাদেরকে কোন ধরনের শিক্ষা দিতে হবে তা নির্ধারণ করা উচিত।

---

[৩৩৮] *হুকুকুয যাওজাইন*।
[৩৩৯] *আত-তাবলীগ*, ৭২-৭৩।
[৩৪০] প্রাগুক্ত: ৮০।

সংক্ষেপে বলতে গেলে নারীদেরকে দ্বীনি শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে। তবে হ্যাঁ, ঘরের হিসাব-কিতাব লিপিবদ্ধ করা অথবা কাপড় ওয়াশের বিষয়গুলো টুকে রাখার জন্য যতটুকু গাণিতিক বিদ্যা জানা জরুরি, সে অনুপাতে শিখতে হবে। কিন্তু প্রয়োজনের বাইরে শুধু পাণ্ডিত্য অর্জনের জন্য শিক্ষা অর্জন করা ক্ষতিকর হিসেবে বিবেচ্য হবে। যোগ্যতা তখনই গ্রহণযোগ্য হয়, যখন তাতে ক্ষতিকর বিষয়াদি বিদ্যমান থাকে না। কিন্তু আমরা অভিজ্ঞতার আলোকে উপলব্ধি করেছি যে, ইংরেজি তথা আধুনিক শিক্ষায় ক্ষতির উপকরণ রয়েছে। এ জন্য নারীশিক্ষায় কখনো ক্ষতিকর বিষয়াবলি থাকতে পারবে না। দ্বীনি শিক্ষায় কোনো ক্ষতিকর বিষয়ের উপস্থিতি থাকতে পারে না। দ্বীনি শিক্ষায় সীমাহীন ফযিলত ও উপকারিতা থাকা সত্ত্বেও তা কীভাবে ক্ষতিকর হতে পারে![৩৪১]

নারীশিক্ষার পাঠ্যসূচি

নারীদের পাঠ্যসূচি কী হতে পারে? নিজস্ব মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত না নিয়ে এ ব্যাপারে কোনো বিজ্ঞ আলেম থেকে পরামর্শপূর্বক পাঠ্যসূচি নির্ধারণ করতে হবে।[৩৪২] নারীদের পাঠ্যসূচিতে যতটুকু সম্ভব শুদ্ধভাবে কুরআন মাজীদ শিক্ষার ব্যবস্থা রাখতে হবে। তার পাশাপাশি সহজ-সাবলীল ভাষায় এমন দ্বীনি কিতাবাদি শিক্ষা দিতে হবে, যাতে করে দ্বীন-বিষয়ক সকল অংশ বিদ্যমান থাকে। আমার মতে বেহেশতী জেওরের দশ খণ্ডই থাকতে পারে। তার সাথে বেহেশতী জেওরের শেষে উপকারী কিছু প্রবন্ধ উল্লেখ করা হয়েছে, যা নারীদের পঠন-পাঠনে যুক্ত রাখা উপকারী হিসেবে বিবেচ্য হবে। সম্পূর্ণ পড়া সম্ভব না হলেও প্রয়োজনীয় অধ্যায়গুলো অধ্যয়ন করে বাকিগুলো চর্চায় রাখার প্রয়াস চালাবে। উপকারী কিতাবাদি পাঠ করা থেকে উদাসীন হওয়া উচিত নয়।[৩৪৩]

নারীদের কাছে এমন কিতাবাদি পৌঁছাতে হবে, যার মাঝে দ্বীনের সম্পূর্ণ অংশবিশেষের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা থাকবে। আকিদাগত বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা, ওজু ও পানির পাক-নাপাকের মাসায়েল, নামায, রোযা, হজ,

---

[৩৪১] *হুকুকুয যাওজাইন*, ৩০৭।
[৩৪২] *আত-তাবলীগ*, ২৩৪।
[৩৪৩] *ইসলাহে ইনকিলাব*, ২৭২।

যাকাত, বিবাহ, লেনদেন-সংক্রান্ত মাসায়েল থাকবে। চরিত্র গঠনের আলোচনা, শিষ্টাচার-ভদ্রতা সম্পর্কিত বিষয়াদিও উল্লেখ থাকবে। এ ধরনের কিতাবাদি সংগ্রহ করা সংশ্লিষ্ট পুরুষের দায়িত্ব। যদি সে নিজ দায়িত্ব পালনে অলসতা করে, তাহলে সে আল্লাহর দরবারে প্রশ্নের সম্মুখীন হবে।[৩৪৪]

নারীশিক্ষার পাঠ্যসূচির সারসংক্ষেপ
বেহেশতী জেওরের গুরুত্ব, উপকারিতা ও বৈশিষ্ট

নারীদের পাঠ্যসূচিতে নিম্নে বর্ণিত বিষয়সমূহের কিতাবাদি থাকা জরুরি :

- ✓ আকিদা-বিশ্বাসের পুস্তিকা
- ✓ দ্বীনিয়াত : তথা পবিত্রতা-সংক্রান্ত মাসায়েল, নামায, রোযা, যাকাত, হজ এবং বিবাহ, তালাক-সংক্রান্ত মাসায়েল, ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদির গুরুত্বপূর্ণ বিধিবিধান।
- ✓ হাদীসের আলোকে কেয়ামত-সংক্রান্ত ঘটনাবলি।
- ✓ উত্তম স্ত্রীদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও ঘটনাবলি।
- ✓ গৃহস্থালি-সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কিছু অতিরিক্ত দক্ষতা অর্জন, যথা সেলাই করা, রান্না-বান্না ইত্যাদি।
- ✓ চিকিৎসা-সংক্রান্ত মৌলিক কিছু ধারণা এবং প্রতিকার, যা সন্তান-সন্ততি ও গৃহের বাসিন্দাদের উপকারে আসে।

এটাই নারীদের গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক শিক্ষার পাঠ্যসূচি। উপরোক্ত বিষয়াবলির জন্য পূর্ণাঙ্গ বেহেশতী জেওর খুবই উপকারী হবে। যদি কারও কাছে বেহেশতী জেওর পছন্দ না হয় তাহলে তাতে উল্লেখিত বিষয়বস্তু যে কিতাবে সন্নিবেশিত করা হয়েছে, এ ধরনের কিতাবাদি অথবা বেহেশতী জেওরের যে মাসআলা অপছন্দনীয় মনে হয়, আমি নিজে উক্ত মাসআলা কেটে দেওয়ার অনুমতি দিচ্ছি। তবে শর্ত হলো, কর্তিত অথবা বর্ধিত ইবারতের পরিবর্তে অন্য ইবারত উল্লেখ করার পর টীকা সংযুক্ত করে মূল ইবারত যুক্ত করে দিতে হবে। যাতে বোঝা যায় কোন ইবারতের পরিবর্তে কোন ইবারত যুক্ত করা হয়েছে। পাশাপাশি এটাও

---

[৩৪৪] *হুকুকুয যাওজাইন*, ১০২।

খেয়াল রাখতে হবে যে, শরীয়ত-বহির্ভূত কোনো আলোচনা যেন উল্লেখ না থাকে। অথবা কারও কাছে বেহেশতী জেওর অপছন্দনীয় হলে সে নিজের ভাষায় সমপর্যায়ের এমন কোনো কিতাব রচনা করুক, আমি আমার পরিচিত মহলে উক্ত কিতাবের ঘোষণা দিয়ে দেব যে, অমুক ভাই বেহেশতী জেওরের পরিবর্তে বেহেশতী জেওরের সমপর্যায়ের নতুন একটি কিতাব রচনা করেছেন। সুতরাং সকলেই বেহেশতী জেওরের পরিবর্তে উক্ত কিতাবকে গ্রহণ করে নিন। কিন্তু শর্ত হলো, লিখিত কিতাবে অবশ্যই ইবাদাত, মুআমালাত, ইবাদতে উৎসাহ-উদ্দীপনাসংক্রান্ত আলোচনা, আদব-আখলাকসংক্রান্ত আলোচনাসহ জীবনঘনিষ্ট প্রয়োজনীয় বিষয় উল্লেখ থাকতে হবে।

জাগতিক বিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জন ও পেশাজীবী শিক্ষা

আধুনিক শিক্ষার নামে প্রচলিত শিক্ষা নারীদেরকে কখনো শেখাবেন না। তবে জাগতিক বিষয়াবলি থেকে প্রয়োজন অনুপাতে হস্তলিপি ও হিসাব-কিতাবসংক্রান্ত মৌলিক ধারণা অর্জনের পাশাপাশি কোনো ধরনের পেশাজীবী কর্ম শেখানো উচিত। বরং বর্তমান প্রেক্ষাপটে কোনো শিল্প সম্পর্কে ধারণা লাভ করা খুবই জরুরি। (আল্লাহ না করুন) কখনো দায়িত্বশীল অভিভাবকের অনুপস্থিতিতে সম্মানের সাথে যেন জীবিকা অর্জনের কাজে লাগাতে পারে।[৩৪৫]

নারীদেরকে ইংরেজি শিক্ষা ও আধুনিক শিক্ষা

নারীদেরকে ইংরেজি শেখানোর দ্বারা এম. এ. ও বি. এ. পাশ করানো উদ্দেশ্য নয়। এম. এ. পাশ করে তারা কী করবে? তারা তো মেম সাহেব হয়ে বসে থাকবে। বি. এ. পাশ করানোরও কোনো প্রয়োজন নেই। আজকাল একটা রুসুম-রেওয়াজে পরিণত হয়ে গেছে, নারীদেরকে এম. এ. ও বি. এ. পাশ করানোর হিড়িক পড়ে গেছে। এত পড়িয়ে কী হবে? তাদেরকে দিয়ে চাকুরি করাবে নাকি যে, এত বড় বড় ডিগ্রি অর্জন করাতে হবে?[৩৪৬]

---

[৩৪৫] *ইসলাহে ইনকিলাব*, ২৭০।
[৩৪৬] *আত-তাবলীগ*, ৭/৬২।

আধুনিক শিক্ষার ক্ষতি

বর্তমান সমাজে প্রচলিত আধুনিক শিক্ষা মূলত কোনো শিক্ষাই নয়। বরং অজ্ঞতার ছড়াছড়ি। নারীদের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। এ শিক্ষা অর্জনের চেয়ে অজ্ঞ থাকাই শ্রেয়। অজ্ঞতার মাঝে ততটা ক্ষতি নেই যতটা ক্ষতি আধুনিক শিক্ষায় রয়েছে। শিক্ষা-দীক্ষার উপযুক্ত সময় হচ্ছে বাল্যকাল। আফসোস! বর্তমানকালে শহরে-গ্রামে বাল্যকালেই কন্যাশিশুদেরকে আধুনিক শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। যার ফলে আধুনিক শিক্ষা তাদের রগ-রেশায় প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে। ফলশ্রুতিতে অন্য কোনো শিক্ষা-দীক্ষা তাদের ওপর প্রভাব তৈরি করতে পারছে না।

ছোট ছোট কন্যাশিশুদের উদাহরণ হলো বৃক্ষের কাঁচা নরম ডালের মতো। তাকে যেই পদ্ধতিতে অটল রেখে শুষ্ক করবে, সেটা জীবনভর তেমনই থাকবে। বাল্যকাল থেকেই তাকে আধুনিক শিক্ষা, শিষ্টাচার, ভদ্রতা, আচার-ব্যবহার ও চাল-চলন শেখানোর ফলে তার দৃষ্টিতে আধুনিক কৃষ্টি-কালচার পোক্ত হতে থাকবে। বাল্যকাল পেরিয়ে যৌবনে পদার্পণ করলে তাকে কোনোভাবেই সংশোধন করা সম্ভব হবে না।[৩৪৭]

কিছু কিছু নারী আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মেম সাহেবদের অনুসারী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করতে থাকে। তাই মাথায় এক প্রকার পট্টি বাঁধে, যাতে মাথার চুল ছড়াতে না পারে এবং চুল রাখে ইংরেজদের স্টাইলে। ইংরেজদের অনুসারীরা যখন শুনতে পাবে যে, মেম সাহেবরা চুলের আগা কর্তন করা আরম্ভ করেছে, তখন তারাও তাদের অনুসরণে চুলের আগা কর্তন করা আরম্ভ করে দেবে। ফলে তাদের ব্যাপারেও হাদীসের অভিসম্পাতের বাণী কার্যকর হয়ে যাবে![৩৪৮]

আধুনিক শিক্ষা লজ্জাহীনতার উন্মুক্ত দ্বার

আফসোস ও পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, বর্তমানে উত্তম চরিত্রকে নিঃশেষ করে ফেলা হচ্ছে। অতীতে পাড়াগাঁয়ের দিকে লক্ষ করলে দেখা যেত,

---

[৩৪৭] প্রাগুক্ত, ২২০।
[৩৪৮] প্রাগুক্ত, ১৪/২২০, ৭/৬৫।

কোনো চামার বা মেথর নারীকেও কোনো কথা জিজ্ঞেস করা হলে তারা প্রথমে মুখ ফিরিয়ে ইশারার মাধ্যমে উত্তম দেওয়ার চেষ্টা করত। যেমন : কোনো অচেনা পথিক তার গন্তব্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তার সঠিক রাস্তা আঙুলের ইশারা দিয়ে দেখিয়ে দিত। আর যদি কথা বলার প্রয়োজন দেখা দিত তাহলে অপ্রয়োজনীয় বাক্যালাপ ছাড়াই সংক্ষিপ্ত শব্দে কোনো ধরনের কৃত্রিমতা ও লৌকিকতা প্রদর্শন না করে সমুচিত উত্তর দিয়ে দিত। উক্ত বাক্যালাপ ছিল শিষ্টাচারমুক্ত ও কর্কশ ভাষায় উপস্থাপিত। যেন কাউকে জোর করে কথোপকথনে বাধ্য করা হচ্ছে। গ্রামীণ পরিবেশে আজ অবধি মানুষের জন্মগত লাজুকতা অবশিষ্ট আছে। রুচির দুর্ভিক্ষের উপায়-উপকরণ গ্রামীণ পাড়া-মহল্লায় আজও ব্যাপকতা লাভ করেনি।[৩৪৯]

লাজুকতা নারীর জন্মগত স্বভাব। নারীর স্বভাবজাত গুণাবলির একটি হলো, সে পরপুরুষের সাথে মিশবে না এবং এমন কোনো কথা, কাজ ও চেষ্টা করবে না, যার দ্বারা পরপুরুষের সাথে কথোপকথনের সুযোগ তৈরি হয়। এটাই ইসলামী শরিয়তের সঠিক শিক্ষা। কুরআনুল কারীমে চিন্তা-ফিকিরের দ্বারা জানা যায় যে, আল্লাহ তাআলা এ ব্যাপারে এরশাদ করেন, 'হে নারীরা, (তোমরা) পরপুরুষের সাথে কোমল স্বরে কথোপকথন করবে না।'[৩৫০] এটাই শরীয়তের চাওয়া।

কিন্তু পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, নারীরা তাদের স্বভাবজাত চরিত্র থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। খারাপ ও বর্জনীয় বিষয়গুলোকে ভালো ও পছন্দনীয় হিসেবে গ্রহণ করছে। এমনকি বর্তমানকালে এমন কিছু বিষয়াদি ও চিন্তা-চেতনাকে গুণাবলি হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে, যা অবাধ মেলামেশার সুযোগ তৈরি করছে। এ ধরনের বিষয়াদি থেকে অবশ্যই বেঁচে থাকতে হবে। এগুলো সব আধুনিক শিক্ষার ফলে বিস্তার লাভ করছে। আল্লাহ তাআলা সবাইকে এ ধরনের কর্মকাণ্ড থেকে নিরাপদে রাখুন।[৩৫১]

---

[৩৪৯] এটা মুসান্নিফ রহ.-এর সময়ের কথা। বর্তমানে ইন্টারেটের যুগে শহর, উপশহর ও গ্রামগঞ্জে একই অবস্থা বিরাজ করছে।

[৩৫০] দেখুন সূরা আহযাব, ৩৩ : ৩২।

[৩৫১] *আত-তাবলীগ*, ৭৩-৭৯।

পাশ্চাত্য সমাজের নীতি স্বীকার

নারীর আধুনিকায়নের আওয়াজ তুলে আধুনিক শিক্ষায় ইউরোপ-আমেরিকার নারীরাই অগ্রগামী। কিন্তু খোদ ইউরোপীয়রা শিক্ষিত নারীদেরকে নিয়ে পড়েছে বিপদে। কেননা বর্তমানে তারা নিজেদেরকে পুরুষের সমপর্যায়ের দাবি করছে এবং পুরুষের সমপর্যায়ের অধিকারপ্রাপ্তির আওয়াজ তুলছে। প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে তারাই এখন বিপরীত আওয়াজ তুলছে যে, নারীদেরকে আধুনিক শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন নেই। কেননা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত নারীদের অবস্থা এই দাঁড়িয়েছে যে, তারা দাবি তুলছে, পুরুষদের নারীদের থেকে সেবা-শুশ্রূষা গ্রহণের অধিকার নেই। সেখানকার সমাজব্যবস্থা এতটাই অধঃপতিত যে, তালাক ও বিবাহ-বিচ্ছেদের বাজার গরম রয়েছে। নারীর ভুল-ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও প্রতিদিন অসংখ্য নারীরা আদালতে পুরুষের বিরুদ্ধে মামলা-মোকদ্দমা দায়ের করছে। অধিকাংশ বিচারালয় নারীদেরকে নির্যাতিত মনে করে পুরুষদের বিরুদ্ধে তাদের পক্ষে রায় ঘোষণা করছে।[৩৫২]

নারীর দর্শন ও তর্কবিদ্যা শিক্ষা

জনৈক ভদ্রলোক স্বীয় অভিজ্ঞতার আলোকে বলেন যে, 'আমি নিজে নিজে সিদ্ধান্ত নিয়েছি নারীদেরকে তর্কশাস্ত্র ও ধর্ম শাস্ত্র উভয়টি শিক্ষা দেওয়া উচিত নয়।' শুধুমাত্র পুরুষদের দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়ন করা উচিত। নারীদেরকে শুধুমাত্র ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া উচিত।[৩৫৩]

আরবী শিক্ষায় দক্ষ একজন বিজ্ঞ ভদ্রলোকের সাথে আমার সাক্ষাৎ হলো। সে আমাকে বলল, আমি আমার ঘরে ছেলেদেরকে ধর্ম শিক্ষা, দর্শন ও তর্ক শাস্ত্রসহ সব ধরনের শিক্ষা প্রদান করি, কিন্তু মেয়েদেরকে শুধুমাত্র ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান করছি। কেননা নারীদেরকে শুধুমাত্র ধর্মীয় জ্ঞানের মাধ্যমেই সংশোধন করতে হবে। অতিরিক্ত বিদ্যা অর্জন তাদের মাঝে

---

[৩৫২] প্রাগুক্ত, ১৪/২২৮।
[৩৫৩] প্রাগুক্ত, ৭/৬৬।

ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে। অভিজ্ঞতার আলোকে বলছি, এ ধরনের শিক্ষা তাদের জন্য ক্ষতিকর হিসেবে বিবেচ্য।[৩৫৪]

নারীর ইতিহাস শিক্ষা

নারীর যোগ্যতা সৃষ্টির জন্য যদি তাকে শিক্ষিত করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, তাহলে ইতিহাস পাঠ শিখিয়ে তাদেরকে কতটুকু শিক্ষিত করা যাবে? যেখানে শিক্ষা দেওয়া হয় : অমুক রাজা মারা গিয়েছে, অমুক সম্রাট অমুক সনে মৃত্যুবরণ করেন, অমুক স্থানে এতগুলো নদী ছিল, অমুক এলাকায় এত এত গ্রাম, কলকাতা এমন শহর, মুম্বাইয়ে অমুক অমুক ব্যবসা প্রচলিত—এগুলো দ্বারা তাদের কী উপকার হবে?

নারীদের জন্য দ্বীনি শিক্ষা ছাড়া অন্য কোনো শিক্ষা অধিক উপকারী নয়। যদি তাদেরকে ইতিহাস পড়াতেই হয়, তাহলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনী পড়ানো উচিত, এবং বুযুর্গদের জীবনী পড়ানো উচিত, যার শিক্ষা যেন তাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে এবং তাদেরকে উত্তম মানুষ তৈরিতে সাহায্য করে। কিন্তু বর্তমানে তাদেরকে দুনিয়ার সবকিছুর কিচ্ছা-কাহিনি পড়ানো হয়, যার ফলাফল খুবই ক্ষতিকর।[৩৫৫]

নারীর ভূগোল শিক্ষা

কতিপয় মানুষ নারীদেরকে ভূগোল শিক্ষা দিয়ে থাকে। আমার বুঝে আসে না, এতে তাদের উপকারিতা কী? যদি এ যুক্তি দেওয়া হয় যে, এতে তাদের ধীশক্তি বিস্তার লাভ করবে। প্রতিউত্তরে আমি বলতে চাই, তাতে এ উপকারিতা ছাড়া আর কিছু নেই যে, যদি তারা পলায়নের ইচ্ছা করে তাহলে কোনো ধরনের সময়ক্ষেপণ না করেই পলায়ন করতে পারবে। কেননা ভূগোল শিক্ষার কারণে সে আগে থেকেই অবগতি লাভ করেছে যে, অমুক দিকে লাখনৌ স্টেশন, অমুক দিকে গাজি আবাদ জংশন। এখান থেকে দিল্লির দূরুত্ব এত পরিমাণ এবং অমুক রাস্তায় যেতে হয়।

---

[৩৫৪] প্রাগুক্ত, ১৪/১৭০।
[৩৫৫] প্রাগুক্ত, ২১/৮১।

দিল্লিতে এত পরিমাণ হোটেল, সরাইখানা রয়েছে। যেদিকে চাও গমন করো এবং ইচ্ছানুযায়ী অবস্থান করো।

এখন চিন্তা করে বলুন! নারীদেরকে ভৌগোলিক বিষয়ে পাঠদান করলে পলায়ন করার ব্যাপারে সহযোগিতা হবে না? এটা ছাড়া অন্য কোনো উপকারিতা থাকলে আমাকে স্মরণ করে দেওয়ার অনুরোধ করছি। উক্ত আলোচনা শেষ করার পর জনৈক ভদ্রলোক এসে আরজ করলেন, আমি আমার ঘরের নারীদের ভূগোল পড়াচ্ছিলাম। কিন্তু আজকে জানতে পারলাম, এটা এক ধরনের নির্বুদ্ধিতা। এখন থেকে আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলাম, আমি নারীদেরকে আর ভূগোল পড়াব না। আমার ব্যক্তিগত মতামত হচ্ছে, ইতিহাস ও ভূগোল সম্পর্কে ধারণা নেওয়া রাজা-বাদশাহদের কাজ, সকল পুরুষও উক্ত বিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জন করা অনর্থক।[৩৫৬]

একজন ভদ্রলোক নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে বলছিলেন যে, ইতিহাস ও ভূগোল শিক্ষায় নারীদের কোনো উপকারিতা নেই। বর্তমান যুগের যুবকদের কাছে উলামায়ে কেরামের উক্তি দলিল নয়, কিন্তু এমন লোকদের উক্তি অবশ্যই প্রমাণ হিসেবে গৃহীত, যারা তাদের সমপর্যায়ের এবং অভিজ্ঞতা অর্জনের পর ভিন্ন মতাদর্শ বাস্তবায়নে অপারগ।[৩৫৭]

নারীদের জন্য অপ্রয়োজনীয় ভৌগোলিক ও দুনিয়াবি শিক্ষা অর্জন

পবিত্র কুরআনে নারীদের একটি গুণ বর্ণনা করা হয়েছে, তারা 'বেখবর'। সুতরাং তাদের দুনিয়ার ব্যাপারে উদাসীন হওয়াই উত্তম। আল্লাহ বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَ
الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾

যারা সতী-সাধ্বী, সহজ-সরল ঈমানদার নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারা দুনিয়া ও আখেরাতে অভিশপ্ত; আর তাদের জন্য আছে গুরুতর শাস্তি (সূরা নূর, ২৪ : ২৩)

---

[৩৫৬] *আত-তাবলীগ*, ১৪/১৬।
[৩৫৭] প্রাগুক্ত, ৭/২৭।

উক্ত আয়াতে الْغَفِلٰتِ শব্দের দ্বারা নিন্দনীয় বিষয় থেকে উদাসীন উদ্দেশ্য নয়, কেননা নিন্দনীয় বিষয় থেকে বিরত থাকা তো পুরুষদের জন্যও আবশ্যক। কিন্তু আল্লাহ তাআলা নারীদের প্রশংসায় উক্ত কথা বর্ণনা করেছেন, পুরুষদের আলোচনায় এমন শব্দ ব্যবহার করেননি। এ বর্ণনাশৈলী দ্বারা আমি বুঝতে পারছি যে, দুনিয়া বিষয়ে নারীদের উদাসীন হওয়াই উচিত। তাদের জন্য দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যকার মন্দ বিষয় সম্পর্কে বেখবর থাকাই বাঞ্ছনীয়। নারীদের জন্য এটাই উচিত ও নিরাপদ।

যখন থেকেই নারীদের মাঝে দুনিয়ার বাতাস লাগা আরম্ভ হয়েছে, তখন থেকেই তাদের থেকে নিরাপত্তা ও উত্তম চরিত্র বিদায় নিয়েছে। উদাসীন থাকার উদ্দেশ্য হচ্ছে, তারা চতুর হবে না এবং ধোঁকাবাজি ও প্রতারণা থেকে বেঁচে থাকবে। নারীদের জন্য নিজের ঘর-বাড়ি ও স্বীয় স্বামী ব্যতীত দুনিয়ার সমস্ত বিষয় থেকে উদাসীন থাকাই সফলতা। আর এ গুণাবলি নারীদের মাঝে স্বভাবগতভাবেই থাকে। কিন্তু বিভিন্ন পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে তা পরিবর্তন হয়ে যায়।[৩৫৮]

অপ্রয়োজনীয় বই-পুস্তক পাঠ করা

কতিপয় লোক নারীদেরকে নভেল, উপন্যাস ও অশ্লীল পত্র-পত্রিকা পড়তে দেয় বা পড়ার অনুমতি দিয়ে থাকে। এগুলোর কারণে তাদের লজ্জাহীনতা দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা চিন্তাশীল লোকদের কাছে গোপন নয়।[৩৫৯] নারীদের সুশিক্ষা দিতে হলে সর্বপ্রথম নাটক-নভেলজাতীয় বই-পুস্তক ঘর থেকে দূরে সরাতে হবে। এ ধরনের নাটক-নভেলের কারণে অনেক উত্তম গৃহেও বিভিন্ন ধরনের দুর্ঘটনা সৃষ্টি হয়ে থাকে।[৩৬০]

বর্তমানে নারীরাই বিভিন্ন ধরনের নাটক, নভেল বা মুজেযা আলে নবী (একটি কিতাবের নাম) ক্রয় করে নেয়। আল্লাহ তাআলাই জানেন, এটা কে লিখেছে। উক্ত কিতাবে হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুকে লক্ষ্য করে অপমানমূলক কথা বলা হয়েছে। অথচ নারীরা কিতাবটি অত্যন্ত আগ্রহের

---

[৩৫৮] প্রাগুক্ত, ২১/৮২।
[৩৫৯] প্রাগুক্ত, ১৪/১৩।
[৩৬০] প্রাগুক্ত, ২১/৮২।

সাথে পড়তে থাকে। এমনকি তা পড়াকে সওয়াব প্রাপ্তির কারণ মনে করে। তদ্রূপ বুযুর্গদের গল্প-কাহিনিসহ বিভিন্ন ধরনের কিতাব এখন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। যেমন : 'ছাপননামা' 'বক্ষের মুজেযা'। চল্লিশ গল্পের একটি পুস্তিকা ছাপানো হয়েছে, যার মাঝে অনর্থক আলোচনা স্থান পেয়েছে। এমনকি উক্ত ঘটনাবলি সম্পর্কে এটাও লিখে দেওয়া হয়েছে যে, কেউ যদি উক্ত কিচ্ছা-কাহিনি পড়ে তাহলে তার ওপর জাহান্নাম হারাম হয়ে যাবে![৩৬১] নারীদের ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া ছাড়া ভূগোল ও দর্শন শাস্ত্র শিক্ষা দেওয়া উচিত নয়। আর নাটক-নভেল নারীদেরকে শিক্ষা দেওয়া ধ্বংসাত্মক বিষতুল্য। এ ধরনের শিক্ষা নারীর জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। এ শিক্ষায় নারীদের আবরু-ইজ্জত বিলীন হয়ে যাচ্ছে।[৩৬২]

এখন আফসোসের কথা হচ্ছে, নারীরাই বর্তমানে এমন ধরনের নাটক-নভেল পড়ার অভ্যাস করছে, যার দ্বারা তাদের চরিত্র একেবারেই শেষ হয়ে যাচ্ছে। উক্ত নাটক-নভেলের কারণে কোনো কোনো সম্ভ্রান্ত পরিবারে লজ্জাজনক ঘটনা ঘটছে। তা সত্ত্বেও বুদ্ধিজীবীদের হৃদয়ের চক্ষু খোলেনি। আমি বলতে চাই, উক্ত নাটক-নভেলের চেয়ে অতীতকালের গল্প-কাহিনি ভালো। যদিও সেগুলো দেখলেও আমি পড়তে নিষেধ করি। কিন্তু আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, চরিত্র নষ্টকারী নাটক-নভেল পড়ার চেয়ে পুরোনো দিনের গল্পগুচ্ছ হাজার গুণে উত্তম। এগুলোর দ্বারা চরিত্র নষ্ট হয় না। পুরোনো দিনের গল্পগুচ্ছের মাঝে যদিও বানোয়াট কল্প-কাহিনি রয়েছে, কিন্তু সেগুলো নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করা এবং সে উদ্দেশ্য লালন করা অসম্ভব।

দৃষ্টান্ত : এক রাজপুত্র একটি বাগানে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করল, কিন্তু সেখানে যাওয়ার উপায় তার জানা ছিল না। পথিমধ্যে জনৈক দৈত্যের সাথে তার সাক্ষাৎ হলে তার সাথে মামা-ভাগিনার সম্পর্ক তৈরি করল। তার প্রতি দৈত্যের দয়া হলে সে তাকে উক্ত বাগানে পৌঁছে দিল। এ ধরনের বিভিন্ন ঘটনা রয়েছে যা মানবীয় ক্ষমতা-বহির্ভূত। আল্লাহ তাআলা চাইলে তা মানুষের জন্য বাস্তবায়ন সহজ হয়ে যাবে।

---

[৩৬১] *হুক্কুক যাওজাইন*, ২১।
[৩৬২] প্রাগুক্ত, ২১।

অপরদিকে নাটক-নভেল লেখকরা এমন সব সহজসাধ্য বিষয় লিখে থাকে, যা প্রতিটি মানুষের জন্য বাস্তবায়ন করা সম্ভব। উদাহরণত এক প্রেমিক পুরুষ কোনো জোলা অথবা নাপিতকে লোভ দিল যে, আমি তোমাকে এত টাকা পুরস্কার দেব, যদি তুমি আমাকে অমুক মেয়ের সাথে দেখা করার সুযোগ করে দিতে পারো। এ পদ্ধতি বাস্তবায়ন করা এমন সহজ বিষয়, যার কাছে অর্থ-কড়ি রয়েছে সে সহজেই কাঙ্ক্ষিত বিষয় অর্জন করতে চেষ্টা চালাবে।

যে সমস্ত নারীদের লাজ-লজ্জা, দ্বীনি বুঝ ও মান-সম্মান নেই, তারা আর্থিকভাবে সহযোগিতা পেলেই এ ধরনের নিম্ন কাজ করতে পিছপা হয় না। এ ধরনের নারীদের মাধ্যমে পরিবারে যে-কোনো ধরনের অপকর্ম সম্পাদন করা আশ্চর্যজনক নয়। এ জন্য আমি নভেল-নাটককে পুরোনো দিনের গল্প-কাহিনি থেকে বেশি ক্ষতিকর মনে করি। আল্লাহর ওয়াস্তে নিজ গৃহের নারীদেরকে এ ধরনের খারাপ বই-পুস্তক থেকে রক্ষা করুন এবং নভেল-নাটকের বই নিজেদের ঘরে ঢুকতে দেবেন না। যদি কখনো ঘরে এ ধরনের বই দেখতে পান ,তাহলে তৎক্ষণাৎ তা জ্বালিয়ে দিন। এগুলো খুবই ক্ষতিকর। এগুলো পাঠ করলে নারীদের লজ্জা-শরম বিলীন হয়ে যায়।[৩৬৩]

নারীদের কবিতা আবৃত্তি শিক্ষা

কতিপয় নারীকে কবিতা বা নাশিদের কিতাবাদি খোঁজার প্রতি উৎসাহী দেখা যায়। অথচ কোনো কোনো নাশিদ বা কবিতায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং আল্লাহ তাআলার প্রতি বেয়াদবিমূলক বাক্য ব্যবহৃত হয়। এ ধরনের কিতাবাদির অনেক কবিতা-নাশিদ শরীয়ত-বিবর্জিত হিসেবে বিবেচিত হয়, যেগুলো পাঠ করা জায়েজ নেই।[৩৬৪]

কিছু কিছু স্থানে দেখা যায় নারীদেরকে নাশিদ ও কবিতা মুখস্থ করানো হচ্ছে। কবিতা-নাশিদ পড়া নারীদের জন্য ঠিক নয়; বরং ফেতনা সৃষ্টির নামান্তর। বেগানা নারী এবং কিশোর-যুবকদের হামদ-নাত শ্রবণ করাও

---

[৩৬৩] *আল কামাল ফিদ দ্বীন*, ৩১, ১০১।
[৩৬৪] *আত-তাবলীগ*, ৭/৮২।

এক ধরনের মন্দ কাজ। এমনকি কোনো বালকের আওয়াজ শোনার দ্বারা যদি মনের মধ্যে কুধারণা সৃষ্টি হয়, তাহলে এ ধরনের বালক থেকে কুরআন তিলাওয়াত শ্রবণও জায়েজ নেই।[৩৬৫]

নারীদের হাতের লেখা ও ড্রয়িং শিক্ষা

মেয়েদের লেখা শেখানো ওয়াজিব বা হারাম কিছু নয়। এটাকে নারীর অবস্থা বুঝে নির্বাচন করা উচিত। যে নারীর মাঝে নির্লজ্জতা নেই; বরং লজ্জা-শরমে পরিপূর্ণ, তাকে লেখা শেখানোতে কোনো সমস্যা নেই। বরং প্রয়োজনের তাগিদে তাকে লেখা শেখানো আবশ্যক। পক্ষান্তরে যাদের মাঝে নির্লজ্জতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার আশঙ্কা রয়েছে, তাদেরকে শেখানোর দরকার নেই। কেননা উপকার অর্জনের চেয়ে ক্ষতি থেকে বেঁচে থাকা অপরিহার্য। এহেন পরিস্থিতিতে তাদেরকে লেখা শেখাবেন না এবং শিখতেও দেবেন না। যারা নারীর জন্য লেখা শেখার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে মতবিরোধ করেন, তাদের সিদ্ধান্ত এটাই।[৩৬৬]

সতর্কতা অবলম্বন জরুরি

নারীদের হাতের লেখা শেখানোর পর খুবই সতর্ক থাকা জরুরি। উদাহরণত কোনো নারী যেন সুন্দর হস্তলিপীতে পারদর্শী কোনো নারীর মাধ্যমে নিজের স্বামীর কাছে চিঠিপত্র না লেখায়। কেননা অনেক মানুষ লিখিত বিষয়ের মাধ্যমে লেখিকা নারীর স্বভাব-চরিত্র বুঝে নিতে পারে। ফলশ্রুতিতে লেখিকার প্রতি পরপুরুষের আকৃষ্টতা তৈরি হতে পারে। যখন পুরুষরা সফর থেকে ফিরে আসে তখন পত্র লেখকের জন্যও উপহার-উপঢৌকন নিয়ে আসে। এভাবেই ক্রমে ক্রমে সম্পর্ক সৃষ্টি হতে হতে সমস্যার সম্মুখীন হয়ে যায়।

নারীদেরকে এ ব্যাপারে সতর্ক করতে হবে যে, নারীরা যে চিঠিই লেখুক না কেন, লিখিত চিঠি ঘরের মাহরাম পুরুষদের দেখাতে হবে। যাতে

---

[৩৬৫] *দাওয়াত ও আবদিয়্যাত*, ১/১৪৯।
[৩৬৬] প্রাগুক্ত, ৯/ ১২৬।

তাদের হৃদয়ে কোনো ধরনের সন্দেহের দানা বাঁধতে না পারে। এমনকি সতর্কতা অবলম্বনের জন্যে চিঠির খামের ওপর প্রাপকের ঠিকানা নারীরা নিজে না লিখে কোনো পুরুষের মাধ্যমে লেখাবে। কোনো ধরনের বিপদের সম্মুখীন হওয়া থেকে বেঁচে থাকার লক্ষ্যে এটা অত্যন্ত কার্যকর।[৩৬৭]

নারীদের লেখা শিক্ষায় বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ি

বর্তমানে কিছু লোক নারীদের জন্য লেখালিখিকে একেবারেই হারাম মনে করে। এটা বাড়াবাড়ি। অন্যরা লেখালিখিকে এতটাই জায়েজ মনে করেন যে, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নারীদের প্রবন্ধ প্রকাশ করে থাকেন, যে প্রবন্ধে লেখিকার নাম-ঠিকানা উল্লেখ করে দেন। উভয়টি বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়িমুক্ত নয়। সুতরাং উভয় প্রকার বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ি থেকে বেঁচে থেকে নারীদের লেখা শেখানোর অনুমতি দেওয়া যেতে পারে।[৩৬৮]

আবু দাউদ শরীফে হযরত হাফসা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে হস্তলিপি শেখানোর ব্যাপারে অনুমতি বর্ণিত রয়েছে।[৩৬৯] উভয় মতামতের পক্ষে সমন্বয় করতে হলে এটাই বলা উচিত যে, ফিতনার ভয়ে হস্তলিপি শেখার নিষেধাজ্ঞা রয়েছে আর ফিতনা থেকে দূরে থাকার শর্তে শেখার অনুমতি দিয়েছে।[৩৭০]

স্বাধীনচেতা নারীদের দ্বারা নারীশিক্ষার ব্যবস্থা

বেপর্দা স্বাধীনভাবে রাস্তা-ঘাটে চলাচলকারিণীদের মাধ্যমে ঘরের নারীদের শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। বিশেষত শহর অঞ্চলে প্রচলিত রয়েছে যে, ঘরের নারীদের শিক্ষার জন্য আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মেম সাহেব নিয়োগ দেওয়া হয়। এ পদ্ধতি বন্ধ করতে হবে। আমি কানপুরে অবস্থানকালে মাঝে মাঝেই শুনতে পেতাম, আজকাল অমুক

---

[৩৬৭] *আত-তাবলীগ*, ১৪/২৩৩।
[৩৬৮] প্রাগুক্ত, ১৪/২৩৩।
[৩৬৯] *আবু দাউদ*, হাদীস নং ৩৮৮৭; *মুসনাদে আহমাদ*, হাদীস নং ২৭০৯৫।
[৩৭০] *ইমদাদুল ফাতওয়া*, ৪/৩১৯।

মহিলা পলায়ন করেছে, গতকাল অমুকের কন্যা হারিয়ে গিয়েছে। এর অন্যতম কারণ এটাই ছিল, নারীদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য মেম সাহেবরা গৃহে আসতে আরম্ভ করেছিল। সুতরাং এ পদ্ধতি থেকে অবশ্যই বেঁচে থাকতে হবে।[৩৭১]

বর্তমানে পুরুষরা নিজের অধীনস্ত নারীদেরকে নির্লজ্জ বেহায়া মেম সাহেবদের দ্বারা শিক্ষা দিচ্ছে। অভিজ্ঞতার আলোকে বলা যায়, যার সংস্পর্শে মানুষ বেড়ে ওঠে, তার চারিত্রিক প্রভাব অধীনস্তদের মাঝে প্রভাব সৃষ্টি করে। বিশেষত যখন অনুসরণীয় ব্যক্তি সম্মানিত ও অনুকরণীয় হয়ে থাকে। বাস্তবতার আলোকে এ কথা স্বীকৃত যে, শিক্ষকের চেয়ে বেশি অনুকরণীয় আর কেউ নয়। সুতরাং শিক্ষকের মাঝে বিদ্যমান নির্লজ্জতা ও বেহায়াপনা তার শিক্ষার্থীর মাঝে অবশ্যই প্রভাব ফেলবে।

আমার মতে লাজুকতা নারীর সবচেয়ে বড় গুণ এবং এটাই সমস্ত কল্যাণের চাবিকাঠি। লজ্জাশীলতা না থাকলে কোনো নারী থেকেই কল্যাণের আশা করা যায় না এবং অকল্যাণ দূরীভূত হয় না। বর্ণিত আছে, যখন তোমার থেকে লজ্জা বিদায় নেবে তখন তোমার যা মন চায় করতে পারবে। কথাটি ব্যাপক। কিন্তু আমার মতে এই কথার ব্যাপকতা পুরুষের তুলনায় নারীদের জন্য বেশি প্রযোজ্য। কেননা পুরুষের তুলনায় নারীদের জ্ঞানের পরিধি সীমিত। এমনইভাবে শিক্ষিকা যদি এমন নাও হয়, কিন্তু সহপাঠী এ ধরনের গুণাবলি-সংবলিত হয়ে থাকে, তাহলেও বর্ণিত ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে।[৩৭২]

বালিকা বিদ্যালয় সম্পর্কে অভিমত

এক। বর্তমানে প্রচলিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মাঝে একটি হচ্ছে বালিকা বিদ্যালয়। যে প্রতিষ্ঠানে সাধারণ মাদরাসার মতো ভিন্ন ভিন্ন মতাদর্শের বিভিন্ন শ্রেণির বালিকারা একত্রিত হচ্ছে। সেখানকার শিক্ষিকাগণ মুসলিম হয়েও পালকিতে চড়ে বিদ্যালয়ে আসছে এবং প্রতিষ্ঠানে পর্যাপ্ত পর্দার

---

[৩৭১] *হুকুকুয যাওজাইন*, ৩২।
[৩৭২] *ইসলাহে ইনকিলাব*, ২৭১।

ব্যবস্থা থাকলেও বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহ ও অভিজ্ঞতার আলোকে জানা যায় যে, এ ধরনের প্রতিষ্ঠান সমবেত নারীদের মাঝে বদস্বভাব বিস্তারে বড়ই প্রভাব বিস্তার করে। তা ছাড়া যদি স্বাধীনচেতা এবং নির্লজ্জ কোনো শিক্ষিকা এ ধরনের প্রতিষ্ঠানে সংযুক্ত থাকে, তাহলে শিক্ষার্থীদের মাঝে অবক্ষয় ছড়িয়ে পড়বে।

দুই। কোথাও যদি কোনো মিশনারি মেম সাহেব দৈনন্দিন বা সপ্তাহান্তে দেখভাল করে অথবা কোনো কারিগরী বিদ্যা শেখানোর ছলে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের মাঝে ঢুকে পড়ে তাহলে ঈমান ও নীতি-নৈতিকতা উভয়টি ধ্বংসের আশঙ্কা রয়েছে।[৩৭৩]

বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষার ক্ষতি

বর্তমানে প্রচলিত বালিকা বিদ্যালয়ের মাধ্যমে নারীশিক্ষার ব্যবস্থা জীবননাশক বিষের মতো। আমি বালিকা বিদ্যালয়কে ব্যাক্তিগতভাবে পছন্দ করি না, যদিও তা কোনো আলেমের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। অভিজ্ঞতার আলোকে বলছি, কোনো অবস্থাতেই আপনারা এ ধরনের শিক্ষাপদ্ধতি চালু করবেন না। আমার কথা মান্য না করলে ভবিষ্যতে অবশ্যই আফসোস করবেন। বালিকা বিদ্যালয় ও মহিলা মাদরাসার প্রচলিত পদ্ধতি পরিত্যাগ করুন। নারীদেরকে ঘরে রেখেই শিক্ষিত করুন। যদি সম্ভব হয় তাহলে আরবী ভাষায় শিক্ষা দিন, নতুবা উর্দুতেই (মাতৃভাষায়) শিক্ষিত করে তুলুন। 'হুকুকুল বাইত' নামক আমার একটি ওয়ায আছে, যা পুস্তিকা আকারে ছাপানো হয়েছে। উক্ত ওয়াজের শেষাংশে উপরোক্ত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। আলোচনাটি প্রত্যেকের পড়া উচিত।[৩৭৪]

সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোকেরা কখনোই নারীদেরকে বালিকা বিদ্যালয়ে পাঠানো পছন্দ করে না। শহর-উপশহরে নারীরা সাধারণত শিক্ষিত হয়ে থাকে, কিন্তু সবাই নিজেদের গৃহে শিক্ষিত হয়েছে। মাদরাসায় কখনো

---

[৩৭৩] প্রাগুক্ত, ২৭১।
[৩৭৪] *ইসলাহে ইনকিলাব*, ২৭১।

শিক্ষা অর্জন করেনি। নিজেদের ঘরে শিক্ষা অর্জনের দ্বারা নারীদের কোনো ক্ষতি হয় না। কেননা শিক্ষাদানকারীরা ভালো ও পর্দানশীন হয়ে থাকে এবং নারীরাও পর্দার মাঝে থেকেই শিক্ষা লাভ করে। কিন্তু অভিজ্ঞতার আলোকে বলতে হচ্ছে, বর্তমান প্রচলিত বালিকা বিদ্যালয়ে অনেক ক্ষতিকর দিক রয়েছে।

এখন প্রশ্ন হলো, ক্ষতিকর দিকগুলো কেন তৈরি হয়? কোনো কোনো ভাই বলে থাকেন যে, স্কুলের শিক্ষার্থীদেরকে পর্দা রক্ষার সাথে বিশেষ পদ্ধতিতে তৈরি গাড়িতে আনা-নেওয়া করা হয় এবং শিক্ষালয়েও পর্দার গুরুত্বারোপ করা হয়, তাহলে কোন ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে?

আমি বলব, এর সুনিশ্চিত কারণ আমার জানা নেই। কিন্তু অভিজ্ঞতার আলোকে বলতে চাই, বিদ্যালয়ের শিক্ষা নারীদের জন্য বড়ই ক্ষতিকর। কেননা এ ধরনের শিক্ষালয় থেকে শিক্ষার্থীরা স্বাধীনচেতা মনোভাব, নির্লজ্জতা ও পর্দাহীনতার মতো ভয়াবহ দীক্ষা অর্জন করে থাকে। অথচ একজন নারীর সবচেয়ে বড় গুণাবলি হচ্ছে লাজুকতা। আর লাজুকতাই হচ্ছে সকল সফলতার চাবিকাঠি। যদি কারও থেকে লাজ-লজ্জা বিলুপ্ত হয়ে যায় তাহলে উক্ত ব্যক্তি হতে কোনো কল্যাণের আশা করা যায় না এবং কোনো ক্ষতি থেকে তাকে রক্ষাও করা যায় না। প্রবাদ আছে, যখন তোমার থেকে লজ্জা বিদায় নেবে, তখন তোমার যা মন চায় করতে পারবে।[৩৭৫]

এটা কোনো ফাতওয়া নয়, বরং আমার নিজস্ব অভিমত

এটা কোনোভাবেই আমার বুঝে আসে না যে, ছেলেদের প্রচলিত মকতবের মতো কীভাবে মেয়েদের মকতব চালু করা হচ্ছে? কেননা এ ক্ষেত্রে এত ভয়ানক ঘটনা ঘটছে যে, উক্ত ঘটনাগুলো আমার অন্তরে এই বিশ্বাস জন্ম দিয়েছে যে, এ ধরনের মকতবের অবস্থা সন্তোষজনক নয়। উক্ত বিষয়টি পরিক্ষিত হয়ে যাওয়ার দরুন তার কারণসমূহ বর্ণনা করা

---

[৩৭৫] *হুকুকুল বাইত*, ৩২।

প্রয়োজন মনে করছি না। কিন্তু উপরোক্ত বর্ণনাটি আমার একান্ত ব্যক্তিগত মতামত, আমি উক্ত বিষয়ে ফাতওয়া দিচ্ছি না। যদি অভিজ্ঞতার আলোকে ক্ষতিকর বিষয় থেকে মুক্ত থাকে, তাহলে তার ওপর আমল করা যাবে। সারকথা হচ্ছে, যেভাবেই হোক নারীদেরকে আধুনিক শিক্ষা ছেড়ে ধর্মীয় শিক্ষায় অবশ্যই শিক্ষিত করতে হবে।[৩৭৬]

বালিকা বিদ্যালয়ে অনিষ্টের মূল কারণ

আসলে নারীশিক্ষার বিষয়টি খুবই মুশকিল। আমরা লক্ষ করলে দেখতে পাই, যেখানে বালিকা বিদ্যালয় বিদ্যমান, সেখানে কোনো না কোনো সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। কোথাও চক্ষুলজ্জা বিলুপ্ত হয়েছে। কোথাও নির্লজ্জতা ছড়িয়ে পড়েছে। এ ধরনের নানা দুষ্কৃতি ছড়িয়ে পড়েছে। ফলে বিজ্ঞজনদের বিপুলসংখ্যক সদস্য নারীশিক্ষার চলমান পদ্ধতির সাথে মতবিরোধ করছে। যদিও এটা তাদের ভুল সিদ্ধান্ত। কেননা এখানে মূলত শিক্ষার ত্রুটি নয়; বরং দায়িত্বশীলতা ও নিয়ম-শৃঙ্খলার ত্রুটি রয়েছে।

বালিকা বিদ্যালয়সমূহেও ফেতনা-ফ্যাসাদের মৌলিক কারণ হচ্ছে নারী-পুরুষের অবাধ বিচরণ। ভর্তি পরীক্ষাসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে স্কুলের সাধারণ সম্পাদকসহ অন্যান্য পুরুষ পরীক্ষকগণের সামনে প্রাপ্তবয়স্কা নারীদের পর্দাহীন চলাফেরার দ্বারা তাদের হৃদয়ের লাজুকতা নষ্ট হয়ে যায়। চোখের পর্দা নষ্ট হয়ে যায়। উক্ত বিষয়গুলো খুবই সমস্যা সৃষ্টি করে। সেক্রেটারি সাহেবের উচিত এ জাতীয় কর্মকাণ্ড থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, বর্তমানে এ ধরনের বালিকা বিদ্যালয়গুলো এমন সব লোকদের দ্বারা পরিচালিত, যারা দ্বীনের জ্ঞানের সম্পর্কে ন্যূনতম ধারণা রাখে না। এ কারণেই তাদের শিক্ষাপদ্ধতি প্রশংসনীয় নয় এবং পাঠ্যক্রমেও ত্রুটি রয়েছে। প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারি বা পরিচালক যদি দ্বীনদার, মুত্তাকী ও পরহেজগার হয়, তাহলে শিক্ষিকাগণ তার থেকে ভীতসন্ত্রস্ত থাকে। তখন আশা করা যায় বিভিন্ন ধরনের অনিষ্ট থেকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নিরাপদে থাকবে।[৩৭৭]

---

[৩৭৬] *আল আ-কিলাতুল গা-ফিলাত*, ৩২৪।
[৩৭৭] *ইসলাহুল ইয়াতামা*, ৪০৪ ।

নারীদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের শর্ত ও উত্তম পদ্ধতি

আমি নিজেও থানাভবনে নারীদের জন্য একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম। নারীরা একজন নারী শিক্ষিকার গৃহে একত্রিত হতো। উক্ত ঘরটিই কেমন যেন নারী শিক্ষালয়। আমি ওই মহিলা শিক্ষিকাকে (অর্থ-কড়ি দিয়ে) খেদমত করতাম। তা সত্ত্বেও আমি এতটুকু সতর্কতা অবলম্বন করতাম যে, আমি কাউকে নারী শিক্ষার্থী প্রেরণের উৎসাহ দিতাম না। আমি ওই মহিলা শিক্ষিকাকে বলে দিয়েছিলাম যে, এগুলো সব আপনার জিম্মাদারি। আপনি যত নারী ডেকে আনতে পারবেন আপনার বেতন ততই বেশি হবে।

উক্ত মাদরাসায় 'মাসিক' পরীক্ষা চালু ছিল। কখনো নারী শিক্ষার্থীরা পরীক্ষা দেওয়ার জন্য ঘরে চলে আসত। আমার পরিবারস্থ কোনো নারী তাদের পরীক্ষা নিয়ে নিত। আমি নিজে কখনো পরীক্ষা নিতাম না। আবার কখনো পরীক্ষার্থীদেরকে ডাকা হতো না, বরং স্বয়ং পরীক্ষক তাদের ঘরে গিয়ে পরীক্ষা নিয়ে আসতেন। আমার সামনে শুধু পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হতো। তা ছাড়া মাদরাসা-সংক্রান্ত কোনো বিষয়ে আমার হস্তক্ষেপ ছিল না। পরীক্ষকগণ পরীক্ষায় নম্বর দিতেন আর আমি কৃতী শিক্ষার্থীদেরকে পুরস্কার প্রদান করতাম।

আলহামদুলিল্লাহ! উক্ত পদ্ধতিতে মাদরাসার কার্যক্রম চালু ছিল। কোনো ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হয়নি। মোটকথা নারীদের শিক্ষা গ্রহণের পদ্ধতি প্রাতিষ্ঠানিকভাবেও হতে পারে অথবা এমন পদ্ধতিতে হতে পারে যে, নারীরা প্রত্যেকে নিজেদের ঘরের মাহরাম পুরুষদের নিকট পড়ে নেবে। অথবা পাড়া-মহল্লায় শিক্ষিত নারীদের থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে। কিন্তু বর্তমানে এ ধরনের ব্যবস্থা খুবই কষ্টকর। অথবা এটা হতে পারে যে, নির্ধারিত স্থানে শিক্ষার্থীরা একত্রিত হবে আর পুরুষগণ নিজেদের বিবিদের মাধ্যমে খোঁজ-খবর নেবে। কিন্তু সতর্কতাবশত কোনো নারীর সাথে নিজে কথা বলবে না।

দ্বিতীয় আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, মাদরাসার সেক্রেটারি বা মুতাওয়াল্লী বা পরিচালক অবশ্যই খোদাভীরু হতে হবে। যদিও সে স্বাধীনচেতা হোক না কেন, কিন্তু অবশ্যই আলেমদের সুরত ধারণ করতে

হবে। যাতে শিক্ষিকাগণের মাঝে তার বাহ্যিক আকৃতির প্রভাব বিস্তার লাভ করে। আমার মেজাজ অনুযায়ী মহিলাদের শিক্ষা দেওয়ার কিছু পদ্ধতি তুলে ধরলাম। ভবিষ্যতে অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ আরও চতুরতার সাথে নিজেদের দায়িত্ব আঞ্জাম দেবেন। আমার দৃষ্টিভঙ্গি কারও জন্য অনুসরণ করা জরুরি নয়।[৩৭৮]

কন্যাসন্তানের শিক্ষা-পদ্ধতি

১। নারীদের জন্য পূর্বপ্রচলিত পদ্ধতি তথা দু-চারজন কন্যাসন্তান মিলেমিশে মহল্লার নির্ধারিত কোনো গৃহে একত্রিত হয়ে শিক্ষা গ্রহণ করাই নিরাপদ পন্থা। বিনা পারিশ্রমিকে যদি কোনো শিক্ষিকা পাওয়া যায়, তাহলে সেটাই ছিল অধিক বরকতময় ও উপকারী। প্রয়োজনে পারিশ্রমিক দিয়ে শিক্ষা গ্রহণ করাতে কোনো সমস্যা নেই। যদি কোথাও নারী শিক্ষিকার অভাব থাকে, তাহলে মাহরাম পুরুষের মাধ্যমে শিক্ষা দেবে।[৩৭৯]

২। প্রত্যেক গৃহের দায়িত্বশীল পুরুষ যদি ইলমওয়ালা হয়, তাহলে সে নিজেই নারীদেরকে দ্বীনি ইলম শিখিয়ে দেবে। নতুবা যদি নারীদের মধ্যে কেউ শিক্ষিত থাকে, সে পড়াবে। অন্যথায় অন্য কোনো নারী শিক্ষিকার মাধ্যমে তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।[৩৮০]

বিবাহিতা নারীদের শিক্ষা-পদ্ধতি

সবচেয়ে উত্তম ও সহজ পদ্ধতি হচ্ছে, স্বয়ং স্বামী দ্বীনের শিক্ষা গ্রহণ করে নিজ বিবিকে শিখিয়ে দেবে। আর যদি নিজেরা পড়তে সক্ষম না হয়, তাহলে উলামায়ে কেরাম থেকে মাসআলা-মাসায়েল শিখে ঘরের নারীদের শিক্ষা দেবে। আল্লাহ তাআলা দ্বীনের বিষয়াদিকে কতই-না সহজ করেছেন, শুধুমাত্র একে অন্যকে শ্রবণ করানোর মাধ্যমেও দ্বীনের শিক্ষা অর্জনের সুযোগ রেখেছেন। উপরোক্ত পদ্ধতি সম্ভব না হলে কমপক্ষে এ

---

[৩৭৮] *ইসলাহুল ইয়াতামা*, ৪০১, ৪০৪।
[৩৭৯] *ইসলাহে ইনকিলাব*, ২৭২।
[৩৮০] *হুকুকুয যাওজাইন*, ৩২৫।

পদ্ধতি অবলম্বন করুন যে, উর্দু ভাষায় (মাতৃভাষায়) রচিত শরয়ী বিধি-বিধানসংক্রান্ত কিতাবাদিগুলো একটি নির্ধারিত সময়ে গৃহের মহিলাদের শোনানোর ব্যবস্থা করুন। কিন্তু কোন কিতাবটি তালীম করাবেন তা উলামায়ে কেরাম থেকে নির্ধারণ করে নেবেন। এটাও যদি সম্ভব না হয়, তাহলে উলামায়ে কেরাম থেকে মৌখিকভাবে মাসায়েল শ্রবণ করে নারীদের শিখিয়ে দেবেন।[৩৮১]

মোটকথা নারীদেরকে তাদের দায়িত্বশীল পুরুষরা দ্বীনি জ্ঞান শিখিয়ে দেবে। পরবর্তীতে যখন এক বা একাধিক নারী দ্বীনি জ্ঞানে পারদর্শী হয়ে যাবে, তখন সে বা তারা অন্য নারীদেরকে শিক্ষিত করে তুলবে।[৩৮২]

অশিক্ষিত নারীদের দ্বীনি শিক্ষার পদ্ধতি

যে সমস্ত নারী লেখাপড়া জানে না, তাদেরকে প্রতিদিন দু-চারটি জরুরি মাসায়েল বলে দেবেন। আকিদা, ওয়ায-নসীহত এবং বুযুর্গদের ঘটনাবলির কোনো পুস্তক-পুস্তিকা তাদেরকে শুনিয়ে দেবেন। লেখাপড়া না পারা সত্ত্বেও কিছুদিন পড়ে দ্বীনি জ্ঞানে পারদর্শিতা অর্জন করবে ইনশাআল্লাহ।[৩৮৩]

গৃহিণীরা দ্বীনি বিষয়াদি শ্রবণে অনাগ্রহী হলে

নিজের গৃহে দ্বীনি কিতাবাদি পাঠ করে শোনানোর ব্যবস্থা করতে হবে। বেশি না পারলেও পনেরো-বিশ মিনিট পর্যন্ত হলেও শোনাতে হবে। কিন্তু কিতাব পাঠ করার সময় এটা লক্ষ রাখার দরকার নেই যে, কে শুনছে আর কে শুনছে না। কে আগ্রহী আর কে অনাগ্রহী। কেউ শ্রুত বিষয়ের ওপর আমল করুক বা না করুক, পাঠকারীর উচিত কিতাব পড়ার ধারাবাহিকতা ঠিক রাখা। প্রতিদিন নিজ গৃহে পাঠ করার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। কেউ বিরক্ত হলেও পড়া থেকে উঠে যাবে না।

---

[৩৮১] *আত-তাবলীগ*, ১৪/ ২২৭।
[৩৮২] প্রাগুক্ত, ২১/১৬৬।
[৩৮৩] *আত-তাবলীগ তাওয়াসি বিল হক*, ১৬/৩২।

অভিজ্ঞতার আলোকে অনেকেই বলেছেন যে, শুনতে শুনতেই সংশোধন হয়ে গেছে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাম মুবারক কি টক তেতুলের চেয়ে কার্যকরী নয়? সামান্য টকজাতীয় একটি ফল মুখের ভেতর প্রভাব বিস্তার করে মুখে লালা বের করে। তাহলে আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাম কতই-না প্রভাব বিস্তার করবে![৩৮৪]

পুরুষ দ্বারা নারীকে দ্বীনি শিক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে জরুরি দিক-নির্দেশনা

যদি গৃহের দায়িত্বশীল পুরুষ নারীদেরকে ধর্মীয় বিধি-বিধান শিক্ষা দেয়, তার উচিত হচ্ছে, লজ্জাকর মাসায়েলগুলো নিজে না পড়িয়ে নিজ স্ত্রী দ্বারা শেখানোর ব্যবস্থা করবে। যদি এটা সম্ভব না হয় তাহলে উক্ত মাসায়েলগুলো চিহ্নিত করে রাখবে, যাতে প্রাপ্তবয়স্ক হলে নারী নিজে নিজেই বুঝে নিতে পারে। অথবা স্বীয় স্বামী যদি দ্বীনি বিষয়ে জ্ঞানবান হয়, তার থেকে জেনে নেবে; নতুবা স্বামীর মাধ্যমে কোনো আলেম থেকে জেনে নেবে।[৩৮৫]

নারীদেরকে বেহেশতী জেওর শেখানোর পদ্ধতি ও জরুরি দিক-নির্দেশনা

১। নারীদেরকে নিয়মতান্ত্রিকতার সাথে পড়াতে হবে। নারীদেরকে এমন কিতাব পড়াতে হবে যেগুলোতে নারী-সংক্রান্ত দ্বীনি গুরুত্বপূর্ণ মাসায়েল উল্লেখ রয়েছে। তাদের কাছে কিতাব দিয়েই সটকে পড়া যাবে না, বরং অল্প অল্প করে পড়াতে হবে।

২। অধিকাংশ নারী স্বল্প মেধাসম্পন্ন হয়ে থাকে। তারা নিজে নিজে কিতাব পাঠ করলে কোনো কোনো মাসআলার উদ্দেশ্য বুঝতে পারবে না অথবা কোনো কোনো বিষয়ে আংশিক বুঝতে পারবে। এ জন্য সহজ পদ্ধতি হলো, সমস্ত মহিলাদের নির্ধারিত একটি সময়ে নির্দিষ্ট ঘরে একত্রিত করে

---

[৩৮৪] *হুকুকুয যাওজাইন*, ৩৩১।
[৩৮৫] *ইসলাহে ইনকিলাব*, ২৭২।

কোনো মাহরাম পুরুষ কিতাব পড়ে বুঝিয়ে দেবে। যদি নারীরা পড়তে অক্ষম হয় তাহলে পড়ে শুনিয়ে দেবে। শুধু শুনিয়ে দিলেই হবে না, বরং শিক্ষা দেওয়ার বিষয়টি খেয়াল রাখবে। যাতে শুধু পৃষ্ঠা উল্টিয়ে কিতাব শেষ করার প্রবণতা না থাকে।

৩। যে সমস্ত মাসায়েল তাদেরকে পড়ানো বা শোনানো হবে, সেগুলোর প্রতি আমলের ব্যাপারে খেয়াল রাখবে।

৪। মাসআলা-মাসায়েল পড়ার দ্বারা স্মরণ থাকে না, বরং সে অনুপাতে আমল করার দ্বারা বিষয়টি হৃদয়ে প্রোথিত হয়ে যায়। যদি ঘরের কোনো নারী কিতাবাদি পড়তে পারে, তাহলে তার তত্ত্বাবধানে অন্য নারীরা শিখে নেবে। যখনই যে পদ্ধতি সম্ভব হয়, সে অনুপাতে শিক্ষার ধারাবাহিকতা চালু রাখতে হবে। প্রতিদিন পাঁচ-দশ মিনিট দ্বীনি শিক্ষার পেছনে ব্যয় করলে উদ্দেশ্য অর্জন হবে, ইনশাআল্লাহ।[৩৮৬]

৫। নারীদেরকে দ্বীনি মাসায়েল শিক্ষা দেওয়ার সাথে সাথে এটিও লক্ষ রাখতে হবে যে, তারা যদি মাসআলা-মাসায়েলবিরোধী কোনো কর্ম করে, তাহলে তাদেরকে নিষেধ করতে হবে। বরং যদি কেউ শরীয়তের খেলাপ কোনো কাজ করে, তাহলে কিতাবের লিখিত মাসায়েল পড়িয়ে তাকে সতর্ক করে দিতে হবে। যদি কেউ গীবত করে, তাকে গীবতের ভয়াবহতা সম্পর্কে লিখিত শাস্তি পাঠ করে শুনিয়ে দেবে। এভাবে গুরুত্ব সহকারে আমল করতে পারলে নারীরা অতিসত্বর পূত-পবিত্রতা অর্জনে সক্ষম হবে, ইনশাআল্লাহ।

৬। গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি বিষয় হলো, যে পাঠ্যসূচি নারীদের জন্য নির্ধারণ করা হবে, তা একবার পাঠ করাকেই যথেষ্ট মনে করা যাবে না। নিত্যদিনের অজিফা মনে করে কম করে হলেও কুরআন তিলাওয়াতের মতো দু-চার পৃষ্ঠা করে নিয়মিত পড়বে অথবা শ্রবণ করবে। যদি সারা জীবন এটার জন্য ব্যয় হয়ে যায়, তবুও হিম্মত রাখতে হবে।[৩৮৭]

---

[৩৮৬] *দাওয়াত ও আবদিয়্যাত*, ১৭/৮৮।
[৩৮৭] *আত-তাবলীগ*, ৭/৭১।

নারীরাও পারে লেখিকা হতে

ঘটনাচক্রে একজন নারীর লিখিত একটি কিতাব আমার কাছে পৌঁছলে আমি কিতাবটি পাঠ করে বুঝতে পারলাম কিতাবটি খুবই উপকারী। কিতাবটিতে ক্ষতিকর কোনো আলোচনা আমার দৃষ্টিগোচর হয়নি। কিন্তু কিতাবটির শেষাংশে লেখিকার পূর্ণ নাম ও ঠিকানা লেখা ছিল। আমি দেখে পেরেশান হয়ে পড়লাম এবং চিন্তা করলাম, যদি এ কিতাব সত্যায়ন করি তাহলে লেখিকার নাম-ঠিকানা পুস্তক-পত্রিকায় উল্লেখ করার বিষয়টি আমার থেকে প্রমাণস্বরূপ থেকে যাবে। কেননা কিতাবটিতে লেখিকার পূর্ণ নাম-ঠিকানা উল্লেখ ছিল। আর যদি সত্যায়ন না করি, তাহলে প্রশ্ন উত্থাপন হবে যে, কিতাবটিতে ক্ষতিকর কোনো বিষয় রয়েছে কি না? যার দরুন সত্যায়ন করলাম না। এমন দোটানায় চিন্তিত ছিলাম।

পরে একটি সমাধান মনে পড়ল, কিতাবের বিষয়-বস্তু অবশিষ্ট রেখে লেখিকার নাম-ঠিকানা কেটে দিলাম এবং সে স্থানে লিখে দিলাম— 'লেখিকা : আল্লাহর এক বান্দি'। আর কিতাবটির মন্তব্য করতে গিয়ে লিখে দিলাম, কিতাবটি খুবই উপকারী। ভালো লাগার একটি বিষয় হলো, কিতাবটি এমন একজন নারীর লিখিত, যিনি অত্যন্ত লাজুকতার অধিকারিণী। যিনি লাজুকতার দরুন নিজের রচিত কিতাবে স্বীয় নাম-ঠিকানা উল্লেখ করেননি। অবশেষে বুঝতে পারলাম আমার কর্মপদ্ধতিটি খুবই উত্তম ছিল। কেননা কিতাবটিতে যদি আমার সত্যায়ন উল্লেখ করতে হয়, তাহলে তিনি তার নাম-ঠিকানা উল্লেখ করবেন না। আর তার নাম-ঠিকানা উল্লেখ করলে আমার মতামত ছাপাতে পারবে না।[৩৮৮]

পুস্তক–পত্রিকায় নারীদের নাম–ঠিকানা উল্লেখ করা উচিত নয়

আমার বুঝে আসে না, নারীরা তাদের লিখিত কিতাবাদিতে নিজেদের নাম-ঠিকানা উল্লেখ করার উদ্দেশ্য কী? যদি কোনো উপকারী লেখা অন্য কোনো নারীর কাছে পৌঁছানো উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাহলে তার জন্য

---

[৩৮৮] প্রাগুক্ত, ৭/৭১।

নাম-ঠিকানার কী প্রয়োজন! নাম-ঠিকানা ছাড়াই তো কোনো লেখা অন্যদের কাছে পৌঁছানো সম্ভব।

বর্তমান সময়ে শিক্ষিত নারীদের একটি সমস্যা দেখা দিয়েছে। তারা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নিজেদের প্রবন্ধ-রচনা পাঠিয়ে তাতে নিজেদের নাম-ঠিকানা উল্লেখ করে থাকে। এটার কারণ এই হতে পারে যে, কেউ যদি তার লেখার প্রতি আকৃষ্ট হয়, তাহলে তার সাথে সাক্ষাৎ করতে পারবে। আমি বুঝতে পারি না যে, তাদের আত্মমর্যাদা কোথায় উড়ে গেল? আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন, তাদের পুরুষদের মান-মর্যাদা কত নিচে নেমে গেছে। তারা কীভাবে এটা সহ্য করে নিল! নাকি মানুষের মন-মেজাজই সব নষ্ট হয়ে যাচ্ছে!

সারকথা হলো, কোনো অবস্থাতেই নারীদের নিজেদের নাম-ঠিকানা কোথাও লেখা উচিত নয়। নারীদের নিজ স্বামী ছাড়া অন্য কারও সাথে সম্পর্ক রাখা ঠিক নয়।[৩৮৯]



[৩৮৯] *আত-তাবলীগ*, ৭/৭২।

হাকীমুল উম্মত

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ.

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. (১৮৬৩–১৯৪৩) ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ বুযুর্গ, বিজ্ঞ আলেম, সমাজ সংস্কারক, ইসলামী গবেষক এবং পুরোধা ব্যক্তিত্ব। তিনি ভারতের থানা ভবনের নিবাসী হওয়ার কারণে তার নামের শেষে 'থানভী' যোগ করা হয়। ভারতীয় উপমহাদেশ ও এর বাইরের অসংখ্য মানুষ তার কাছ থেকে আত্মশুদ্ধি এবং তাসাওউফের শিক্ষা গ্রহণ করার কারণে তিনি *হাকীমুল উম্মত* (উম্মাহর আত্মিক চিকিৎসক) উপাধিতে পরিচিত। মুসলমানদের মাঝে সুন্নাতের জ্ঞান প্রচারের জন্য তিনি *দাওয়াতুল হক* নামক সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন।

শৈশবে তিনি হাফেয হোসাইন আলীর কাছে সম্পূর্ণ কুরআন মুখস্থ করেন। নিজ গ্রামে ফতেহ মুহাম্মাদ থানভীর কাছে ফার্সি ও আরবি ভাষার প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। ১২৯৫ হিজরীতে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানে উচ্চশিক্ষা অর্জনের জন্য দারুল উলুম দেওবন্দে ভর্তি হন। পাঁচ বছর পর ১৯ বছর বয়সে তিনি দেওবন্দের শিক্ষা সমাপ্ত করেন। দারুল উলুম দেওবন্দে তিনি হাদীস, তাফসীর, আরবী সাহিত্য, ইসলামী দর্শন, যুক্তিবিজ্ঞান, ইসলামী আইন এবং ইতিহাস অধ্যয়ন করেন। দারুল উলুম দেওবন্দের প্রথম যুগের শিক্ষা সমাপনকারী ছাত্রদের মাঝে তিনি অন্যতম। কর্মজীবনে কানপুরে ফয়যে আম মাদরাসা এবং জামেউল উলূম মাদরাসায় শিক্ষকতা শেষে ১৩১৫ হিজরীতে হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ.-এর পরামর্শে তিনি থানাভবনের খানকাহে ইমদাদিয়ায় অবস্থান গ্রহণ করেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেই ইসলাম প্রচার, আত্মশুদ্ধি, তাসাওউফ ও রচনার কাজ করে যান। তিনি সারা জীবনে অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থগুলোর মাঝে অন্যতম হলো ফিকহ বিষয়ক গ্রন্থ *বেহেশতী জেওর*, যা ভারতীয় উপমহাদেশের সাধারণ মুসলমানদের মাঝে বহুল পঠিত। এছাড়া তার রচিত কুরআন মাজীদের উর্দু তরজমার গ্রন্থ *বয়ানুল কুরআন* সুপরিচিত। তিনি জাতির কল্যাণের জন্য তার সকল গ্রন্থের স্বত্ব উন্মুক্ত রেখেছেন।

ইসলাম নারী-পুরুষের যথাযথ মর্যাদা দিয়েছে। আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্তিতে কোনো ভেদাভেদ রাখেনি। আর এ নৈকট্য যার যত বেশি, তার মর্যাদাও তত বেশি। সমাজে সাধারণত পুরুষদের দ্বীনি তরবিয়তের যত চেষ্টা করা হয়, সে তুলনায় নারীদের নিয়ে ফিকির কমই বলা যায়। তারা অন্দরমহলে থাকেন বলে সচরাচর দ্বীনি মাহফিলে অংশগ্রহণ করার সুযোগও বেশি পান না। এজন্য আল্লাহওয়ালাগণ ঘরোয়া মাহফিলের খুব তাগিদ দেন যাতে নারীরাও বঞ্চিত না হয়। পাশাপাশি তারা নারীদের দ্বীন শেখা ও আমলের জন্য আলাদা গ্রন্থাদিও রচনা করেছেন। এক্ষেত্রে হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. একজন ব্যতিক্রম কারিগর। তিনি পুরুষদের আত্মিক সংশোধনে যেভাবে চেষ্টা-সাধনা করেছেন, ঠিক একইভাবে নারীদের নিয়েও চিন্তিত ছিলেন। তাদের জন্য সহজ মাসআলা-মাসাইল সংকলনের পাশাপাশি তাদের আত্মিক রোগ ও চিকিৎসা নিয়েও মেহনত করেছেন। এ গ্রন্থটি সে ধারারই একটি রচনা। এখানে সুনির্দিষ্টভাবে নারীদের আত্মিক রোগসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে এবং এর প্রতিকারও লেখা হয়েছে। প্রতিটি মুসলিম নারীদের জন্য এটি একটি জরুরি গ্রন্থ। আশা করা যায়, গ্রন্থটি তাদের জন্য ইসলামের শাশ্বত সৌন্দর্য যেমন উন্মোচিত করবে, তেমনই দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের জীবন সুন্দর ও সাফল্যমণ্ডিত করতেও সহায়ক হবে।

MAKTABATUL FURQAN
PUBLICATIONS
DHAKA, BANGLADESH

Printed in Bangladesh
US $15.00
ISBN 978-984-96830-6-3
9 789849 683063 51500>
www.islamibooks.com